

# হাঙর নদী গ্রেনেড

## সেলিমা হোসেন



বাবো ভাই-বোনের সবচেয়ে ছেটি বলে বাবা আদর করে নাম রেখেছিল বুড়ি। অবশ্য আদর করে কিনা কে জানে! বুড়ি হবার পর থেকেই জেনে এসেছে ওর নাম বুড়ি। নামটা ওর পছন্দ হয়নি। তালেই শরীর চিড়িবিড়িয়ে ওঠে। ওর ধারণা নাম খুব সুন্দর হওয়া চাই। যেটা তালে মন খুশিতে নেচে ওঠে। সাড়া দিতে ভালোলাগে। সেজন্যে বাবার কাছে গিয়ে নাম বদলে দেবার জন্যে অনেক কাঁদাকাটি করেছে। কিন্তু লাভ হয়নি। বাবা ওর কথা কানেই তোলেনি। খেলার সাথীদের কাছে আবেদন করেছিল, তোরা আমাকে বুড়ি বলে ভাকবি না।

ওরা প্রবলভাবে আপত্তি করে, না, তুই বুড়ি। বুড়ি। বুড়ি।

ওরা এ নামে ডেকেই আমোদ পায়। ওকে খেপানো যায়।

ফলে বুড়ি বুড়িই রায়ে গেলো। একটা পছন্দহীন নাম নিয়ে লিন কাটাতে হয়। ঘন সবুজ কচুপাতার মতো বুড়ির মন। সে পাতায় জলের দাগ পড়ে না। জন্মের সূক্ষ্ম অনুভূতি ওকে আক্রমণ করে না, বুড়ি নির্বিবাদে সে বেড়ি পেরিয়ে আসে।

হলনী গায়ের এ বাঢ়ি ছেড়ে আর কোথাও যাবার সুযোগ হয়নি ওর। পশ্চিমে স্টেশনে যাবার বড় রাস্তা। পুবে খালের ধার। উত্তর-দক্ষিণে মাঠের পর মাঠ। এর বাইরে কি আছে বুড়ি জানে না। আশপাশের ঘরের ছেলেমেয়েরা দাদার বাঢ়ি, নানার বাঢ়ি যায়। বুড়ির তাও যাওয়া হয়নি। বাবার কাছে কিংবা মার কাছে বায়না ধরে লাভ নেই। উল্টো বকা খেতে হয়। সৎসারের আমেলার মা কোথাও বেরিতে পারে না। বাবা, কাউকে সঙ্গে নিয়ে কোথাও যায় না। বুড়ি ভীষণ নিঃসঙ্গ। একদল ভাই-বোনের মধ্যে থেকেও বুড়ির মন কেমন করে। সে মনের কথা কেউ বোঝে না। বুকাতে চায় না। যে মনের ভানা অনবরত রাঙ বদলায় তাকে বুকাবে কে? খেলতে খেলতে খেলা ছেড়ে ঘরে এসে চুপচাপ বসে থাকে। ওরা ভাকতে এলে রাগ করে। কখনো গালি দেয়। অকারণে ঝগড়া বাধিয়ে তোলে। তারপর একসময় খালের ধারে গিয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে। বাতাসে ধিরধির জল কাঁপে। পানির ওপর মাথা উঁচিয়ে থাকা সবুজ ঘাসের ডগায় কাচপোকা উড়ে বেড়ায়। বুড়ি ঘোলা জলে নিজের মুখ দেখার চেষ্টা করে। কিন্তু দেখা হয় না। আহা জলের স্পর্শে কী ভীষণ সুখ।

একদিন দুরন্ত কৌতুহলে জলিলের সঙ্গে স্টেশনে গিয়েছিল। বুড়ির জিজাসু মনের কাছে স্টেশন মানেই রূপকথার জগৎ। সেখানকার কোনো কিছুই ও চেনে না। অথচ চিনে নেবার জন্যে আগ্রহের শেষ নেই। ওরা স্টেশনে পৌছার সঙ্গে সঙ্গে মেল ট্রেন কাড়ের পতিতে পার হয়ে গেলো। অত ছেটি স্টেশনে মেল ট্রেন দাঁড়ায় না। বুড়ির বুকের ধূকধূকানি বেড়ে যায়। উত্তেজনায় জলিলের হাত আঁকড়ে ধরে। রেলটা শেষ বিন্দু হয়ে যিলিয়ে যাবার পরও ঝকঝকে লাইনের ওপর দাঁড়িয়ে ছিল বুড়ি। বুক ভরে শ্বাস নিয়েছিল। কেমন একটা অচেনা গন্ধ ওকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল।

- গাড়িটা কোথায় যায় রে জলিল?
- অনেক দূর।
- অনেক দূর, কত দূর?
- আমিও কি জানি ছাই! একদিন উঠে টুস করে চলে যাব কোথাও। আর ফিরব না।

জলিল চোখ বড় করে বলেছিল-

- আমারও যেতে ইচ্ছে করে। তুই আমাকে নিবি?
- ইশ্শ শখ কতো? তুই আমাকে নিবি? ভাগ।

জলিল ওকে ভেঁচি কাটে।

বুড়ির মন খারাপ হয়ে যায়। তবুও আপন মনে বলে, আমিও একদিন কোথাও চলে যাব। কোঁচড় ভর্তি নৃত্য নিয়ে ফিরে এসেছিল সেদিন। জলিল স্টেশন মাস্টারের ঘরের সামনে ঘূরঘূর করছিল বারবার। ট্রেনে ঢাকার মতলবে ছিল ও। সুযোগ করে একদিন ও ঠিকই উঠবে। কিন্তু বুড়ি কিছুই করতে পারে না। মনের মধ্যে হাজারটা ইচ্ছে থাকলেই কি আর সব করা যায়? মেইল ট্রেন আকাশের পাখি হয়ে উড়ে চলে যায় একদম বুড়ির মাগালের বাইরে। হলদী গাঁর বাইরের দুনিয়াটা দেখার সাধ্য বুড়ির নেই। কিন্তু বড় বিশ্বী এই মনটা। কোন বাধা মানে না, ছুটে চলে যায় দূর-দূরাঞ্চল। সেদিন জলিল ফেরেনি ওর সঙ্গে। ও অন্য কোথায় যেন চলে গিয়েছিল। একা একা ফিরেছিল বুড়ি। কোঁচড় ভর্তি পাথরের নৃত্য গায়ে লেগে শব্দ করছিল। ভাল লাগছিল না ওর। ত্যব্বর্ত মনটা বাগ মানাতে না পেরে নৃত্যগৰ্বে এলোপাথাড়ি ছুঁড়ে মেরেছিল সারাপথ। লজ্জাবতীর বোপে লাখি দিয়ে ব্যাথা পেয়েছিল। তবুও ওতেই ছিল আনন্দ। মন খারাপের আনন্দ। ট্রেনের ঐ ঝিকঝিক শব্দ বুড়িকে অনেকদিন নেশাপ্রস্ত করে রেখেছিল। বুকের তল থেকে ঐ শব্দ কেবলই ঘূম ভাঙিয়ে দিত। অক্ষকারে চোখ মেলে রেখে বুড়ির রাত শেষ হয়ে যেতো। এর বেশি কিইবা করতে পারে ও। বুড়ির মন বিগড়ে যাওয়া ইঞ্জিনের মতো ধমকে থাকে। কেবলই জানতে ইচ্ছে করে থাক কোথায় শেষ হয়। পথ কোথায় ফুরিয়ে যায়। আর তখনই কেমন বিজিন্ন ভাবনায় বুক মোচড়ায়। মনটা জল দৈ দৈ খিলের মতো ছপ্পচপ করে।

হলদী গাঁর ছোট পরিসরে বুড়ি একটু বেশি এগিয়ে গিয়েছিল। সমবয়সী খেলার সাথীরা যেহেন ওর মাগাল পেতো না, ওকে বুঝতে গিয়ে হিমশিম খেত- তেহম বড়বাও ওকে কাছে টানতে পারেনি। মায়ের ডাকে সুল করেও সাড়া দিতে চাইতো না ও। মা মানোই হেসেল আর এটা আনো ওটা আনো-র ফাইফরমাস খাট। তার চাইতে খালের ধার ভালো, জামরম গাছের তলা ভালো। আর এ জনোই মার কাছ থেকে বিজিন্ন হয়ে গেলো ও। বুড়ি কারো জন্মে কোনো বক্স অনুভব করে না। কোনদিন ভাত খেতে ভেকে না পেয়ে মা রেগে গন্ধন করতো, ‘এমন ছিটিছাড়া যেয়ে বাপের জন্মেও দেখিনি বাবা! ওর যে কি হবে?’

বুড়ি তখন হয়তো বাগানের স্যাতসেতে অক্ষকারে বড় বাদাম গাছের তলায় হাত-পা ছাড়িয়ে বসে জিতে শব্দ তুলে তেক্তুল চাটিছে। দুপুরের খাবার কথা ওর মনে নেই। একা থাকতে কি যে ভালোলাগে! বেশি লোকজনের মাঝে ওর কেমন হ্যাফ ধরে যায়। হাতের নদী হেনেড

এই পাছ-গাছালি কথা বলে না বলেই বুড়ির এত প্রিয়। কোন কারণে বাড়িতে লোকজন  
বেশি বেঙ্গাতে এলেই বুড়ির সুবিধে। তখন ওর কথা কেটে মনেই করে না। বুড়ির  
মনের অনুকূলে সব ঘটনা ঘটে বলেই বুড়ি দ্রুত মানসিক পরিষ্কারে পৌছে পেল।

কৈশোর ফুরোবার আগেই বাবা মারা যায়। বুড়ি কিছু বুঝতে পারে না। বাবার  
অভাব ওকে তেমন কষ্ট দেয়নি। বাবাকে করবে নিয়ে যাবার আগে মুখের কাপড়  
সরিয়ে যখন সবাইকে দেখতে চেকেছিল বুড়িও গিয়েছিল। বাবাকে অন্যরকম লাগেনি  
ওর। ঘুমিয়ে থাকলে যেমন লাগত ঠিক তেমন। অন্য সবাই কেমেছিল দেখে ও নিজেও  
কেমেছিল। কিন্তু তীব্র বেদনাবোধ কোথাও ছিল না। কেননা বাবার খুব কাছে ও  
কোনদিন ঘোতে পারেনি। বাবাকে কেন্দ্র করে তেমন কোন গভীর অনুভূতি নেই। ভালো  
একটা স্মৃতিও না। অবশ্য সেজন্য বুড়ির কোন দুঃখ নেই। বরং অনাদুর অবহেলায়  
দিবিয় বড় হচ্ছিল বলে বাবা থাকা না থাকায় বুড়ির কোনো রদবদল হয়নি। মাটে মাটে  
ঘুরে, বৈটি কুড়িয়ে, ধানের ছানার কোচড়ি ভর্তি করে, বিলের জলে সাতার কেটে বুড়ির  
অনাদুরের দিনগুলো রাতের আকাশে তারার ফুলকি। বাবার প্রয়োজন বুড়ির জীবনে  
কোনো দাগ কাটেনি। মাকে যান্তে ভাবত— বাবা হয়তো জানেই না যে বুড়ি নামে তার  
কোনো ঘেরে আছে। বাবার সেবের পরোয়া করেনি ও। তার চাইতে অনেক ভালো  
বাইরের অগতের হ্যাতছালি। আঠঘাট, ঝোপবাড়, পথ-প্রাঞ্চরের ভাক বুড়ির নাড়িতে  
নাড়িতে। এমনি করে সবার অলঙ্কৃ সংসারের নিয়মের পত্রি বাইরে বুড়ি ছিটকে  
পড়ে।

কৈশোর শেষ হ্যার সঙ্গে সঙ্গে বিপন্নীক চাচাতো ভাই গফুরের সঙ্গে বিয়ে হলো  
বুড়ির। গফুরের বয়স নিয়ে আ-র একটু আপত্তি ছিল। কিন্তু পিতার অবর্ত্যানে  
অভিভাবক বড় ভাইর কাছে সে আপত্তি টেকেনি।

জোমার এই দশ্য যেয়েকে কে সামলাবে যা? এভেদিন ছোট ছিল লোকের চোখে  
পড়েনি কিন্তু দিন দিন তো ধিনি হচ্ছে। শেষে একটা কেলোকারি না হলে বাচি!

বড়ভাই রেখে গিয়েছিলেন। যা বুড়ো হয়েছেন। কার কাছেই বা জোর আটাবেন।  
তবু বুড়িকে একটু বুঝতে চেয়েছিলেন কিন্তু অসম্ভা ছিল না তার। মা-র বিষয় মুখের  
দিকে দেয়ে হয়তো খারাপ লেগেছিল তাই বড়ভাই গলা নরম করে বলেছিলেন, গফুরের  
সঙ্গে বিয়ে হলে খারাপ হবে না যা। তাছাড়া আয়াদের চোখের পুরাই তো ধাকবে।  
জীব গীয়ে বিয়ে দিয়ে চিনার শেষ থাকবে না। ওর যা স্বতাব! বাপ দাদার মুখে কালি  
দেবে।

যা চূপ করেই থাকলেন। বড়ভাই নিজের রায় জানিয়ে বেরিয়ে পেলেন। বুড়িকে  
কোনৰকম একটা বিয়ে নামক বস্তনের মধ্যে ঠেলে দেয়াই ছিল তার লক্ষ্য। বুড়ির  
স্বত্ব এবং আচরণ কোনটাই তার পছন্দ ছিল না। দেখেতনে বুড়ি নিজেই চুপচাপ  
ছিল। বড়ভাইর হাতে-পায়ে ধরতে ওর বাধালো। তাছাড়া নিজের মনের কাছে অন্য  
কারো টাই নাই যাব তার জীবনে স্বামী আর কতটুকু পরিবর্তন ঘটাতে পারবে? ও খুব  
একটা উৎসাহ পায় না। তেমন উৎসজন্মাও বোধ করে না। তখু বিয়েকে কেন্দ্র করে  
একটাই স্বপ্ন ছিল মনে। ভেবেছিল আর কিছু না হোক এক গী ছেড়ে আর এক গায়ে  
যাওয়া যাবে অন্তত। একটুখালি পাপলা হাওয়া বাইরে যাবার ভাক শোনাত। হলদী  
৯ হাত্তর নদী প্রেমেত

গায়ের বেড়িটা ভাঙতে পারবে। নৌকার ছাইয়ের ভেতর বসে ঘোমটার ফাঁকের বিমুক্ত দৃষ্টি ওকে স্ফুর্তি দেবে। কোন অপরিচিত জনের লোমশ হাত বুড়ির জীবনের বাঁকবদলের মাইলস্টোন হয়ে দাঢ়াবে। পানবাগ্য লাল দাঁতের হাসি ছাড়া বুড়ির জন্যে আর কিছু অবশিষ্ট থাকবে না। কিন্তু কোন ইচ্ছেই পূরণ হয়নি ওর। লাল নটে শাকের ফেত, দোয়েলের লেজ দোলানো, শাপলার চিকন লতা, কচুরিপানার বেগুন ফুল সব কিছু থেকে বাধিত হয়ে গেছে। এ সব কিছুই ওর জীবনের চারপাশে আছে ঠিকই কিন্তু কারো দৃষ্টির সঙ্গে দৃষ্টি মিলিয়ে নতুন করে দেখা হলো না।

চাচাতো ভাইয়ের সঙ্গে বিয়ে হওয়ার ফলে উন্নতের ঘর থেকে দক্ষিণের ঘরে যাবার ছাড়পত্র পেয়েছিল যাত্র। তাছাড়া অন্য কোন বৃহৎ পরিবর্তন ওর মধ্যে আসেনি। গফুরের দুই ছেলে। বড়টি ছয় বছরের, ছোটটির বয়স চার। ওদের সঙ্গে বেশ একটা প্রতিকৃতির সম্পর্ক ছিল। ওদের কোলেকাখে করে মাঠে মাঠে ঘুরে বেড়িয়েছে অনেক। বিয়ের পর হঠাত করে ওদের মা হয়ে যাবার দরজন ভীষণ কৌতুহল হয়। কেহন অবাক লাগে। কখনো লজ্জা। মুখ কি বাজে ব্যাপার। দুটোকে ধরে পুরুরে ফেলে দিতে ইচ্ছে করে। আবার কখনো নিষ্পাপ কঢ়ি মুখ দুটো ভালো লাগে। তখন এক অস্থিরতায় ছটফটিয়ে ওঠে। এ ছাড়া আর সবই ওর দেখা জগৎ। পরিচিত খন্তি-শান্তি, পরিচিত স্বামী, চেনা-জানা ঘরদোর, জানাশোনা পরিবেশ। সুতরাং কাউকেই নতুন করে চিনবার বা জানবার সুযোগ হয়নি। কেবল মাঝারাতে ঘূম ভেঙে গেলে অনুভব করে একটা শক্ত লোমশ হাত ওকে আঁকড়ে ধরে আছে। তখন মনে হয় হ্যাঁ জীবনের কোথায় যেন কি ঘটে গেছে। আস্তে হাতটা সরিয়ে দিয়ে পাশ ফিরে শোয়। কোন দিন চুপচাপ উঠে এসে বারান্দায় বসে থাকে। মনে হয় আরো অনেক কিছু পাওয়ার ছিল, সেটা হয়নি। অক্ষকার বাঁশবনে জোনাক জুলে, চাদের আলো বারান্দায় এসে পড়ে। বুড়ির বুক ফেটে কান্না আসতে চায়। কাঁদতে পারে না, ভুতুমের ভাক তনে আবার ঘরে ঢোকে। বিচ্ছানায় উঠে আসে। গফুরের পিঠ ধৈঁৰে তয়ে পড়ে। এর বেশি বুড়ির আর কিছু করার নেই। বুড়ি মানসিক দিক দিয়ে যতোই গন্তী লাফিয়ে পেরিয়ে যাক শারীরিক সীমাবদ্ধতা ও কিছুতেই ডিঙ্গেতে পারে না।

কোনোরাতে গফুর টের পেলে জিজেস করে— কোথায় গিয়েছিলে বুড়ি!

— বাইরে।

— কেনো?

— এমনি। ঘুম আসছিল না।

গফুর কথা বাড়ায় না। আবার ঘুমিয়ে যায়। আর বুড়ি বাকি রাত এপাশ ওপাশ করে কাজিয়ে দেয়। কখনো কখনো যখন গফুরের ভীষণ ইচ্ছের কাছে নতি শীকার করে না তখন ওর পুরুক লাগে। গফুরের নরম মিনতি রোলের বিকিমিকি শব্দের মতো মনে হয়। গফুরের বুক আঁকড়ে ধরে একটা আদুরে বিড়ালের মতো মুখ ঘষে। আর গফুরের তীব্র আকাঙ্ক্ষা ঘরন দীপ্ত হয়ে ওঠে তখন অবলীলায় শান্ত হয়ে যায় ও। গফুরের বুড়ি ডাকের সঘন মাদকতার সাড়া দেবার মতো অবস্থা ও নিঃশেষ হয়ে যায়। হারিয়ে যেতে থাকে সেই না দেখা জগতটায়। অনবরত ভুবে যায় ট্রেনের বিকিমিকি শব্দের অতল হাতের নদী ঝেনেড

তলে। কেউ আর ওকে ধরতে পারছে না। আর এভাবে সকলের নাশদের বাইরে ছুটে যাওয়ার যে কী সুখ! যে না বোকে তাকে কীভাবে বুঢ়ি।

মাঝে মাঝে গফুর একটু আবাক হয়ে ওর কিশোরী বউকে মেঘে। এই মেঝেটি ওর বউ হনে কোনসিন চিন্তা করেনি। কবে যে ও বড় হলো, খেলতে খেলতে কেমন করে ওর ঘরে এসে উঠলো ভাবলে লজ্জা পায় গফুর। বুঢ়ির মুখের দিকে তাকাতে পারে না। জোখ থেকে জোখ সরিয়ে নেয়। বুঢ়ি তখন হেসে গড়িয়ে পড়ে।

- কি দেখ অমল করে?
- তুই সুখী হয়েছিস বুঢ়ি?
- সুখ কি?

বুঢ়ি পাঞ্চা প্রশ্ন করে। এ প্রশ্নের উত্তর গফুর দিতে পারেনা। উত্তর জানেও না। বুঢ়ির কৌতুহল, জিজাসা ইত্যাদির সঙ্গে পাঞ্চা দেয়ার সাথৰ্য গফুরের নেই। হলদী পায়ের ছোট পরিসরে থেকেও বুঢ়ি যে কোথা থেকে এমন বেয়াড়া প্রশ্ন করে তা গফুর বুকে কুপিয়ে উঠতে পারে না। প্রসঙ্গ এড়ানোর জন্মে তাড়াতাড়ি বলে, তামাক আল বুঢ়ি। বুকটা কেমন খালি খালি ঠেকছে।

ঘড়ি-ঘড়ি তামাক থেকে না পারলে গফুরের বুক অমল করে। বুঢ়ি তা জানে। কিন্তু সুখ কি বুঢ়ি নিজেও তা জানে না। ভাত বাঁধা, খাওয়া, রাখিবেলা স্বামীর সঙ্গে যুয়োনো— এর নাম কি সুখ? হ্যাঁ এ যদি সুখ হয় তাহলে বেশ আরামেই আছে ও। জীবনের গতানুগতিকভাব একটা স্রোত এসে ছিলেছে মাত্র। হয়তো তাও নয়। চলার পথে বুঢ়ি কুড়িয়ে পাওয়ার মতো। না টিক হলো না। ধানের ছাঁড়া কুড়োতে কুড়োতে হাঁসের ডিম পেজে গোলে যেমন ডিক্কার করে ওঠে তেহনি। ওর জীবনে গফুর গ্রি টিক্কারের মতো একটা খবনি। অব্যুক্ত বিশ্বায়ে, গভীর আলন্দে বুকের অস্তঃস্থল থেকে বেরিয়ে আসা শব্দ নয়। তেহন করে ওকে খলেটিপালোটি করে দেয়নি। আসলে বুঢ়ি কোনো ঘটনাকেই প্রাধান্য দিতে চায় না। তার ওপরতুকে আলাদা করে দেখতে বাসে না। মনের সঙ্গে স্বুব গভীরভাবে না মিললে বুঢ়ি অনায়াসে তা মন থেকে থেকে ফেলে। অথচ অন্য কোনো মেয়ে হলে জীবনের এ পরিবর্তনকে বাঁক বাদলের লপ্ত হলে ধরে নিত।

হলদী পায়ের গ্রামীণ আবহাওয়ায় এমন কোনো কঠিন ধাতু ছিলো না যা বুঢ়িকে নিরেট করতে পারত। অথচ আশ্চর্য তার মনের জের। বুঢ়ি পায়ের সেই স্যাতসিংহে পরিবেশের মতো এক ভিজে হন লাগল করেনি। সে মনের আবহাওয়ায় গ্রীষ্মমণ্ডলীয় উষ্ণতা বিবাজ করেছে সবচেয়ে বেশি। যেদিন বুঢ়ি কাঁদতো সেদিন বাড়ির সবাই তাবজ্জ্বলা আজ সাংঘাতিক বকমের কিছু হয়েছে। অল্পে কেবে ভাসিয়ে দেবার মতো হেয়ে ও নয়। অথচ কেউ বোকে না বাহ্যিক কোনো কারণে বুঢ়ি কাঁদে না। ওর অস্তরের অস্তর বিশাদ ওকে কাঁদায়। সে বিশাদ সামগ্রিক জীবনের পাঞ্চিপার্শ্বিককে কেন্দ্র করে অহরহ আবর্তিত হয়। কোনো সাংঘাতিক ঘটনা হয়তো কখনো ওকে আলোড়িত করে না। অথচ কোনো কৃজ্জ ঘটনা বিশাদের বরফ হয়ে ওকে জয়াটি করে তোলে। ছেলেবেলায় বুঢ়ি যখন ব্যাধন-তৎ পারিষণলোর দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে হাঁর তাকে সাড়া দিতে স্কুলে যেতো তখন যা অনুযোগ করতো— ‘এ যেয়েকে নিয়ে কি যে

করবো আমি? তোর কপালে অনেক দুঃখ আছে বলে রাখলাম বুড়ি? এই বুড়ি শোন, ফিরে আয়? হতজ্জাড়া যেয়ে।' বুড়ি মা'র কথায় কানই দিতো না। মাকে ভেংচি কেটে সৌভে বেরিয়ে যেতো। মা পিছু ভাকতে ভাকতে মরজা পর্যন্ত আসতেন কিন্তু বুড়ি ততোক্ষণে হাওয়া। মা'র কথা শোনার যতো সহজ ওর নেই। মা'র কিইবা কথা ধাকতে পারে? কেবল ওকে আটকে রাখার চেষ্টা। ও তা বোঝে। আর বোঝে বলে বেড়ি ভাঙতে দুর্বীর হয়ে ওঠে। মা কোনদিন ওকে শাসনের বশে আনতে পারেননি। তাই ওর বিয়ে নিয়ে উইষণ শংকিত ছিলেন। কিন্তু বিয়ের ব্যাপারে বুড়ির নির্বিকারস্তু দেখে হাফ হেঢ়ে বেঁচেছিলেন।

ছেলেকে বলেছিলেন- 'ও যে এতো শান্ত ধাকতে আমি বুঝতেই পারিনি বৈ?

ছেলে আত্মপ্রসাদের হাসি হেসেছিল, আমি জানতাম। বিয়ের আগে যতো যাই করত, বিয়ের পর যেয়েরা একদম সোজা হয়ে যায়। কল্পে যেয়ে দেখলাম।

আড়াল থেকে তাই আর যায়ের কথা তনে বুড়ি মনে মনে হেসেছিল। আসলে বুড়ির যতো ঘৃণা মনকে নিয়ে। সেই মন কেউ দেখতে পায় না বলেই বুড়ি কখনো ভালো, কখনো মন। কখনো বিপজ্জনক, কখনো গোবেচারা। তাহাড়া ও নিজের বলয়ে ধাকতেই ভালোবাসে। অকারণে যেটে কারো কাছে নিজের কথা বলা ওর একদম পছন্দ নয়। বুড়ির এই নিজের ক্ষেত্র আছে বলেই তার চাহবাস আছে, ফসল ফলানো আছে, তার মাড়াই আছে, গোলায় ভরা আছে। অন্য কাউকে ওর প্রয়োজনই হয় না। আ আর তাই এর বেশি কিইবা তাবতে পারবে?

নিয়োই গোবেচারা আরী বুড়ির। কোন দিন বুড়ির মতের বিকলকে কথা বলে না। পারতপক্ষে বকে না। বাগড়া বাধাতেও অপারণ গফুর। বরং সারাঞ্চল বুড়িকে তৃষ্ণ রাখার আঙ্গাল চেষ্টা পরিলক্ষিত হয় গফুরের সব কাজে। ও যেন কোন অসাধারণ বন্ধুর পরিজ্ঞান রক্ষার্থে সর্বদা ব্যক্ত। তাই পারিবারিক কলহ কখনো দানা বেঁধে ওঠে না। বুড়ি যা বলে সঙ্গে সঙ্গে সেটা মেনে নেয় গফুর। বুড়ির অন্যায় আবদার নেই, হিংসা নেই, বুঁটিলাটি বন্ধ নিয়ে কারো সঙ্গে বাধে না। বুড়ির কাছে গফুরের কৃতজ্ঞতা এজনোই। মাঝে মাঝে ওকে আসত করতে গিয়ে কেহন থাকতে যায় গফুর। ওর মুখটা শুব কাছে টেনে নিয়ে বলে- 'তোকে বিয়ে করা আমার বোধ হয় ঠিক হয়নি বুড়ি।

- কেবো?
- আমি তোর চাইতে অনেক বড়।
- বয়সে কি? খেতে দাও তো ঠিক হতো।
- কি যে বলিস?
- ধারাপ কি? কথায় আছে না পেটে ধাকলে পিটে সত্ত্ব।

গফুর আর কথা বলতে পারে না। এ বুড়ির অভিযান না অভিযোগ তাও বোঝা দুঃক্ষণ। ওর সঙ্গে কথা বলতে যাওয়ার এই এক দোষ। বিশেষ জায়গায় এসে হঠাৎ করে থেমে যেতে হয়। আর এগনো যায় না। ওর সঙ্গে গল্প শুব একটা চলে না। কোথাও না কোথাও এসে বুড়ি এমন করে যতি টালে যে থেমে যাওয়া ছাড়া উপায় ধাকে না। সেটা কাজের কথাই হোক কিংবা এমনি অবাস্তুর কথাই হোক। হঠাৎ করে চূপ করে যায়। বেশি কথা বলতে চাইলে ঝুঁ-ঝুঁ ছাড়া জবাব দেয় না। তখন গফুর হাতুর নদী ঝেনেড

নিজপায় হয়ে বলে— তামাক আম বুড়ি। বুকটা কেহন খালি খালি টেকছে। বুড়ি হাসতে হাসতে উঠে যায়।

তবে গফুরের বয়স নিয়ে কোনো অভিযোগ ছিল না বুড়ির। এই নিয়ে ও একদম আধা ঘায়ায়নি। উঠতি বয়সের করণ উজ্জ্বলের প্রস্তুতি গুরুতর আগেই গফুরের নিরাপদ আশ্রয়ে ছিটকে পড়ে নির্বিবাদ হয়ে গেছে ও। তবে আর লাভ কি? বরং এই ভালো। নিজের মনের সঙ্গে শুনসুন্ধি করে বেশি। ওর কাছে গফুরের দাবি পুর নেই। গফুর ওকে কেবল বিরুদ্ধ করে না। তবুও যাকে যাকে তখন গফুরের উপরিতি অসহ্য লাগে তখন বুকের ভেতরের দমধরা জুন্ডতা আকৃত হয়ে উঠে। মনে হয় সবকিছু থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে একদম একলা থাকতে। কার্তিক মাসের হিম-পঢ়া রাতে বাইরে গিয়ে বাসে থাকে। বিজ্ঞানায় কাঁধার নিচে গফুরের বুকের উপর আমের পানসে লাগে। প্রতিদিনের একথেয়েরীতে সুখ কৈ? বাইরে পারি ভাকে। ভেঁভুল গাছের মাধার ওপর হিম ঝরে। সজনের ভাল নচে। বুড়ি পা ছড়িয়ে বসে থাকে। ঠাণ্ডা ঘালক-বাতাস গায়ে ছোঁয়া দিয়ে যায়। যেনো বুড়ির শৈশবের কেউ অনেকদিন পর পথ ভুলে ওর সঙ্গে লুকোয়ারি খেলতে এসেছে। ওর বেশ লাগে। নেশার মতো যেনো। সাধ্য-সাধনা করে টেলে নিয়ে আসে গফুর। গফুরের কষ্টে হিমতিই থাকে বেশি। বয়সের অনেকটা পার্দকের জন্যে বুড়ির উপর অসীম যত্ন গফুরের। বাছতে জোর থাকলেও গফুর তার অপরাধহার করেনি কোনদিন। আর সেই শীরব বদান্যো ভালোবাসায় ধৰা দেবার মতো যথেষ্ট চতুরতা ছিল বুড়ির আচরণে। কখনো কখনো জোর রাতের নিকে মাঝ ধরতে বেরিতো ওর। দিনের কঢ়া আলোয় দেখা পরিচিত পীঁ-টা রহস্যময় মনে হয় বুড়ির কাছে। ঠিক তেমনি অনেক দিনের জ্বানাশোনা ভাই হেমন স্বামী হয়। ভাইকে স্বামী হিসেবে আবিষ্কার করার মতো মনে হয় পাছ-পাছালি, ঘর-বাড়ি আর জলে ভূবে থাকা প্রস্তর। বুড়ির জমাটি ধরে থাকা মনের কাঠিন্যে এক পেলব ছোঁয়া দিয়ে যায়। গফুরকে মনে হয় অনেক দূরের। অনেক কালের অসেক্ষ। কাছের মানুষ পর-পর লাগে। বাইরে এলেই বুড়ির অনুভূতি পাল্টে যায়। ও তখন উভুল হয়— ওর চোখে-মুখে আমন্দের জ্যোতি ফুটে বেরোয়। ঘরে ও একদম নিজের হাত্যে উঠিয়ে থাকে। বাইরে এলে সে খোলসটা দূর করে ফেঁটে যায়। বুড়ির কিশোরী চেহারার প্রকৃতির মাধুর্য প্রতিফলিত হয়। বুড়ি আর বুড়ি থাকে না। ও তখন গফুরের কাছাকাছি আসে।

গফুর হেচকা টানে ওকে ডিঙিতে ভুলে দেয়। তারপর জোরে একটা টেলা নিয়ে নিজে উঠে বসে। জলের বুকে এপাশ-ওপাশ করে ছোটো ডিঙি। গফুর ওকে তব দেখানোর জন্যে ডিঙির দূলুনি বাড়িয়ে দেয়। এতে তব যতো লাগে তার চেয়ে বেশি লাগে মজা। ওতো উভাব বেপরোয়া হতেই চায়। নৌকা ভূবে গেলেই বা কি? ভাসতে ভাসতে ও চলে যেতে পারবে অন্য কোথাও। এখানে ফিরে আসার দায়তার থাকবে না। গফুর বলে— তব লাগে বুড়ি?

— তব কিসের তুঁমি তো আছো?

বুড়ি সজোরে গফুরের ইঁটি জড়িয়ে থবে। হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়ে নৌকোর ওপর।

- বাইরে এলে তৃষ্ণি বাস বুড়ি? করে তৃষ্ণি যেনো কেমন মনময়া থাকিস? মনে হয় আমি তোর পর। ভালো করে কথাই বলিস না?

- বাইরটা আমার ঘর যে। বাইরে এলে আমার গ্রাম তোমরা জানা পায়।  
- এজনোই জোকে সঙ্গে নিয়ে আসি।

গফুর আক্ষুণ্ণসাদের হাসি হাসে। এ যারার বুড়ির সঙ্গে ওকে কথায় ঠকতে হয়নি। ও একটা শুভসই উচ্চর দিতে পেরেছে। পর্বে আনন্দে গফুরের বুক করে যায়।

শান্ত পানিতে নৌকা ভাসে। গফুর বৈঠা হেঢ়ে নিয়ে বুড়িকে কাছে টেনে নেয়। বুড়ির কিশোরী টেকটে অপূর্ব আধুর্য। গফুর পাগলের ঘৰতা মেশা বেঁজে। মিক কুল হয়ে যায় গফুরের। কেনো দিশা করতে পারে না। বুড়ি এখন অনেক কাছের— অনেক উষ্ণ— অনেক হিমাতি ভরা। আঃ বুড়ি কেনো সব সময় এমন থাকে না। নৌকা যখন অনাদিকে ঘূরে যাবার উপকূল হয় গফুর কৰন আবার বৈঠা নেয়। ও শান্ত হেঢ়ের ঘৰতা চুপচাপ বসে থাকে। কৰন ও নিজের মধ্যে খিড়িয়ে যায়। বুড়ির ভাই বলে, গফুর বুড়িকে যাধায় কূলেছে। একেই নাচনে যেয়ে তার উপর পড়েছে ভোলের বাঢ়ি। বুড়ি ভাইর কথার জবাব দেয় না। জবাব দিয়ে ঝামেলা বাজাতে চায় না। যা এ ব্যাপারে বুড়িকে প্রশ্ন দেয়।

ওরা ওদের ঘৰতা থাকুক না। বিজের পর বুড়ি যে সব মেনে নিয়েছে এই আমার কপাল। মেয়েটা শান্তিতে থাকলেই আমি বাঢ়ি।

যা অনেক বুড়িয়ে গেছে। দোবে আপসা দেবে। তবু বুড়ির জন্ম উৎকর্ষের শেষ নেই। শৈশব থেকেই এ মেয়েটির আচরণ মাকে বড় বৈশি ভাবিয়েছে এবং এখনো জবাব। পাড়াপড়লি যাবে বুড়িকে যন্দ বলে, মেয়ে যানুষের একি বভাব? এইসব ভাল না বুড়ি।

বুড়ি কপাল করে না। মুখের উপর জবাব দেয় না। সেই জন্ম কেউ ওর সঙ্গে তেমন সুবিধে করতে পারে না। বুড়ি চুপচাপ ধাকতেই ভালোবাসে। যারা নিজেদের ভালমন বোঝে না তারা ওকে ভালোমন্দের কি বোকাবে? ও আপন হলে হাসে। এসব কথা তবাতে ওর ভালোই লাগে। কেননা এসব কথায় ওর কিন্তু যায় আসে না।

গফুরের নৌকা অনেকদূর চলে এসেছে। বুড়ি হাঁটিতে মুখ উঁচে আপন ভাবনায় যায়। যা-র কথা, ভাই-র কথা, পড়শিদের কথা ওকে আজুল করে রাখে। সরসরিয়ে আঁধার করে যায়। কোর রাতের ছিমেল বাতাস যানুকরি স্পর্শের ঘৰতা মায়ামর লাগে। পড়শিদা যারা ওকে উপদেশ দেয় তারা কি বুবাবে এর হৰ্ম? বুড়ির ভালোলাপা ধরার সাধা ওদের নেই। এখন এই মৃছুর্তে বুড়ির কেবলই হলে হয় এ ডিঙি যদি আল পার হয়ে অনেকদূর চলে যেতো? যদি বড় পাত্রের ভাক শেৱা যেতো? এই দেশটির কোথায় কতো কি যে আছে বুড়ির কিন্তুই দেখা হলো না। দূরের কেনো কুরুৰ এলে বুড়ি মনোযোগ দিয়ে সে জাহাগার কথা শোনে। শহর কি আলে না বুড়ি। সেখানের মানুষ কেমন তাও জানে না। কতো কি যে ওর জানার বাইরে রয়ে গেলো। বুড়ি এক বুক পিপাসা নিয়ে দূরের দিকে তাকিয়ে থাকে। গফুরের ডিঙি তরতরিয়ে বজে যায়।

- তৃষ্ণি এজো কি ভাবিস বুড়ি?

- ভাবি? কি আবাব ভাবি? ভাবনার কি শেষ আছে?

- বুড়ির হাসি খানখান হয়ে ভেঙে গড়িয়ে থার জন্মের বুকে। গফুর একটুক্ষণ থেমে  
সেই পুরোনো প্রশ্ন আওড়ায়। তোকে আমার বিয়ে করা ঠিক হয়নি বুড়ি?
- কেনো? এবার বুড়ি অবাক হয়।
  - কেনো আবার, তোর সঙ্গে আমার বয়সের ফারাক যে অনেক।
  - তাতে কি, বয়সে কি হয়? ও নতুন ভঙ্গিতে উন্নত দেয়।
  - এ জন্মেইতো তোকে বুঝি না। তোর ভাবনা ধরতে পারি না। হতাম তোর  
বয়সী তাহলে ঠিক হতো।

গফুর একটা নিঃশ্বাস ফেলে।

বুড়ি ট্রোট উল্টে বলে, বুকে কি লাভ? যার থার ভাবনা তার কাছে। তুমি  
বুকলেই বা আমার কি এসে গেলো? আমার অক্ষত ভালো লাগে না। তাছাড়া আমার  
ভাবনা কেউ বেশি বুবতে চাইলে আমার রাগ হয়।

ও আবার হেসে পড়িয়ে পড়ে। ওর অকারণ উচ্ছ্঵াস আজ যেন মাঝা ছাড়িয়ে  
গেছে। নিজেও তা রোধ করতে পারছে না। বুড়ির শরীরের ঝীকুনিতে নৌকার দুলুনি  
বেড়ে থায়। গফুর অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে। কখনোই ওকে বুবতে পারে না। এখন  
বীধা-ভাঙ্গা হাসিও কদাচিং দেখা যায়। গফুর হাসতে হাসতে বলে, এতো হাসিস না  
বুড়ি? জানিস না যতো হাসি ততো কান্না।

- ছাই। তোমার যেহল কথা। হাসি পেলে হাসবো না বুঝি?

বুড়ির হাসি আর থামে না। গফুরও অকারণে হাসে, হোয়াচে হাসি। জোরে জোরে  
বইঠা টানে। জলের কোলে নিবিড় সান্নিধ্য বৌজে ডিঙি এবং সঙ্গে দুটি ক্ষৰ্বার্ত  
প্রাপ্তও। গফুরের মাঝে মাঝে ইচ্ছে করে বুড়ির মতো হয়ে যেতে। বুড়ির বয়সটা ফিরে  
পেলে গফুর পৃথিবীতে আর কিছুই চাইতো না। জমিজমা, ঘরবাড়ি, যাছ ধরার জাল,  
ডিঙি নৌকা সব দিয়ে দিতে পারে ও। কোন দিনই হিসেবী লোক ছিল না। এখন বুড়ির  
সান্নিধ্য ওকে আমূল পাল্টে দিয়েছে। ওকে একটু শুশি করতে পারলে বুক করে থায়।  
যখন বুড়ি মনমরা হয়ে থাকে, হ্যাজার ডাকলেও সাজা দেয় না, কথা বলতে চায় না  
তখন ভীষণ খারাপ লাগে গফুরের। কি করবে বুবতে পারে না। ঘন ঘন ছিকে টানা  
ছাড়া আর কিছুই করার থাকে না। গ্রথম স্তুকে কেন্দ্র করে এখন কোন ইচ্ছেই গফুরের  
ছিল না। অথচ তখন দুঃজনেরই তরা যৌবন। শারীরিক অনেক মাতাল ইচ্ছে ছিলো,  
সান্নিধ্যে ছিল উক্ততা, ছিল আমেজ। কিন্তু সে বৌ গফুরের চেতনা দখল করতে  
পারেনি। সে সহয় গফুর মাঠে মাঠে বেশি সহয় কঢ়িয়েছে। যাত্রা অনে রাত কাবার  
করে ঘরে ফিরেছে। বৌ ওকে কিছু বলেনি। কোনো অনুযোগ করেনি। বরং গ্রথম  
বৌয়ের ভয় ছিল বেশি। সব সহয় আড়িষ্ট হয়ে থাকতো। সে সব নিয়ে গফুরের কোনো  
যাথা ব্যাপ্ত ছিল না। দুটো ছেলে হ্বার পর সম্পর্ক আবো শিথিল হয়ে যায়। গফুরের  
মনে হতো তখন কোনো বক্ষন ছিল না। কিন্তু এখন ও একটা বক্ষনের মধ্যে আছে।  
এই বক্ষন ওকে যতদূর টেনে নিয়ে থাবে ততদূর যেতেই ও রাজি। বুড়ি প্রাণবন্ধ,  
সংতোষ। সহসারের অনেক কিছুই বোঝে না। তবুও বুড়িকেই বেশি ভালো লাগে  
গফুরের। ওর মধ্যে যেনো অতিরিক্ত কিছু আছে। কৈশোরের মোনাগচ্ছে ভরপুর ওর  
নতুন যৌবন। যিটো নোন্তা তেজো সব যিলিয়ে নতুন কিছু। ত্রিবিধ স্বাদ অথচ একটাৰ

সঙ্গে আব একটাৰ অন্তৰ ঘোপায়োগ। গফুৰ তিকভাবে নিজেকে প্ৰকাশ কৰতে পাৰে না। প্ৰথম মৌৰৰে গফুৰ এ ক্ষাম পাইনি। তাহি বুড়িৰ জন্মে সব সহজ যন টামে। বুকটা জেপে থাকে। সাৰাকষণ একটা হ্যারাই হ্যারাই আৰ লাগল কৰে রাখে গফুৰকে। যন বলে জলেৱ টাম কোনদিন বুকি ভাসিয়ে নিয়ে যাবে। তিকি বাইতে বাইতে গফুৰ বলে, আজ আৰ তোকে নিয়ে ঘৰে ফিরৰো নাৰে?

- কোনদিকে যাবে?
- ঘেদিকে দু'চোখ ধায়।
- বেশ যাও। এই আমি জোৰ বৃজলাম।
- তিকি বলি ভুবে ধাৰ?
- ভাবতে কি, তুমি তো আছো।
- বুড়ি পৰম সিন্ধিতে বালেৰ পানি গালে মাখে। দূৰে আকিয়ে থাকে।
- আমি বলি ভাঙ্গাব পঠাতে না পাৰি?
- বুকে নিয়ে ভুবে বৰতকে তো পাৰবে।

বুড়ি হেসে পড়িয়ে পড়ে। গফুৰ কথা বলতে পাৰে না। যুৎসই জবাৰ বুজে পায় না। বুড়িৰ এ কথাৰ পৰ আৰ উন্তৰ হয় না। গফুৰেৱ হঠাতে অনে হয় একটা বছৰ ধৰে এ বালে ও লৌকা বাইছে তবুও কোথাৰ যেনো কি ওৱ দেখা হয়নি। বুড়ি সেৱৰ মাঝুন কৰে দেখাবে। কথনো ইশাৰায় দেখাৰ, কথনো জোৰে আকুল নিয়ে দেখাৰ।

- হী কৰে দেখো কি?
- দেবি তোকে।
- গোৱাই তো দেশো।
- আও তো দেখা হয় না।
- বুড়ি আৰাব হেসে পড়িয়ে পড়ে।
- তুমি অন্যান্যক কেনো বুড়ি?
- কেমন?
- তা তো জানি না।
- তবে যে বললো?
- তাহি তো? গফুৰ মাথা চুলকায়। কেমন তা কি ও নিজেও জানে? আসলে প্ৰকাশ কৰতে পাৰে না। প্ৰাপ্তি আইচাই কৰে ফেঁটে গোলেও অনেক কথা বলতে পাৰে না।
- আমাকে নিয়ে ভোগৰ বুব জুলা না?

- বুড়িৰ কষ্টে তিনি সুন্ত। গফুৰ চৰকে ওঠে।
- কে বললো?
- যাবে যাবে তুমি যে কেমন কথা বল?

গফুৰ হো-হো কৰে হেসে ওঠে। দমকা বাতাসেৱ আচমকা দূৰি যেন।

- তোৱ জন্মা আমাৰ ময়ে যেতেও সুখ তে বুড়ি?
- পানিৰ ডিপৰ বুকে পড়া কেচুল গাছেৰ গোড়ায় লৌকা ধামায় গফুৰ। লৌকা আটিকানোৰ জন্মে লোহার শিকটা পৌঁছে দেয় কানায়। ভালপালাৰ ঘোপকাপে জায়গাটা ছয়দকাৰ। ধৰেৱ নিৰাপত্তা পাবল্যা ধাৰ। বুড়িৰ হঠাতে কৰে ভালোগাপে।
- হাতৰ সদী ঘৰেত

- এখানে প্রামাণে কেন?
- তোর জন্মে। গফুর বুড়িকে কাছে টেনে নেয়।
- জলালগাটা কি সুস্মর! অনে হয় ঘৰ।
- তোর ভালো লাগলোই হচ্ছে।
- আও কি কৰ! চারদিকে লোকজন।
- কোথায় লোক? এখনো পুরো আধাৰ কাটেমি।

গফুর বুড়ির নিয়েও শোনে না। তোরে হিমেল বাতাস ছুটে এসে গায়ে পড়ে। চমৎকার পৰশ দিয়ে উঠাও হয়ে থার। টেক্কুলের ভাল গায়ের ওপৰ। শিরশিৰ অনুভূতি জাপায়। বক্তব্য চোখ থায় সব ধৈয়াটী দেখায়। বুড়ি অন্য কিছু ভাবতে চায় না। বুড়ি এখন নিজেৰ মধ্যে নিষ্পত্তি হয়ে পড়ে। কখনো যে জিনিসটা কাঁধাৰ ভেজন অসহ্য লাগে কখনো নৌকাৰ উদোম হাঁওয়ায় তা অনৰদ্ধা হয়ে ওঠে। কেনো যে ভালোলাগার বন্ধ এত ঘনঘন বদলায়। বুড়ি আপনানে হেসে ওঠে।

- হাড়ো।
- না। তুই বলেছিলি না বুকে নিয়ে ভুবে ঘৰতে? এখন ঘৰবো। সাধ হয়েছে ঘৰাব।
- ইসু শব্দ কড়ো! আমি কি ঘৰেনো পানি যে ভুবে ঘৰবো?
- এখন তাই।
- তাহলে ঘৰ। আমি চোখ বুজলাম।
- গফুর বড় নিঃশ্঵াস নেয়।
- ইচ্ছ করে তোৱ গোটো কামড়ে হিচ্ছে নিই।
- বুড়ি আবাৰ হেসে ওঠে।

মাছ ঘৰাবতে এলে বুঝি কামড়ে কামড়ে শালুক থাও। শালুক না খেলে না কি তোমাৰ মাছ ধৰাৰ নেশা জায়ে না। তুমি শালুক দেখলে পাগল হয়ে ওঠে। আজ্ঞা যখন শালুক থাকে না তখন তুমি কি থাও? তোমাৰ নেশা কি দিয়ে আটকে রাখ?

- আও বুড়ি। বুড়ি-বুড়ি-বুড়ি-

গফুরেৰ কষ্ট জড়িয়ে আসে। গফুরেৰ কষ্ট দিয়ে আৱ শব্দ বেঙ্গলতে জায় না। ও এখন কেনো শব্দ জায় না। চায় নীৰবতা- প্ৰকৃতিৰ ঘায়াময় নিষ্ঠকৃতা।

বুড়িকে সঙ্গে আসলে মাছ আৱ আৱ হয়ে ওঠে না গফুরেৰ। মাছ ধৰাৰ চাইতে বেশি হয় কথা আৱ তাৰও বেশি শুনসুটি। বলুই অৰ্ধেকও ভৱে না। এমন দিনও পোছে যেদিন উকনো জাল উকনোই থাকে, জলে আৱ ভেজে না। বলুই গঢ়াগড়ি থায় পাটিভলে। যেদিন গফুর ঘৰে ফেলে না। বুড়িকে থাটে নারিয়ে দিয়ে সোজা ছলে থায় গঞ্জেৰ হাটে। শূন্য বলুই দেখলে পড়শিৱা হাসাহাসি কৰে। বুড়িকে বীৰা কথা শোনায়। যেদিন বুড়ি চৃপচাল গিয়ে সংজীয় কৰীয়েৰ পালে উঠে থাকে। যেন গফুর কোথায় পোছে ও তা জানে না। মাছ ধৰাবতে না পারলেও গফুরেৰ কেৱল ক্ষেত্ৰ থাকে না। বুড়িকে দিয়ে ছিড়ি বাওয়াটোই যজ্ঞ। আধাৰ থাকতে বেৰিয়ে থার, আধাৰ কাটাৰ আপোই কৰিবে আসে। তবু কখনো কাৱো কাৱো সামানে পড়ে থায়। দু'চার কথা তলচলও সেটা জৰুৰ কৰে নেবে গফুর। এ আনন্দ ওৱ জীৱনে কোনদিন আসবে ও কি তা ভেবেছিল!

জীবনের এ পরিবর্তন গফুরের কাছে পরম বামপীয় মনে হয়। মাঝের বলুইয়ের উকনো-ভেজা হিসেব নির্ভর্ত্ত হয়ে যায়। মনে হয় এসিন প্রতিদিন হোক। বৃত্তি এমনি করে খুব কাছাকাছি এসে ধরা দিক। ঘরে বৃত্তি শায়ুকের অঙ্গে ঘটিয়ে যায়। হিসেব বের করতে ব্যাকুল হয়ে ওঠে গফুর। বৃত্তি নির্বিকার। গফুরের কাছেও ঘৰে না। সঙ্গীয় কলীয়কে নিয়ে মাতামাতি করে। গফুর কৃতিম অভিযোগ করে, হলে দু'টো তোকেই ভালোবাসে বেশি। আমাকে পর করে দিল।

- ছিংসা কর?
- করিছিতো। আকে আকে আমার সব না। তুই জানু জানিস বৃত্তি।
- উহু হোটোই জানু না। ভালোবাসা দিলে ভালোবাসা ছিলে।
- মিছু কথা। ভালোবাসা দিলেই কি আর ভালোবাসা ছিলে? মনে হয় না। নইলে অমি হাপিতোস করি কেনো?

গফুরের জোখের দৃষ্টি বদলে যায়। কষ্টব্যত

- বাধা অঙ্গে কথা বুঝি না। আমার কাজ আছে যাই।

বৃত্তি গফুরের সামনে থেকে সরে পড়ে। কাছে থাকলেই কোন না কোনভাবে ধরা দিতে হবে। ইচ্ছে না থাকলেও দিতে হবে। কিন্তুতৈ যেন গফুরের আশ হোটে না। বৃত্তি সঙ্গীয় কলীয়কে নিয়ে নাহিতে চলে যায়। মন নিয়ে ঘরের কাজ করে। বিরোধহীন দিনগুলো নির্বিবাদে পড়ায়। গফুর হাল যায়, মাছ ধরে, হাটে যায়। বৃত্তি ঘর সামলায়। কখনো ঠিকঠাক সব সামলে যায়, কখনো এলামেলো হয়ে যায়। পাঢ়াপড়শি, আন্তীয়-বজনের দু'চারটো কথা শোনে— গালমাল যায়। তাই বকাবকি করে। মা উপসেশ দেয়। তবুও গুসবের বাইরে বেহিসাবী কল্পনার রাখটো যখন আলগা হয়ে যায় তখন মন কেমন করে। নইলে নিজের মনের মধ্যে একটা নিপুণ সুবের বাঁচা বুনে নিয়েছে বৃত্তি। নিতে বাধা হয়েছে। জানে এর বাইরে ওর কিছু করবার নেই। তাই পারিপার্শ্বিকের ভাষাচোরা, এবড়োখেবড়ো, ওঠানামা, সহজল-অসহজল বিজ্ঞার বৃত্তি দ্রুত কাটিয়ে উঠতে পারে।

কিন্তু বাধ সাধলো প্রকৃতি। অনুভবটা বৃত্তির নিজের মনের এবং সেটা বড় বেশি তীক্ষ্ণ ও অর্থভেদী। যে চপলতা, চাষলজ্য, বাইরের ভাক বৃত্তির নাড়িতে সেই একই তীক্ষ্ণতা ওকে ঠেলে নিয়ে যায় সম্ভানের আকস্মায়। বিবাহিত জীবনের তিন বৎসর ভালোই কেটেছে। চার বছর থেকে ওর হলো বৃত্তির দিন গোলার পালা। আকে মাঝে নিজের শরীরের দিকে তাকিয়ে ওর ঘৃণা হয়। এই শরীরটা কি হা হওয়ার উপযুক্ত নয়? কেনো শরীরের মধ্যে পরিবর্তন অনুভব করে না? কেনো কিন্তু একটা নড়ে ওঠার ধার্জায় আচমকা চমকে ওঠে না? বৃত্তির মন ব্যাকুল হয়ে ওঠে। কারো কাছে খুলে বলতে পারে না মনের কথা। অহরহ নিজের ভেতরে ওমারে আরে। গফুর সম্ভানের জন্য খুব বেশি উচ্চবাচা করে না। হেলেতো রয়েছে। আর না হলেই বা কি? এইজ্ঞ ভালো আছে বৃত্তি, কেমন নির্বাঙ্গ। যখন যা খুশি তখন তা করতে পারে। দিনে রাতে অনেক কাছে পাওয়া যায় ওকে। ছাটোপুতি মাতামাতিতে কোমো বাধা নেই। আসলে গফুর চায় না যে বৃত্তি অন্য কোথাও বাধা পড়ুক। ও আর কিন্তু নিয়ে নিজেকে বাস্ত রাখুক। তাছাড়া একটা বাঞ্ছার বাঞ্ছি কি বসি। খুত! দৰকার নেই। বৃত্তি গফুরের একলার। আর কারো হাতের নদী ছেনেড

নয়। কিন্তু গফুর যাই ভাবুক না কেনো বুড়ির দিন আর কাটতে চায় না। দিন দিন নিজের মনে কুকড়ে যেতে থাকে। এখন বাইরে যেতেও ভালোলাগে না। ঘরেতো মন বসেই না। এখন অন্য কিছু চাই। চারটি বছরের আনন্দ উভ্রজনা বুড়ির জীবনে বোধা হয়ে চেপে বসে। গফুর ওকে সান্ত্বনা দেয়।

- তুই এত ব্যক্ত হয়েছিস কেনো বুড়ি? ছেলেতো আমাদের রয়েছে? ওরা কি তোকে সুখ দেয় না?

- দেয় কিন্তু তেমন করে দেয় না। যাকে মাঝে মনে হয় ওরা আমার কেউ না। এবার আমার নিজের চাই। নাড়িহেঢ়া ধন চাই! আমার শরীরের ভেতর উঠাল পাখাল চাই! আমার-আমার-

বুড়ি আর কিছু বলতে পারে না, মুখে কথা আটকে যায়। কেমন করে গফুরকে বোঝাবে? গফুর পুরুষ। সন্তানের উপলক্ষি এত নিবিড় করে ও কোথায় পাবে? সেজন্য মাঝ পথে বুড়ির কথা থেমে যায়, বুকের দরজা বন্ধ করে ফেলে।

বুড়ির মুখ করণ দেখায়। সেই বাঁধ-ভাঙ্গা হাসি কমে গেছে। চেহারার দীপ্তিময় লাবণ্যে জ্বায়া পড়েছে। বুড়ি আর আগের মতো নেই। বদলে যাচ্ছে। এ পরিবর্তন গফুরকে কষ্ট দেয়। কিছু করতে না পারার অক্ষমতায় চুপসে থাকে। জোরবাতে একা একা জাল নিয়ে বেরলে গফুর সেই উচ্ছ্বাস ফিরে পায় না। যাকে কেন্দ্র করে ওর পৈয়াতাঞ্চিশ বছরের জীবন অর্থবহ হয়ে উঠেছিল। কখনো কাছে বসিয়ে বুড়িকে আদর করে সান্ত্বনা দেয়।

- ছেলের জন্যে অনেক কষ্ট সইতে হয় বুড়ি?

- জানি। কষ্ট না সইলে বুঝব কি করে মা হওয়ার কি জ্বালা। আমার আয় কিছিবা করার আছে? দু'বেলা বাঁধাবাড়া, ঝাওয়া-দাওয়া, ধান সেক্ক, হাস-মুরগির খোয়াড় খোলা? না আমার আরো কিছু চাই। ছেলে-পুলে না হলে আমি নদীতে ভুবে মরবো?

বুড়ি ফিকে হাসে। গফুর চৃপচাপ বসে থাকে। এর বাইরে ওকে আর কিছু বলা যায় না। ও এখন যন্ত্রণা চায়। যন্ত্রণার ভেতর থেকে নিংড়ে আনতে চায় পরিণত আনন্দের ফুল। নইলে জীবন ব্যর্থ। আশা-আকাঙ্ক্ষা ঐ এক জায়গার এসে থেমে গেছে। এমনকি গফুরকেও একপাশে ঠেলে রেখেছে। বুড়ি এখন আর কিছু বুঝে উঠতে চাইছে না। মা হওয়া ওর একান্ত দরকার।

মাঝে মাঝে পড়শিরা খোঢ়া দেয়।

অমন খিঙ্গি মেয়ে খেই খেই করে মাঠেঘাটে ঘুরে বেড়ালে পোলাপান হয় নাকি? ঝাওয়া বাতাস বলে একটা জিনিস আছে না? বেলা অবেলা আছে না? মেয়ে মানুষের সব সময় সব জায়গায় ঝাওয়া ঠিক নাকি?

বুড়োদের মুখ আমটা থেয়ে বুড়ি চূপ করে থাকে। ঝাওয়া বাতাস, বেলা অবেলা যত কিছুই ওরা বলুক না কেন তার সঙ্গে মা হওয়ার কি সম্পর্ক বুড়ি বুঝতে পারে না। তবু কথা বাড়াতে সাহস হয় না। অনেক কিছুই তো ও জানে না। হয়তো গৃঢ় কোন কিছু থাকতে পারে। এ নিয়ে বাড়াবাড়ি না করাই ভালো। ও এখন বিশ্বাস অবিশ্বাসের দোলায় আবর্তিত। কিছুদিন আগে হলেও যেটা সে হেসে উঠিয়ে দিতে পারতো, এখন

কীসের যেন তব। যদি ওর অবিশ্বাসে ক্ষতি হয়? যদি আকারিক্ত ফল লাভ না হয়? বৃত্তি তাই মনেরাখে শুরুক্ষিদের কথা মেনে চলার চেষ্টা করে।

তব হয় এমের টেটিকা ওশুধের ব্যবহার। যত রকমের যত কিছু ধাকতে পারে কোনটাই বাস দেয় না। যে যা বলে বিনারিধার তা বিশ্বাস করে এবং শুব নিষ্ঠার সঙ্গে তা পালন করে। আরো দুটা বৎসর কেটে যায়। প্রছর গোলা শেষ হয় না। আকারিক্ততেও তাটা পড়ে না। বরং তা আরো উন্নত হয়ে ওঠে। আজকাল সলীম, কলীম যখন যা, যা বলে আবশ্য করে তখন যাকে কেবল বিমৃচ্ছ হয়ে তাকিয়ে থাকে। এই শুভটা শুকে একদম বিহুল করে যেলে। তারপর শুকে জড়িয়ে ধরে পাপলের মতো আসর করে। কোন দিন এক কটিকার মূরে ফেলে নিয়ে চুপচাপ পুরুরাঘাটে গিয়ে বসে থাকে। জলের শুকে মাছের ফুটকি কঠিন দেখে। নিজের অঙ্গুরতা কমানোর চেষ্টা করে, নিজের আচরণের জন্যে লজ্জা পায়। সলীম কলীমের মালিন মুখের কথা মনে করে ওর কষ্ট হয়। তবুও নিজের সঙ্গে আপস করতে পারে না বৃত্তি, শুকে আকর্ষ পিপাসা।

মনেরিকলনের এমনি শুভতে একদিন দক্ষিণ পাড়ায় বেড়াতে এলো ওর ছেটিবেলাৰ সঙ্গ নথিতা। অন্যান্যায়ে বিয়ে হয়ে যাওয়াতে ওর সঙ্গে শুব কমই দেখা হয় বৃত্তিৰ। অনেকদিন পৰ নথিতাকে দেখে শুভিৰ আনন্দের সীমা নেই। দুজনে পাসের বাটা সামনে নিয়ে পা বিছিয়ে গল্প করতে বসে।

একধা সেকথাৰ পৰ নথিতাই বাল, তোৱ যেন কি হয়েছে বৃত্তি।

- কৈ কিছু না তো?

- তুই আৱ আগেৰ মতো নেই।

- বয়স হচ্ছে তো।

বৃত্তি আৱ কথা বলতে পারে না। নথিতাও চুপ থাকে।

- তোৱ ছেলে পুলে কঠি নথিতা?

- আটিটি। এক দঙ্গল ছেলেপুলে নিয়ে সাৱাদিনে একটুও সময় পাই না। তুই বেশ নিৰ্বাঞ্চিত আছিস।

- আমি নিৰ্বাঞ্চিত থাকতে চাই না নথিতা।

বৃত্তিৰ মুখেৰ দিকে তাকিয়ে নথিতাৰ শুক মুচড়ে ওঠে।

- তুই শ্ৰীনাইল ধায়ে গিয়ে সিঙ্কপুৰৱ কেশা বাবাৰ নামে মানত কৰ।

নথিতাৰ কথা শুভিৰ দু'কান ভৱে বাজতে থাকে। সক্ষা উত্তৰে গেছে, ঘৱে আলো দেয়া হয়নি। সলীম কলীম খেলা শেষে ঘৱে ফিরেছে। গফুৰ এখনো ফিরেনি। তবু উঠতে পারে না বৃত্তি, চুপচাপ বসেই থাকে। ওৱ হানে হয় নথিতাৰ কথাগলো ঘৱেৰ ভাল থেকে, বাশেৰ বেড়া থেকে, পানেৰ বাটা থেকে, ওৱ শাঢ়িৰ মধ্য থেকে, অনবৰত উঠে আসছে। নথিতা চলে গেছে বেলা থাকতে। অথচ বৃত্তি আজন্তু হয়ে বসে আছে।

প্রতি বৎসৰ শ্ৰীনাইল ধায়ে পৌষ মেলা হয়। হাজাৰ হাজাৰ নারী-পুৱৰ জনয়ে বহুবিধ আকাঙ্ক্ষা নিয়ে এখানে আসে। ধামেৰ বৃক্ষে নিম গাছেৰ নিচে পড়াপড়ি যায়- শুলো যাবে মুখে শুকে গলায়। এখানে মানত কৰলে বাষ্প্যা নারী সজ্জান পায়, অসুস্থ কলী শুষ্ক হয়, ক্ষেত্ৰে ফসল ফলে, ক্ষেত্ৰে পোকামুক্ত হয় ইত্যাদি। ধামেৰ প্রতিষ্ঠাতা কেশাৰাৰা সিঙ্কপুৰৱ। শ্ৰীনাইলেৰ দশ বিশ ত্ৰিশ মাইল পৰ্যন্ত তাঁৰ নাম কিংবদন্তিৰ হাতৰ নদী প্রেনেড।

মতো প্রচলিত। পৌষ মেলায় হাজার হাজার লোকজনের উপস্থিতি সে কথাই প্রমাণ করে। তাঁর নামে সোয়া পাচ আনার পুটলী ভঙ্গি ভরে নিম গাছের ডালে বৈধে রাখলে আকস্মিক ফুল পাওয়া যায়।

নমিতার অসুস্থ স্বামীকে ভাঙ্গার সারাতে পারেনি। সাধ্যমতো বড় বড় ভাঙ্গারের কাছে গিয়েছিল ও। জমি বিক্রি করে টাকা পয়সা খরচ করেছিল, লাড হয়নি কিছু। হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দিয়েছিল ভাল হবে না বলে। বলেছিল, তোমার স্বামী যা যা থেকে ঢায় তা খাওয়াও গিয়ে। আর কোনো আশা নেই।

হাসপাতাল থেকে নিয়ে আসার পর বুক ভেঙে গিয়েছিল নমিতার। চারদিক অঙ্ককার দেখছিল। সামনে বৈধবৈয়ের এক নিয়েট শূন্যতা। আর সেই সঙ্গে অভাবের বিরাট হাঁ করা গর্ত। দিশেহারা নমিতার কিছুতেই বিশ্বাস হয়নি যে ধূকে ধূকে মরাবে অক্ষয় দাস। ভেঙে না পড়ে মনে মনে শক্তি সঞ্চয় করেছিল কেবল। শেষ পর্যন্ত অনেক আশা নিয়ে শ্রীনাইল ধামে গিয়েছিল। ভারপুর থেকে আস্তে আস্তে ভালো হতে থাকে অক্ষয় দাস। এখন একদম ভালো। সে সম্পর্কে কথা বলতে গিয়ে নমিতার কঠ ভঙ্গিতে গদগদ হয়ে গঠে। অদৃশ্য সে মহান পুরুষের প্রতি প্রণাম জানায়। সেই তাঁর সিদ্ধির সিদুর হাতের শীর্খ অক্ষয় রেখেছে। আঁচলে চোখের জল মুছে নমিতা বলেছিল, খাওয়াতে পারি না তবু যে ভগবান আমাকে কেনো এতো ছেলেপুলে দেয়।

বুড়ি চমকে নমিতার মুখের দিকে তাকায়।

খাওয়া পরার বড় কষ্ট যে বুড়ি। মানুষটা একোগুলো পেটের অন্ত জোগাতে পারে না। ভগবানকে রাতদিন বলি আর না। তবু আবার এসে গেছে, হাস ভিনেক চলছে।

বুড়ি বিহৃত হয়ে তাকিয়ে থাকে। নমিতা চলে গেছে অনেকক্ষণ। বুড়ি এসবই ভাবে। সব কিছু তালগোল পাকিয়ে যায়। নমিতার অক্ষয় দাস বেঁচে গেছে, নমিতা বেঁচে গেছে। ওর মতো গভীর বিশ্বাস না থাকলেও বুড়ি সব কথা একেবারে উড়িয়ে দিতে পারে না। আশয় আকাঙ্ক্ষায় দুলে গঠে ওর দুর্বল মন। সত্যি যদি কিছু ঘটে, সত্যি যদি কোনো অলৌকিক শক্তি ওর জীবনের মরমভূমিতে ফুল ফুটিয়ে যায়। নমিতার পরিত্রক মুখের দিকে তাকিয়ে বুড়ি একটা অবলম্বন ঝুঁজে পায়। নিজের ভিত্তিটা পাকা করে। কিন্তু পরিষ্কণেই নমিতার রুগ্ন-দারিদ্র্য ভরা চেহারার কথা মনে হলে বুক কঁচ করে গঠে। খাওয়াতে পারি না তবু যে এত ছেলেপুলে ভগবান কেনো আমাকে দেয়। ওহ নমিতারে তোর কষ্ট আমি বুঝি না। আমি তোর মতো হতে চাই নমিতা। শ্রীনাইল ধামের দিকে ঝুঁটে যাওয়ার জন্যে একল তাগিদ অনুভব করে। ছোটবেলা থেকে তনে আসা সেই পরিচিত প্রবাসটা যেন আজ বুড়ির কাছে অর্ধবহু হয়ে গঠে, বিশ্বাসে মিলায় বস্তু তর্কে বহুদূর। কিন্তু পৌষ মেলার এখনো আট মাস বাকি। বুড়ি অঙ্ককারে থড়ের স্তৃপের দিকে তাকায়, জমাট অঙ্ককার কেমন লেপটে আছে।

ঐ সলীমের মা ঘরে আলো দিসনি কেনো? কি অলুক্ষণে ঝাজ কারবার যে মেরেটার। সন্ধ্যা উত্তরে গেলো তবু সাক্ষের বাতি নেই ঘরে।

বুড়ি পানের বাটা গুটিয়ে নিয়ে উঠে পড়ে। সলীম কলীম দৌড়ে এসে বুড়িকে জড়িয়ে ধরে।

- মা, মাপো-

- আরে ছাড়, ছাড়! অমন করে ধরলে পড়ে যাবো তো?

- কিন্তু পেয়েছে মা?

- চল খেতে নিছিঃ।

বুড়ি ঘরে আলো ঝালে। কুপির সেই শিখার দিকে তাকিয়ে বুড়ির কেবলই মনে হয়, পৌষ মেলার এখনো আট মাস বাকি। এই দীর্ঘ সময়ের কথা ভেবে ও ঝাঁকি অনুভব করে।

এর মাঝে একদিন সোতরা বাজিয়ে গান গাইতে নীতা বৈরাগিণী এসে উপস্থিত হয়। বুড়ির সঙ্গে ওর অনেকদিনের ঝদাতা। গফুরের সঙ্গে বিয়ের আগে থেকেই। নীতাকে দেখলেই ওর পিছু নিত বুড়ি। ইটিতে ইঁটিতে নীতার সঙ্গে অনেক দূরে যেতো। এক সময় নীতা ওকে ভাগিয়ে দিতো।

- ঘরে যা বুড়ি?

- না। আমাকে তোমার সঙ্গে নিয়ে যাও।

নীতা হা হা করে হাসতো। বুড়ির মাথায় হাত বুলিয়ে বলতো, পাগল। ঘরে যা। তোর জন্যে ঘর আছে। আমার তো ঘর নেই বো।

বুড়ি নীতার কথা বুঝতো না। কেন ওর ঘর নেই এ কথাও বুঝতো না। কিন্তু নীতা ওকে গীয়ের ঐ শিমুল পাছ পর্যন্ত আসতে সিংত, তারপর আর না। ঐ পাছের পর আর কিছুতেই যেতে পারত না বুড়ি। ট্রেচুই হিল ওর সীমানা। নীতা বৈরাগিণী সোজা বাস্ত না গিয়ে মেঠো পথে অন্য গীয়ে যেত। বুড়ি সেদিকে চেয়ে ঘাকত, নীতা গাছ-পাঞ্চালির আড়ালে হারিয়ে যাবার পরও শিমুল পাছের গোড়ায় বসে ঘাকত ও। ঘরে ফিরতে পারত না।

এখনো এ গীয়ে এলে বুড়ির সঙ্গে দেখা না করে ফিরে যায় না নীতা। বয়সের বেশ একটা ব্যবধান সহেও বুড়ির সঙ্গে ওর সর্বিভাব। আজও উঠোনে পা ছাড়িয়ে বসে সোতরার টুটোঁ বাজনার সঙ্গে নীতার কষ্ট এক চমৎকার মিছ রচনা করে-

কঠিন বন্ধুরে-

সুখে না রহিতে দিলা ঘরে

সাজাইয়া পাখদের বেশ

বুরাইলে দেশ দেশভৱে

সুখে না রহিতে দিলা ঘরে-

নীতার উপস্থিতি টের পেয়ে বুড়ি চুলোর তরকারীর ইঁড়ি নামিয়ে হাসিমুখে বেরিয়ে আসে উঠোনে। সজনে পাছের শিচে বসা ঝান্ট শ্রান্ত ধূলোমাখা নীতার চেহারা দেখে বুড়ি পথকে দাঢ়ায়। নীতাকে কেমন বিষণ্ণ দেখাতে, তেলহীন রক্ষ চুলে জটা ধরেছে। বুড়িকে দেখেই বলে, জল দে সই!

বুড়ি ঘটিতে করে পানি নিয়ে আসে। নীতা হ্যে যেতে নিয়ে চক্রচক্র করে শেষ করে দেলে।

- অনেক দূর থেকে আসছি সই। তেক্টোয় প্রাণ বেরিয়ে যাইছিলো। পথে কোথাও দাঢ়াইনি। ভাবলাম তোর কাছে গিয়ে একবারে জল থাব।

- ভালোই করেছিস। কতদিন তোর কথা ভেবেছি আমি। চল ঘরে চল।

হাতের নদী ঘোনেত

- না এখানেই বসি । এই গাছের ছায়াই ভালো । তাহাড়া এমন শীতল হাওয়া ঘরে  
কি পাব? এতক্ষণে প্রাণ ঝুঁড়িয়ে গেলো ।

নীতা কোমরে উঁজে রাখা তামাক বের করে চিবোয় । শ্রান্তির ভাব কেটে যাচ্ছে ।  
ভীষণ ভালো লাগছে । বুড়ি যেন ওর মাঝের পেটের বোন । এখানে এলেই নীতা বদলে  
যায় ।

- এতোদিন আসিস নি যে সই?

- অনেকদিন হলো না? অথচ মনে হয় এই তো সেনিনের কথা । তোর কাছে এলে  
সময়টা বড়ো ভালো যায় রে?

বুড়ি ওর দিকে তাকিয়ে তত্ত্বির হাসি হাসে । তারপর সজনে গাছের সঙ্গে মাথা  
হেলিয়ে চোখ বুঝে থাকে ।

- এতদিন কোথায় ছিলি সই?

- গিয়েছিলাম মনের মানুষের খৌজে ।

- খৌজে কেনো? তোর মনের মানুষ রামদাস কৈ?

- মরে গোছে ।

- মরে গোছে? কি বলিস?

নীতা একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলে, হ্যাঁ, সত্যি ।

- কি হয়েছিল?

বুড়ি চূলোর তরকারির কথা ভুলে গিয়ে ওর সামনে উরু হয়ে বসে । নীতা দোতরায়  
টঁ টঁ টাঁ করে । মাথা ঝুঁকে থাকে কোলের ওপর ।

- ওটা রাখ সই? কি হয়েছিল বল?

- কি হয়েছিল তা বুঝতে পারিনি । সাতদিন একনাগাড়ে জুয়া ছিল । সেনিনটা ছিল  
আঘাতের শেষ । মুষলধারে বৃষ্টি হচ্ছিল ।

- সাগরেন সুবল ছিল আমাদের সঙ্গে । চোখ বুঝে উয়েছিল রামদাস । জুলছিল  
কুপি । দরজার পিঠে হেলান দিয়ে বসেছিল সুবল । বাইরে সোমেশ্বরীর বুকে-  
দেবদারুর পাতায় বৃষ্টির একটানা শব্দ আমি শনছিলাম । তেতরে অসুস্থ রামদাস বেঁচে  
হয়ে উয়ে আছে । আমার মনটা যেন কেমন করছিল । বারবার রামদাসের মুখের উপরে  
ঝুকে দেখছিলাম- দোতরাটা নাড়াচাড়া করছিলাম- কখনো জানালা দিয়ে তাকাছিলাম  
আকাশের দিকে ।

- সুবল জিজ্ঞাসা করেছিল, অমন ছটফট করছে কেনো?

- আমি ওর সঙ্গে কথা বলিনি । আমি দেখছিলাম রামদাসের মুখের জীবার, গাল  
দুটো গর্তে বসে গেছে । মুখের হাড় উচু হয়ে উঠেছে । এই মুখের দিকে তাকিয়ে আমার  
বারবার মনে হচ্ছিল, ও বুঝি আর বাঁচবে না । সময় ফুরিয়ে এসেছে । মানুষের মুখ যে  
মৃত্যুর আগে অমন হয়ে যায় আমি আগে আর তা কোনদিন দেখিনি সই । রামদাস এক  
সময় চোখ মেলে আমাকে বলল, দোতরাটা বাজাত নীতা ।

- আমি একটু অবাক হলাম । ডাকলে সাড়া দিচ্ছিল না- দেখে মনে হচ্ছিল হিঁশ  
নেই, অথচ আমাকে দোতরা বাজাতে বলে । আরো দু'একবার নাম ধরে ভাক্কলাম ।  
সাড়া দিল না । কি আর করি দোতরা টেনে নিয়ে বসলাম । মন ঠিক ছিল না । হাত  
২৩ হাতের নদী ঝেনেড

কাপছিল । বুকের ভেতর ক্ষয় করছিল সই । বারবার চেষ্টা করেও সেদিন গ্রী দোতরায় সুর ওঠাতে পারিনি । কেবল মনে ছাইল, এ ঘন্টটা আমি কোনদিন বাজাতে শিখিনি । রামদাসের কাছে আমি শিখিনি দোতরা ধরা ।

নীতা চোখ খোজে । বৃক্ষের শলাণ ধরে আসে । কথা বলতে পারে না । শৃঙ্খির পটে ভেসে ওঠে সোমেশ্বরীর পাঢ়ে এক ছেটি কুটির । নীতার মুখে বছবার সেই কুটিরের গল্প উনেছে বৃক্ষ । উনাতে উনাতে ওর যেন সব কিছু চেনা হয়ে গেছে । চোখ বুজলেই সেইসব দৃশ্য দেখতে পায় । আরো উনেছে রামদাসের কথা । রামদাস ওর মনের মানুষ । বিয়েকে ওরা পীকার করে না । বিয়ে ওদের কাছে কেবল অনুষ্ঠান । ওতে ওদের প্রয়োজন নেই । ওদের কাছে মনের মানুষই সত্তা । কথনো দেবদারুর ছায়ায় বসে কিংবা সোমেশ্বরীর বুকে পা ঢুবিয়ে দোতরা বাজায় ওরা । কেউ কোনো কথা বলে না । কোন পারি ভাকে না । বাজাসের শব্দশব্দ থাকে না । তখু সোতরার টুঁটাং মৃজনা দেবদারুর পাতায় পাতায় অপজ্ঞপ ছিক্ক বুনিয়ে যায় । সেই কুটিরের চারদিকে আছে শান্ত সবুজের অবিচল নিষ্ঠা । দূরে বেঘালয়ের অস্পষ্ট পাহাড়ের হ্যাতছানি । মীলান্ত দেখায় সে পাহাড়ের মাথা । নীতার কাছে গল্প উনলে বৃক্ষের বুকের ভেতর কাপন জাগে, অজন্ম মুখের পাতান । মনে হয় ও যেন নীতা হয়ে গেছে । ওর জীবনে কোথাও আর কোন বাধা নেই । চলেছে পথে পথে, প্রায় খেকে হায়ে, সঙ্গে ওর মনের মানুষ । সে মনের মানুষের জন্যে বিয়ে নাহক অনুষ্ঠানের দরকার হয় না । লোক-লজ্জার বালাই নেই, তখুই নিজের মনের জলা । তাবৎ শিয়ে বৃক্ষ উদাস হয়ে যায় ।

নীতা জল খায় । মুখ মুছে বলে, তোর কলতে আরাপ লাগছে সই?

- না তুই বল । তোর কথা শোনার জন্যে আমি হ্যাঁ করে তাকিয়ে থাকি ।

- জনিস সেদিন ভয়ানক বেসুরো বেজেছিল রামদাসের সুরের দোতরা । কেন যে অহন বাজছিল আমি নিজেও তা বুঝতে পারিনি । একসময় রামদাস চোখ খোলে । হ্যাত বাড়িয়ে দোতরাটা টেনে নেয় । সুবলের দিকে এগিয়ে দিয়ে বলে, এটা কোকেই দিলাম সুবল । তুই বাজাবি । তারপর রামদাস আমার দিকে তাকিয়ে বলেছিল, আমার দোতরায় তুই আর সুর তুলতে পারবি না নীতা ।

আমার চোখে জল এসেছিল । আমার বুক ভেঙে যাচ্ছিল সই । আমি রামদাসের হ্যাত আমার বুকে চেপে ধৰেছিলাম । ওর কাছে ক্ষমা দেয়েছিলাম ।

- আমার কেন এহন হলো রামদাস?

ও সে প্রশ্নের উত্তর দেয়নি ।

- আমার আর সহয় নেই বে । তুই তোর মনের মানুষ বুজে নিস ।

রামদাস ইশ্বারায় আমাকে কাছে ঢেকে বসায় । মাথায় হ্যাত রাখে । বলে, কাদিস না । চোখের জল সইতে পারি না । আমাকে সুখ দিতে চাইলে চোখের জল মোচ । নীতারে কেউ কারো জীবনে থাকে না । কাজিকে না কাজিকে যেতেই হয় । সেজন্য আমার মুখ নেই । তুই আর আমি যে ক'নিন ছিলাম ভালোই ছিলাম ।

রামদাসের ঐ কথায় সুখ ছিল না সই । ঐ কথায় কি আর জোখের জল ঠেকিয়ে রাখা যায় । রামদাসের বুকের ওপর মাথা রেখে সারাবাত কেনেছি আমি । ও আর কোনো কথা বলেনি । অনুভব করেছিলাম রামদাসের বুকের শুকধুকানি কেবল আস্তে হাতর নদী ঝেনেড

আন্তে কয়ে আসছে। সুবল দরজার কাছে মাদুর পেতে গয়েছিল। আমি একলা মানুষটাকে আগলে বসেছিলাম। বাইরে তুমুল বৃষ্টি। পুরো বর্ষায় অমন বৃষ্টি আর কোন দিন হয়নি। বাতাসে কুপি নিভে যায়। কি যে আধার ছিল সই। ভীষণ ভয় করছিল। মনে হচ্ছিল আমিও বুঝি ঘরে যাচ্ছি। শেষ রাতে রামদাস মারা যায়।

নীতা উদাস চোখে চূপ করে থাকে। ঘটির জলটুকু এক ঢেকে শেষ করে। বুড়ি একদৃষ্টি ওর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে।

জানিস সেনিন বাকি রাতটুকু আমি বৃষ্টিতে ভিজেছিলাম। বৃষ্টির অমরাৰ শব্দ রামদাসেৰ গানেৰ মতো লাগছিল। রামদাসেৰ গলা বড় মিঠি ছিল সই। আমি পাগল হয়ে উঠেছিলাম। সুবল একবাৰ বাঁকা করে তাকিয়ে বলেছিল, রামদাসকে কি ধূয়ো ফেলেছো বৃষ্টিৰ জলে? আমি ওৱা কথাৰ উভৰ দেইনি। এই কথাৰ কি উভৰ দেয়া যায়। তুই বল সই? পৰদিন সকালে বৃষ্টি থামলে আমৰা দু'জনে রামদাসকে ভাসিয়ে দিয়েছিলাম সোমেশ্বৰীৰ বুকে। তাৰপৰ কোলাকুলি কাঁধে নিয়ে যখন বেৰিয়ে পড়ি তখন সুবল দোতৰা বাজাঞ্চিল।

বললাম, সুবল এখানে তুমিই থাকো। আমি আৱ কোনদিন ফিরবো না।

- সে আমি জানি।

সুবল মুখ না তুলেই বলেছিল।

- তুমি অনেকে বেশি বোঝ সুবল।

সুবল আমাৰ কথাৰ জবাৰ দেয়নি। ফিরেও তাকায়নি। কেন যে ও আমাকে পছন্দ কৰতো না বুঝাতাম না। ওৱা কাছে থেকে সাড়া না পেয়ে আমি আৱ দাঢ়াইনি। কোন দিন সোমেশ্বৰীৰ ধাৰে ফিরেও যাইনি।

পথই হলো আমাৰ ঘৰ। বছদিন বছ জায়গাৰ ঘুৰে বেড়িয়োছি সই কিন্তু সুখ পাইনি। কত আখড়ায় গেলাম। কিন্তু শাঙ্কি কৈ? কেউ কেউ আছে সই পথেৰ ধূলোৰ মতো। না চাইলেও পায়ে এসে জড়ায়। কেউ আকাশেৰ মেঘ। হাপিত্যেশ কৰলেও বৃষ্টি হয়ে নামে না। এ কৰেই তো পথ চলি, মন না চাইলেও চলতে হয়।

নীতা গান ধৰে-

সুজন মন আমাৰ

খুজে দেখ তুই

তোৱ মনেৰ মানুষ কই?

নীতা গান গায়, অনেকটা গুনগুনিয়ে, দোতৰার শব্দ নেই।

বুড়ি চুপচাপ বসে থাকে। গান শোনাৰ চেষ্টা কৰে। নীতার সঙ্গে কথা বললেই ওৱা মন অস্তিৰ হয়ে ওঠে। নীতা বুড়িৰ জীবনে এক নিষিদ্ধ বাহকেৰ মতো। নিষিদ্ধ জগতেৰ খবৰ বাবে নিয়ে আসে। যে খবৰে ওৱা কোনো অধিকাৰ নেই। বুড়িৰ হাত্তাখ মনে হয় ওৱা মনেৰ মানুষ নেই। গফুৰ ওৱা মনেৰ মানুষ হতে পাৰেনি। ওদেৱ জীবনে কেবল অনুষ্ঠান সত্য। অনুষ্ঠানেৰ জেৱ টেনে একটা মেৰি লৌকিকতা বজায় রাখতে হয়। সমাজেৰ নামে, ধৰ্মেৰ নামে। আৱ এজনোই নীতা যা পাবে বুড়ি তা পাবে না। নীতার জীবন দক্ষিণা বাতাস। যেদিক খুশি সেনিক বয়। আৱ বুড়ি? বুড়ি বছ ঘৰেৰ গুমোট গৰমে তালপাতাৰ ক্ষীণ বাতাস। কোন দিকেই নড়তে পাৰে না। ইচ্ছে মতো ছোটা যায় না।

বিয়ে নামক অনুষ্ঠান আৰ গফুৰ নামক স্বামী দুটোই এখন বুড়িৰ জীবনেৰ একমাত্ৰ সত্ত্ব। এ গণ্ডিৰ বাইৰে বুড়িৰ আৰ কিছু কৰাৰ ক্ষমতা নেই।

হঠাৎ মীতা গান ধারিয়ে বুড়িৰ দিকে অবাক হয়ে তাকায়।

- তুই যেন কি ভাৰছিস সই? তোৱ কি হয়েছে রে?

মীতা দৰদ দিয়ে বুড়িৰ সঙ্গে কথা বলে।

- আমি যদি তোৱ মতো হতে পাৰতাম।

- যা এ জীবন আৰাৰ কেউ চায় না কি। তোৱ কত সুখ! তুই কেনো আমাৰ মতো ভবঘূৰে হতে যাৰি। তোৱ মতো জীবন পেলে আমি আৰ কিছু চাইতাম নারে? এমন গোছানো সংসাৰ, স্বামী, ছেলে-

- ছেলে? বুড়িৰ কষ্ট যেন চিৰে যায়।

মীতা একটু বিমুচ্ছ হয়ে তাকিয়ে থাকে। ব্যাপারটা ও জানে। বুড়ি কষ্ট পাৰে এটা ও ভাৰেনি। বুড়ি আঁচলে চোখ মোছে। মীতা ওকে খুশি কৰাৰ জন্মে উচ্ছ্বসিত কষ্টে বলে, আসছে পৌৰ মেলায় তোকে আমি শ্ৰীনাইল ধাম নিয়ে যাব সই। কেশা বাবাৰ নামে মানত কৰলে নিৰ্বাণ তোৱ ছেলে হবে। কেশা বাবা সিঙ্কপুৰুষ। কত লোক যে ওখানে যায় না দেখলে তোৱ বিশ্বাস হবে না। ওখানে পেলে পৱাণ্টা একদম শীতল হয়ে যায় রে সই।

নথিতাৰ মতো ভক্তিতে গদগদ কৰে মীতাৰ কষ্ট। একই বিশ্বাসেৰ আবৃত্তে মীতাৰ দোলাহিত। বুড়িৰ মন চক্ষুল হয়ে ওঠে। ইচ্ছে কৰে এখনই ছুটে যেতে। নথিতাৰ কীৰ্তি সূত্ৰ নীতা আৱো পাকাপোক কৰে দিল। বুড়িৰ মন হালকা হয়ে যায়। এখন এই দুৰ্বল সহায়ে ওৱ মন সবসময় একটা অবলম্বন কুঝে বেড়ায়। কেউ কিছু বললে সেটা অনবৰত শক্তিৰ কলঙ্গ বইতে থাকে। মনেৰ গুমোটি কেটে যায়। বুড়িৰ কষ্ট আৱ ঘুণপোকা হয়ে হৃৎপিণ্ড কেটে ঝাঁকুৱা কৰে না।

- তুই হাত-মুখ ধূয়ে নে সই। আমি বাবাৰ ব্যবস্থা কৰি।

নামিৰে রাখা তৰকারিৰ হাঁড়িটা আৰাৰ চুলোয় চাপায় বুড়ি। তড়িঘড়ি কৰে রাখা শেষ কৰে। কলাপাতা কেটে এনে নীতাকে ভাত খেতে দেয়। নীতা বাসনে থায় না। মাঞ্চের মাছেৰ ঝোল দিয়ে গৱম ভাত, সেই সঙ্গে ডিমাই শাকেৰ ভাজি। অপূৰ্ব লাগে নীতাৰ। এখানে ওখানে ঘূৰে বেড়ায় বলে খাওয়াটা সব সহায় ঠিক হয় না। ভাঙ্গাড়া ভিক্ষেৰ চালে কি ভাত হয়? হয়তো জাউ। নীতা মনে মনে হাসে। খাওয়াৰ জন্মে ওৱ লোভ নেই। কতোদিন ভাত না খেয়ে কাটিয়ে দেয় তাৰ কি হিসেব রাখে! তাৰে বুড়ি ওকে খুব যত্ন কৰে খাওয়ায়। কথনো না খেয়ে যেতে দেয় না। আৱ বুড়িৰ হাতেৰ রাখাৰ জন্মে নীতাৰ জিজ্ঞে জল গড়ায়। কি যে ভালো লাগে! খেয়েদেয়ে পান মুখে দিয়ে নীতা দোতাৱা আৱ পোটলা-পুটলি নিয়ে উঠে দাঁড়ায়।

- আসি রে সই!

- কোথায় যাবি এখন?

নীতা হেসে উত্তৰ দেয়, মনেৰ মানুষেৰ বৌজে। যতদিন না পাই ততদিন বৌজারও শেষ নেই। পথে পথে ভিক্ষে কৰি আৱ গান গাই। মনেৰ মানুষ না হলে তলে নারে। একলা পথ চলা বড় কষ্ট। পথেৰ কষ্ট তোকে বুৰাতে হয় না বুড়ি।

হাতৰ নদী ঘোনেত

নীতা ঘন খুলে হাসে। চলতে চলতে গান ধরে-

বজ্র আমার নির্ধনিয়ার ধন।

তারে দেখিলে জুড়ায় জীবন হৌবন।

না দেখিলে মরণ রে—।

নীতা ধূলো-গুড়া পথ দিয়ে চলে যায়। কিন্তু তার ফেলে যাওয়া কথাগুলো সামাদিন বুড়িকে ব্যক্ত করে রাখে। পুরুরে গোসল করতে নেমে থমকে থাকে বুড়ি, তেক্কুল গাছের ছায়ায় দাঁড়িয়ে গায়ছা দিয়ে চুল ঝাড়তে গিয়ে থমকে যায় বুড়ির হাত। চুলোর তরকারি নাড়তে গিয়ে চুপ হয়ে যায় বুড়ি। বারান্দায় বসে বসে আবোল-আবোল ভাবে। দেহে অবসাদ, ক্ষাণি জড়িয়ে ধরে। প্রতিটি আয় প্রার্থিত উদ্দেশ্যনার অভাবে ঝিঞ্চিয়ে থেকে চায়। কি যে ঝালা! গফুর হাটে গেছে। ঘিরবে সক্ষায়। সলীম কলীম ভাত খেয়ে কোথায় খেলতে চলে গেছে। বুড়ির কিছু ভালো লাগে না। যাওয়া-দাওয়ার পর নকশীকাঠা বিহিয়ে সেলাই করতে বসে। নকশিকাঠার রঙিন শুভে বুড়ির জন্মের পরাতে নকসা বুনে চলে। কত উজ্জ্বল সুখসপু বুড়িকে ঘাঁষিয়ে রাখে।

তপুনি সলীম কলীম ছুটতে ছুটতে আসে।

— মা, মা? মা জানো সবিনা-বু না কোথা থেকে একটা ছেটি ছেলে এনেছে। এই এতটুকু?

কলীম হাত দিয়ে দেখায়। ও ছেটি বসে ওর উদ্দেশ্যনা একটু বেশি। সলীম একটু ধীরস্থির।

কলীম বুড়ির গলা জড়িয়ে ধরে।

— মা তুমি আমাদের জন্য একটা বোন আন না?

— আনবো, আনবো। এখন ছাড়।

— জানো মা ছেলেটা না কেমন করে কান্দছিল। তারা তারা তারা.....

কলীম অসুবিধ করে দেখায়। ওদের কাও দেখে বুড়ি না হেসে পারে না।

— আমাদের জন্যে করে বোন আনবে মা? সত্ত্ব করে বল?

— দেখি করে আনা যায়। বললেই কি আর ছুট করে আনা যাবে? দিনক্ষণ ঠিক করে তত্ত্বিন দেখে তারে আনতে হয়। বুকলি বোকা ছেলে?

বুড়ি কলীমের পৃতলি নেড়ে আসব করে।

— সত্ত্ব আনবে তো? তিনি সত্ত্ব কর?

— এই করলাম। সর এখন বেলাগে যা।

কলীমের আবদার সবচেয়ে বেশি। যখন তখন বুড়িকে নাঞ্জানাবুদ করে ছাড়ে। সলীম ঠাঙ্গ। অতোটা আদর আবদারের অধ্যে নেই। ওরা যেমনি ছুটতে ছুটতে এসেছিলো তেমনি ছুটতে ছুটতে চলে যায়। ওরা হাঁটে না। এক পায়ের উপর দাঁড়িয়ে থাকে যেন। কেবলই লাফায়। ছেটি জাড়া কথা নেই। বুড়ির মনে হয় ছেটিবেলায় ও নিজেও অমনি ছুটতো। ছুটতে না পারলে ভালো লাগতো না। ছি-বুড়ি বেলায় কেউ পারতো না ওর সঙ্গে। বাই বাই করে যে ছুটতো ভালো বাবে তাকাতো না। কতদিন গাছ-গাছালির সঙ্গে ধাঙ্গা খেয়ে যে বাধা পেয়েছে। কখনো হাত-পা কেটে গেছে। কোন দিন সেগুলো আমলাই দেয়ানি। কেটে গেলে শিয়ালমুখা দাঁতের তলে ঢিখিয়ে লাগিয়ে

দিত। বক্ত বক্ত হয়ে যেত। জলিল বলত, তুই বক্ত শক্ত হয়ে বুড়ি। কেমন করে যে সহিতে পারিস? আমার কাটিলে কেনেকেটে হলস্তুল বাধাতাম। আগো কাটাকুটি আমি সহিতে পারি না।

বুড়ি হেসে পড়িয়ে পড়ত, তোর ছেলে হওয়াটাই ভুল হয়েছে জলিল। তুই তাহলে বুড়ি হয়ে যা, আমি জলিল হই।

- কি যে আজওবী কথা জলিল হলে তুই কি করবি?

- বাড়ি থেকে পালিয়ে যেতাম। আর কোন দিন ফিরতাম না।

- আহিও তাই করব।

জলিল উদাস হয়ে বলেছিল।

- তুই পারবি কাঁচকলা।

- সেখিস পারব। তবে তোর মতো অত তেজ আমার নাই বুড়ি। তুই যেন কেহন।

বুড়ি তেবে দেখলো এখন আর সেই তেজ নেই গুৱ। ও এখন পালাতে চায় না, চায় বক্সন। চায় মাতৃদেৱৰ পৌৰব এবং অহকোৱ। সলীম কলীম চলে যেতেই বুড়ির মনের সুতো ছিড়ে যায়। গত বছৱা বিয়ে হয়েছে সবিলাব। বছৱ না ঘুৱতেই ছেলে হজলা। বুড়ি কাথা গুটিয়ে উঠে পড়ে। সমস্ত দুপুরটা গুৱ শূন্য জীবনের গুপ্ত হ্যাসফাস করছে যেন। ও উঠোনে নেমে দাঁড়ায়। কোথায় একটা ঘূঘু একটানা তেকে যাচ্ছে। নিখিল দুপুরে ঘূঘুর ভুকের ভেতর কঢ়িকটু শব্দ করে।

বাতের অক্ষকারে গফুরের কাছে কথাটা বলতেই গফুর হেসে চুপ করে যাব। বুড়ির বেদনাকে ও সবসহয় সহানুভূতির সঙ্গেই মেঘেছে। কখনো রাগ করে, বিকল মনোভাব প্রকাশ করে অথবা পাড়াপড়শীর মতো বুড়ির বক্সাত্তুকে ব্যঙ্গ-বিক্রিপ করে বিরক্তি প্রকাশ করেনি। ওর আকাঙ্ক্ষাকে একান্ত স্বাক্ষাবিক বলেই ধরে নিয়েছে। সন্তান কাহলা গফুরের যথো ধাকলেও সেটা কত প্রবল নন। দুটো ছেলে তার রয়েছে। বুড়ির না হলেই বা কি? ববৎ এই ভালো। বুড়ির এই সপ্রতিভূত গফুরকে ভয়ানক আনন্দ দেয়। জেলে হলেই তো বুড়িকে আর এখনকার মতো এহন করে কাছে পাওয়া যাবে না। আজও গফুর বুড়ির কথার কোন উন্নত না দিয়ে পাশ ফিরে শোয়। সুমুৰাব চেষ্টা করে। ওর ধারণা সন্তান যদি হয় এমনিতে হবে। ট্রিসব মানন-টাননে কিছু হবে না। গফুরের নির্বিকার আচরণে ওর ঘনটা যেন কেহন করে। ঘূঘু আসে না।

গফুরের পিঠে হাত দিয়ে ঠেলা দেয়। ভাতে।

- কিছু বলছ না যে?

- বাড়মুক, তাবিজতুমার, গাছগাছালির গুমুধ সবই তো হলো আর কত করবি বুড়ি?

- এইবাব শেষ। আর কখনো তোমাকে বলব না।

বুড়ির কষ্ট কজুগ শোনায়। বেঁচে ধাকার শেষ তৃপ্তিকু আঁকড়ে ধৰাব জন্মে মরিয়া হয়ে উঠেছে।

- তুই কিছু জানিস না বুড়ি। শ্রীনাইল ধাম পাকা হয় আইলের পথ। তিন মাইল হৈটে, তিন মাইল গজুর গাড়িতে। বড় কষ্ট। পারবি না যেতে।

হাতের নদী প্রেমেত

- শুর পারবো। তৃষ্ণি দেখে নিও। গোপো তৃষ্ণি না কর না। বুড়ির কঠ মিনতিতে ভেঙে পড়ে। সেই কঠগৱে এমন একটা সমর্পিত আবেদন ছিল যে গফুর আর না করতে পারেনি।

- আজ্ঞা ঠিক আছে। সময় হলে নিয়ে যাব। তাও যদি তোর মনের সাথ যাই। গফুরের বুকে মুখ ঝঁজে ঘটিগতি দয়ে পড়ে বুড়ি। শুশি শুশি লাগছে। আজ রাতে গফুরের ইচ্ছের কাছে নিজেকে একদম নিবেদন করে দেয়। একটা কথাও বলে না। একটা আপত্তি না। পলকে অনুভূত করে শুর নিজের ভেতরেও কেবল একটা ইচ্ছ সমস্ত রক্তে চলাচল করে। বাতের অক্ষকারের মতো সব আকাঙ্ক্ষাও গাঢ় হয়ে ওঠে। বাহিরে লক্ষ্মী পেঁচা ডাকে। হয়তো আকাশে ঢাঁদণ আছে। বাঁশবন সবুস্ত করে। তোরবাতে দুজনে ডিঙি নিয়ে চুপি চুপি বেরিয়ে পড়ে। আজকের উদ্দেশ্য আর মাছ ধরা নয়। খালের বুকে নিজের শুশি ঝড়িয়ে দেবার বাসনায় বুড়ির তাপিদ ছিলো বেশি। আর গফুরতো উন্মুখ হয়ে থাকে। এমনি করে বুড়ির খেয়ালের প্রাতে ভুবে যাওয়ায় কি যে আনন্দ! কাদার গায়ে খালের জল ছলাছ ছলাছ করে। পাড়ে নীরবে দাঢ়িয়ে আছে কাশবন। লম্বা লম্বা ঘাসের মাঝে দেখা যায় পানির তলে। কেমন কাল দেখায় পানি। সে পানিটে নিজের জ্বায় দেখতে পায় না বুড়ি। দেখার চেষ্টাও করে না। এখন আর অন্য কিছুতে যন মেই ওর। পাটাতনের গুপর শাস্ত হয়ে বসে থাকে। মনে মনে ভাবে, গফুরের এখন শালুক কামড়ে খেতে ইচ্ছ করছে। গফুর যে কি! শালুক পেলে মাছের কথা বেয়ালুম ভুলে যায়। নৌকায় এলেই ও বেশি ঝুকছুক করে। গফুর বলে শব্দের চাইতে নৌকায় পেতে শুর লাগে। ফাঁকা মাটের নিকে তাকিয়ে বুড়ি হ্যাসে। ডিঙি করতারিয়ে চলে। গফুর নিষ্পত্তি কোন নিরাপদ জায়গা থোঁজে। যেখানে নিবিড় আজ্ঞাদম প্রাকৃতিক উষ্ণতা দেয়। গফুরের মুখের নিকে তাকিয়ে বুড়ি ওকে বুঝতে চেষ্টা করে। কিন্তু অক্ষকারে কোন ভাবান্তর লক্ষ্য করা যায় না। এখন ওর জলিলের কথা মনে হয়। জলিল ওর শৃঙ্খলট দখল করে নেয়। ও কিছুতেই জলিলকে তাড়াতে পারে না। বুড়ির বিয়ে হবার পরই পালিয়ে শহরে চলে যায়। বিকশা চালায়। শহরে নাকি ও বেশ জালোই আছে। জলিল গাঁও এল ওর কাছে শহরের অনেক গল্প শোনে বুড়ি। তবতে তবতে তন্মতে তন্মত হয়ে যায়।

জলিল একদিন চুপি চুপি বলেছিল, আমার সঙে যিয়ে হলে তোকে আমি শহরে নিয়ে যেতাম বুড়ি। বুড়ি ওর কথায় বাগ করতে পিয়েও পারেনি। আসলে এটাই ইওয়া উচিত ছিল। জলিল পালিয়ে যাবার পর কত জায়গা ঘুরেছে, কত কাজ করেছে। চায়ের দোকান, মানুষের বাসা, হোটেল, হোটির গ্যারেজ ইত্যাদি অনেক জায়গার পর ও এখন রিকশা চালায়। বুড়ির বুক কেবল করে। আজ্ঞা জলিল কি ওর মনের মানুষ হচ্ছে পারতো? এটা কথমও ভেবে দেখেনি ও। অনবরত জলিল ওর জনয়ে লেন্টে যায়। আস্তে আস্তে জলিল ওর শরীরে প্রসারিত হচ্ছে থাকে। বুড়ি শক্ত করে নৌকা চেপে ধরে। দাঁত কিড়মিড় করে।

- তোর কি হয়েছে বুড়ি? কি ভাবছিস যেন?
- জলিলের কথা জাবছি?
- জলিল? গফুর ভুক্ত কুঁচকে তাকায়।

- জলিলের কথা ভাবছিস কেন?

- এমনি। মনে এলো তাই।

বুড়ি খান-খান হাসিতে ভেতে পড়ে। চরাচরের অক্ষকার ফিলে হয়ে আসছে। গফুরের হাতের বৈঠা থেমে যায়। সেই পরিচিত তেক্তুল পাছটার কাছে এসেছে ওরা।

- কি তব পেলে নাকি?

- কত ধরনের বসিকতা যে তৃই জানিস বুড়ি?

গফুর হেসে সহজ হ্বার টেঠা করে। ডিঙি বাঁধার জন্যে লাক দিয়ে নামে। বুড়ি মনে ছানে হাসে। গফুরের কাছে গুটা বসিকতা হয়েই থাক। ও আবার নিজের মধ্যে গুটিয়ে যায়।

পৌষ মেলার দুদিন আগে মীতা এসে হাজির। সঙ্গে তার সঙ্গী চরণদাস। বেঁটেখাটো ফর্সা, যোটা মানুষটি। মুখে হাসি লেপেই থাকে। গানের গলা জল না। ফ্যাসফ্যাস করে কঠ। দোতরার টুটোৎ শব্দে বুড়ি ঘৰ থেকে ঝুঁটে আসে। ধানের মাড়াই হচ্ছে উঠোনে। পা যেলার আয়গা নেই। বুড়ি চরণদাসকে দেখে ঘমকে দাঢ়ায়। মীতা হাসে।

- অমন করে দেখছিস কি সই? মনের মানুষ খুঁজে পেরেছি রে।

- ওয়া, তাই নাকি।

বুড়ি ফিল করে হেসে ফেলে। ধান মাড়াইয়ের পাশ দিয়ে ওনের ভেকে এলে বারান্দার বসায়। কাখলাগলো অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে। মীতা পৌটলা-পুটলি নামিয়ে পা ছড়িয়ে বসে। ধূলি-ধূসরিত পা। রক্ষ চুল বাজাসে ওড়ে। পায়ে-পিঠে ঠিকমত কাপড় নেই। সব এলোমেলো। জোরে একটা শাস টেনে বলে, কাঁচ ধানের গুঁড়ে মন ভয়ে গোলো সই। তোর যত্তে সারা বছর এমন ধানের মধ্যে থাকতে পারলে জীবনে আর কিছু জাইতাম না।

- তোকে কি কারো ধরে রাখার সাধ্য আছে সই। পথে পথে না ঘুরলে তোর জনহই বৃথা।

মীতা মুখ নিচু করে হাসে।

- জল দে সই।

বুড়ি পানি আনতে যায়। চরণদাস দোতরা বাজায়।

- তোমার সই মন না।

- মনে ধরলেই বা কি এসে যায়?

চরণদাস মুখ টিপে হাসে। বুড়ি ঘটি-ভরা পানি লিয়ে আসে। মীতা অর্ধেকটা খেয়ে চরণদাসকে দেয়। চরণদাস এক চুমুকে বাকিটা শেষ করে। বুড়ি হাঁ করে থাকে।

- ভাগাভাগি কেন? আর দেব?

- আমরা অমন করেই থাই। নইলে পেট ভয়ে না।

মীতাকে আজ একদম অন্যরকম লাগে। এই মীতাকে বুড়ি যেন ছেন না। বুড়ির সঙ্গে ওর অনেক তফাত।

- যাবি না সই পৌষ মেলার? তোকে নিয়ে এলাম?

হাতের নষ্টী প্রেনেড

- যাব সই যাব। সলীমের বাপ গজুর গাড়ি ঠিক করতে গেছে।

বুড়ির চোখে-মুখে শুশির রেখু ছড়িয়ে যায়।

- ও তুই গজুর গাড়িতে যাবি? আমাৰ চৰণ দু'খানাই ভৱসা। সঙ্গে আমাৰ চৰণদাসও যায়েছে।

চৰণদাসেৰ দিকে তাকিয়ে অৰ্পণূৰ্ণ হাসি হাসে মীতা। চৰণদাস চোখ টিপি দেয়। তাৰপৰ আবাৰ দোকৰাৰ ওপৰ ঝুকে পড়ে। বুড়ি ওদেৱ ভাৰসাৰ দেখে অবাক হয়। ভালও লাগে। মনে হয় গফুন না হয়ে জলিল হলে হয়ত ওৱা জীৰনটা এমনই হতো। কাহলাৰা হৈই হৈই কৰে গজু তাড়াচেছে। ধান মাড়াই হচ্ছে। এ সময়টা ভীষণ ব্যাস থাকে বুড়ি। ছবিগুলো ওৱা মনেৰ মধ্যে ওলোটি পালোটি থায়।

আমৰা উঠি-ৱে সই। এখনি রণনি কৰা দৰকাৰ। মহিলা আবাৰ ঠিকমত পৌছতে পাৰব না। জানিস তো পথে পথে কৰত জায়গায় বসতে হয়।

বুড়ি ঘৰে পিয়ে ঢালা ভৰ্তি বুড়ি আৰু পুড়ি নিয়ে আসে।

- তোৱ তাড়া আছে। আমাৰ তো বাবা হয়নি সই। এখন এই খা।

- খাও ঠাকুৰ। সই আমাদেৱ পেসাল দিয়েছে।

মীতা এক মুঠি বুড়ি গালে পুৱে।

সই আমাদেৱ যা দেৱ তাকেই অন ভৰে যায়। চৰণদাস মুখ তোলে না। লৰা বাবৰি ঘাড়েৰ ওপৰ ছড়িয়ে থাকে। টুটোৎ কৰে দোকৰা বাজায়। যেন চৰণদাসেৰ অন্য কোন দিকে মন নেই। বুড়ি চৰণদাসেৰ দিকে তাকিয়ে থাকে।

- কি গো ঠাকুৰ তুমি যে আমাৰ সইয়েৰ দিকে মুখ তুলেই চাইছ না?

- ভোয়াৰ ঠাকুৰ বাসেৰ নাগৰ নহয়। বুড়ি বিলখিলিয়ে হাসে।

- দিল তো সই ভোয়াকে ঝুকে? মীতা চৰণদাসেৰ হাঁটুতে চাপ দেয়।

চৰণদাস কপালেৰ উপৰ এসে পড়া চূল হাত দিয়ে পিছনে ঠেলে বড় বড় চোখে বুড়িৰ দিকে তাকাৰ। সে মুঠিতে বুড়ি ছকচকিয়ে যায়। কিছুটা বিৰুত বোধ কৰে। চৰণদাসও চোখে চোখ রেখে থলে, সে কি আৱ যেখানে সেখানে পড়ে সই? জায়গামত না পড়লে যে বস পৰিয়ে যায়।

- ওয়া তাই নাকি? তোৱ ঘনেৰ যানুষ চুপচাপ থাকলে কি হবে সই কথাৰ কীৰ তৈয়ি কৰে রাখে। জায়গা মত ছুঁড়ে মেৰে একদম ঘায়েল কৰে দেয়।

চৰণদাস কিছু বলাৰ আগে বুড়ি রঞ্জেতস দিয়ে পালায়। ওৱা দু'জনে হাসতে থাকে।

মীতা ফিসফিসিয়ে বলে, যেখানে বস কেলেছো সেটা আয়গামতো হয়েছে তো?

- একদম। না হলে কি আৱ সঙ্গে নিয়ে পথে পথে বুৰি।

চৰণদাস একমুঠি মুঠি গালে পুৱে এবং মুঠি খেতেই মনোযোগী হয়ে ওঠে। মীতা এক হলে মুঠি ঠিৰোয় আৱ ধান মাড়াই দেখে। এ দৃশ্যৰ সঙ্গে ওৱা জীৰনেৰ কোন যোগ নেই। কেবল ভিজে নিয়ে সঁক্ষিপ্ত থাকতে হয়। গোলা ভৱা ধান কি মীতা জানে না। পৰাক্ষমে ও হেসে ওঠে। এ বক্ষন ও তায় না। এৱে চেয়ে পথে পথে ঘোৱাতৈই আনন্দ বেশি। সব কাজ কি আৱ সবাৰ সাজো? চৰণদাস অবাক হয়, হাসছিস যে?

- এহনি।

- বল না কি?
- ভাবলাম বুড়ির মতো সৎসার আমি করতে পারব না।
- আর বুড়িও তোর মতো পথে পথে ঘুরতে পারবে না।
- ঠিক। দু'জনেই হাসে।
- এই যে সই এবার তাহলে উঠতে হয়।
- যা-বি? আবার কবে আসবি? বুড়ির কষ্টে ব্যাকুলতা ফুটে ওঠে।
- মেলায় তো তোর সঙ্গে দেখা হবে।
- হবে তো?
- হ্যাঁ-রে হবে। আমি তোকে খুঁজে নেব। তুই কিছু ভাবিস না। এবার তোর মনের সাথ পূরবে সই। তুই দেখিস আমার কথা ফলে কি না?
- তাই যেন হয়।

বুড়ি মনে মনে বলে। ওরা কোলাখুলি কাঁধে বেরিয়ে যায়। ওদের অপস্যমাণ দেহ পথের বাঁকে মিলিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত একদৃষ্টি তাকিয়ে থাকে বুড়ি। এই ধান মাড়াই, গরম, কাজের লোক, সজনে গাছ বুড়ি ভুলে যায়। পুরুর ঘাটে গিয়ে বসে থাকে। মাঝে মাঝে হঠাত করে এই পরিচিত সব কিছু কেমন বিস্মাদ হয়ে যায়। জগন্য, নোনাধরা এই ঘর-সৎসার। বুক ভেঙে যায়। ঢোক ফেঁটে জল আসে। ঘরে ফিরে কাঁধায় মুখ উঁজে প্রাণ খুলে কাঁদে বুড়ি।

পরদিন বুড়িকে নিয়ে রওনা হয় গফুর। পথের কষ্ট বুড়ির কাছে কোন কষ্ট বলেই মনে হয় না। গফুরের মনে হয় ওর ভেতর এখন একটা দৈবশক্তি সম্ভাবিত হয়েছে। সব কষ্ট উপেক্ষা করার জীবনকাটি পেয়েছে। গরন্তি গাড়ির দুলুনির সঙ্গে ভাবনা মিলিয়ে চুপচাপ বসে থাকে বুড়ি। পথের দিকে দু'চোখ মেলে রাখে। হলদী গাঁ-র বাইরে এই প্রথম ওর যাজ্ঞ। গাঁ-র বাইরে গাঁ আছে। মাঠের বাইরে মাঠ। সেই মাঠের উপর দিয়ে দৃষ্টি চালালে কোথাও আটকায় না। পথের বাঁকে নতুন পথ বেরিয়ে যায়। সে পথ কত নাম না জানা দিকে চলে গেছে। ও কেবল অবাক বিশ্বায়ে তাকিয়ে থাকে। গাঁর বাইরে গাঁয়ের রূপ বদলে যায়। পরিচিত গাছ গাছালি, একই ধরনের ঘর-বাড়ি তবুও বুড়ির মনে হয় সব গাছের রঙ আলাদা, সব ঘরের আদল আলাদা। কোন কিছু চিনতে পারছে না ও। বুড়ি বুক ভরে এই অচেনা জায়গায় শাস নেয়। গঙ্গেও পরিচিত হলদী গাঁ-টা কোথাও আর খুঁজে পাচ্ছে না ও। বুক ভরে যায়। ও একটা নতুন জায়গায় আসতে পেরেছে। এই আনন্দকে সম্ভল করে ও কৈশোরে ফিরে যায়। ক্রমেই শ্রীনাইল ধাম এগিয়ে আসে।

গজুর গাড়ির রাস্তা একসময় শেষ হয়। মাঠের আল ধরে পায়ে হাঁটা পথ। ঝুঁতি নেই বুড়ির। ধান কাটা হয়ে গেছে। নেড়া মাঠ খু-খু করে। হাঁটতে ভাল লাগে গুর। ছেটিবেলায় এমনি মাঠে মাঠে কত দূরে বেড়িয়েছে। নাড়ার আগুন জুলিয়ে ছেট হাঁড়িতে রস জাল দিয়েছে। মিটি আলু পুড়িয়ে খেয়েছে। শৈশব আর কৈশোর বুড়ির জীবনের লুকানো গৃহার মণি-মানিক্য। মাঝে মাঝে সে গৃহার দরজা খুলে সেই চাকচিক নাড়াচাড়া করে। ঘন্টের ঘোরে পথ চলতে গিয়ে হোচ্চট খায় বুড়ি। পেছন থেকে ধরে ফেলে গফুর।

- একটু দেখে তনে হাঁটতে হয় তো? ভীমণ লজ্জা পায় ও।

- কেমন করে যে হয়ে গেলো।

বুড়ি একমনে মানুষের পথচলা দেখে এগিয়ে চলে। যতই শ্রীনাইল ধাম এগিয়ে আসে ততই মানুষের সংখ্যা বাঢ়তে থাকে। কাল কাল মাঝা অগলিত হয়ে ওঠে। দূরে মেলার ঘরের চালা দেখা যায়। একটা মন্দু গুঞ্জনও ভেসে আসে। ধান ক্ষেত্রের আল ছাড়িয়ে বুড়ি সহতলে এসে ওঠে। খালি পা ধূলিধূসরিত হয়ে যায়। গফুর ওকে পেছন থেকে ডাক দেয়, আস্তে চল বুড়ি।

বুড়ি আবার লজ্জা পায়। চলার পথ কমিয়ে দেয়। বুড়ো নিমের চিরল পাতায় ওর শপু-রঙিন মনের পট আঁকা হয়ে যায়। ও আবেগে কাপড়ের পুটলিটা বুকের কাছে চেপে ধরে।

ধামে গিয়ে ভঙ্গিভরে বাবার নামে মানত করে নিমগাছে পুটলি বাঁধে। খুলো মাখে সারা শরীরে। তবে অন্যসব নারী-পুরুষের মতো মাটিতে গড়াগড়ি দেয় না। ভীমণ সংকোচ লাগে ওর। কিছুতেই নিজের সঙ্গে পেরে ওঠে না। নিজের মনকে কয়েকবার শাসন করে। মনে মনে বলে, বিশ্বাসে ফুটো রাখতে নেই। তবুও হয় না। নিঃশব্দে খুলো মেখে উঠে আসে। গফুরকে বলে, আমি যে গড়াগড়ি করলাম না ফল পাবো তো?

গফুর হেসে ওর আশংকা উড়িয়ে দেয়।

ওকে কিছু হয় না। বিশ্বাসটাই আসল। তুই যেমন কেশা বাবাকে ধ্যানজ্ঞান করেছিস ওতেই হবে।

গফুরের কথায় বুড়ি আশত্ব হয়। গফুর এখানে এসে মাতামাতি করেনি। কোন কথাও বলেনি। বুড়ির বিশ্বাস ভঙ্গিকে উপেক্ষা করে অবহেলায় উড়িয়ে দিতে পারেনি। যদিও নিজের মধ্যে বিশ্বাস অবিশ্বাসের কোন ভিত্তি খুঁজে পাচ্ছিল না। বিশ্বাসের চাইতে যুক্তি প্রবল হয়ে উঠলে নিজের মধ্যে গুটিয়ে যায় ও। গফুর মনে মনে বুড়ির জন্যে আপস করে।

কেশাবাবার ধামে মানত করার পর হালকা হয়ে যায় বুড়ির মন। গফুরের সঙ্গে ঘুরে ঘুরে মেলা দেখে। মাটির পুতুল, কাঠের খেলনা, কাগজের পাখি, রকমারি খাবার আরো কত কি নিয়ে বসে আছে! সলীম কলীমের জন্যে কাঠের ঘোড়া আর হাতি কেনে। মাটির পাখিও নেয়। কলীমের বায়না ছিল বাঁশি। বুড়ি কেনে হাত-ভর্তি কাঁচের ছুড়ি, নাকের নোলক, কানফুল। বুশির অন্ত নেই ওর। গফুরের দিকে তাকিয়ে বলে, তুমি কি নেবে?

- আমি? আমি আর কি নেবে?

- তুমি একটা গামছা নাও আর একটা খলুই।

- খলুই? খলুই নিয়ে কি হবে? তুইতো আর মাছ ধরতে যাস না?

- এই জন্যেই তো নেবে। আমি গেলে তো আর মাছ ধরা হয় না। শূন্য খলুই ঘরে ফেরে।

- তাই তো, ঠিক বলেছিস। তবু শূন্য খলুই আমার জন্যে ভালই ছিল বুড়ি।

বুড়ি গফুরের চোখে একপলক দৃষ্টি ফেলে অন্যদিকে মুখ ফেরায়। গফুরের কঠে ওর মন ছুঁয়ে যায়। তারপর দু'জনে মিলে গামছা আর খলুই কেনে। ঘুরতে ঘুরতে দেখে ৩৩ হাঙ্গর নদী প্রেনেড

বিরাট এক কড়ই গাছের নিচে নীতা আর চরণদাস দলবল নিয়ে আসের জমিয়ে তুলেছে। বুড়ি থমকে দাঢ়ায়। কত আবেশভরে গান গাইছে নীতা। চোখ দুটো বোজা, টুংটাং দোতরা বাজায় চরণদাস। বুড়ির মনে হয় এ নীতা সইকে ও চেনে না। সেই পরিহাস প্রিয় চটুল নীতা এ নয়। ও এখন অন্য জগতের বাসিন্দা। এ জগৎ বুড়ির একদম অপরিচিত; এ জগতের মর্মও ও বোঝে না। হঠাতে মনে হয় কেশোবাবার ধ্যানে নীতাকেই মানায়, বুড়ি এখানে বড় বেমানান। নীতার মত সব ভূলে ভূবে যাওয়া মন বুড়ি কোথায় পাবে? নীতার কাছে ছুটে যেতে ইচ্ছে করে। বলবে, সই তোর মত আমাকে করে নে। নইলে আমার মনের আশা বোধহয় পূরবে না।

গফুর ওর হাত ধরে টানে, চল। বেলা পড়ে যাবে।

বুড়ি মঞ্চমুক্তের মত বলে নীতা?

- ও এখন তোকে চিনবে না। দেখছিস না ধ্যানে রয়েছে।

- ধ্যান বুঝি? গান গাইছে তো?

- ওই একই কথা। উদের গানই ধ্যান।

- তাই তো।

বুড়ি এতক্ষণে বুঝতে পারে। এই গানই নীতার একমাত্র অবলম্বন। অত লোকের মাঝ থেকে নীতাকে ডাকা সম্ভব হয় না। বুড়ি গফুরের সঙ্গে চলে আসে। দোতরার টুংটাং খনি ওর মনটাকে নরম করে রাখে। নীতার নির্দিষ্ট মুখটা ছবি হয়ে আটকে থাকে মনের পটে। মনে মনে বলে, নীতার বিশ্বাস, নমিতার বিশ্বাস আমার জীবনকে ভরিয়ে তুলুক।

সারাদিন মেলায় ঘোরাঘুরি করে বুড়ির মনে হয় একটা নতুন জীবন ফিরে পাচ্ছে। মুক্তচৰ্ব বিহঙ্গের মতো এমন করে কোন দিন বুড়ি নিজেকে একান্ত আপন করে পায়নি। বুড়ির নিজাত কঠগুলো সুহৃত্ত হিল। এক একটা দিনতো ওর কাছে স্বপ্নের মতো। তাই মনে হয় আজকের এই দিনটি ওর একলার। শুধু ওর নিজের। আর কারো না। আর কোন লোকের নয়। পৌষ্যমেলার শত শত নারী-পুরুষের অন্তরে বুড়ি কেবল নিজের প্রতিজ্ঞবি দেখতে পায়। শুকনো ধূলো-ওড়া দিন। সঙ্গে সঙ্গে উত্তরে বাতাসের কনকনে স্পর্শ, মেলার হৈচৈ কোন কিছুই বুড়িকে ঝাস্ত করে না। ঝাস্ত হয় গফুর। ধূলোয় চোখ-মুখ ঝাঁঝা করে। কাশতে কাশতে গলা চিরে যায়। তাছাড়া এত লোকের ঢেলাঠেলিতে ও আরো বিরক্ত হয়ে ওঠে। শীতের মিটি আমেজময় রোদও আজ কেমন পানসে ঢেকে। মেজাজ তেতে উঠলে গফুরের শরীরের ভেতরটা রি রি করে। তবু বুড়ির অনাবিল আনন্দঘন উজ্জ্বল মুখাব্যব গফুরকে বিমুক্ত করে। অনেকদিন পর বুড়ি যেন কেশোরের লাবণ্য ফিরে পেয়েছে। আর সে কারণেই গফুর ওর মেজাজের ঘোড়টার লাগায় টেনে রাখে। ভেবে অবাক হয় এমন তেজ বুড়ি কোথায় পেল? গফুর কেন জোর করেও এই তেজ ধরে রাখতে পারছে না? কেন বারবার মনের সুতো ছিড়ে যায়?

- গুগো তুমি কি ভাব?

- কিছু না রে বুড়ি। চল ফিরে যাই।

- এখনও তো বেলা পড়েনি। বুড়ির কঠে আপত্তি।

- ছেট দিনের বেলা। ফিরতে আঁধার নামবে!

- নামুক!

বুড়ি ঘাড় বাঁকা করে সোজা হয়ে দাঢ়ায়। গফুর হেসে ফেলে।

- ঠিক আছে চল ভাত খাই।

রাজ্ঞার পাশে বেড়ায় দেরা ছেট এক হোটেলে চুকে ভাত খায় দুজনে। তার পরই শূম পায় গফুরের। কিন্তু বুড়ির বায়না ম্যাজিক দেখবে। অগভ্য ম্যাজিকের জন্মে বসতে হয় গফুরকে। গাছের উঁড়িতে হেলান দিয়ে বসার সঙ্গে সঙ্গে খিমিয়ে আসে শরীর। মাঝে মাঝে বুড়ির ছেলেমানুষী হাততালি ওকে সচকিত করে তোলে কেবল।

ফেরার পথে বুড়ির চোখে বিলম্ব করে আলোর নাচন। আলোর উপর দিয়ে হাঁটা-পথটুকু লাফিয়ে লাফিয়ে পেরিয়ে যায়। বার বার পেছনে পড়ে যায় গফুর। এত ক্লান্ত ও বুরি আর কোনদিন হয়নি। মাঠ পেরিয়ে গরুর গাড়িতে ওঠার পর হাঁফ ছেড়ে বাঁচে। গাড়ির ক্যাচর ক্যাচর শব্দের সঙ্গে শীতের রুক্ষ দিন বার বার হতাশ করে দিচ্ছিল গফুরকে। বুকের ভেতর স্পন্দের নীল পাখিটা আর গান গায় না। গফুরের মনে হয় কি যেন এখানে রেখে যাচ্ছে। শ্রীনাইল ধাম ওর সমস্ত সুখটুকু কেড়ে রেখে ওকে দেউলে করে দিয়েছে। এখন বুড়ির দিকে তাকাতে ভয় হচ্ছে ওর। যদি ব্যর্থ হয় দিন গোনার প্রহর? তাহলে সেই নিরুত্তাপ জীবনহীন বুড়িকে নিয়ে ঘৰ করবে কেমন করে ও? একটা আতঙ্ক বুকে তীরের মত বিধে থাকে। কোনভাবেই তাকে আর টেনে বের করা যায় না। গফুর উদাসী দৃষ্টি মেলে রাখে রুক্ষ মাটি, শুকনো গাছ, হলদে পাতা, বিবর্ণ ঘাসের বুকে। গরুর গাড়ির গ্রাহণীন পথ চলা বুড়ির আশাহীন ভবিষ্যতের মতো।

বুড়িকে বুকাতে পারে না গফুর। বুড়ির ভাসা ভাসা চোখ দুটো কঁজনার উচ্ছাসে মুঝ। যেহেতু বুড়ি জাগতিক সব ব্যর্থতা ও শূন্যতাকে একপাশে রেখে সুবের বীচা বুনতে পারে সেহেতু ওর চোখের তারা সহজেই ভেসে গঠে। ও এখন মরুভূমিতে স্পন্দের ফুল ফুটিয়ে চলেছে। ক্লান্তহীন সে উৎসবে গফুরের কোন আমন্ত্রণ নেই। গফুর এখন পথের ধারে একলা। বুড়ির উৎসবে ধিয়ের প্রদীপ জ্বলছে— বুড়ির উদ্বাসনুর হনয়ে ময়ুর নৃত্যের মতো।

- ওগো ভূমি কি খুশি হওনি? বুড়ি আচমকা প্রশ্ন করে।

- একথা কেন বুড়ি?

- তোমার চোখ-মুখ কেমন শুকনো দেখাচ্ছে?

- ও কিছু না!

গফুর হেসে সহজ হবার চেষ্টা করে। বুড়িও আর প্রশ্ন করে না।

একটু পরেই গরুর গাড়ির মূলুনীতে ঘুমিয়ে পড়ে ও। গফুর দ্বিধাষ্ঠিত মন নিয়ে চুপচাপ বসে থাকে। শ্রীনাইল ধামের বুড়ো নিয়মগাছের স্ফুর বিশ্বাসের অঞ্চলি কি বুড়ির অনুর্বর জীবনকে ধন্য করতে পারবে? ছয় বছরের ব্যর্থ প্রহর গোনা কি শেষ হবে? নমিতার বিশ্বাস কি বুড়ির বিশ্বাসকেও মহীয়ান করবে?

ঘুমস্ত বুড়ির মুখের দিকে তাকিয়ে গফুর কোন নির্দিষ্ট সিদ্ধান্তে আসতে পারে না। তাকিয়ে দেখে জনস্মৃত। এখনো যাওয়া-আসা চলছে। দুদিন ধরে মেলা হবে। সবার লক্ষ্য এক- পৌষমেলা উপলক্ষে শ্রীনাইল ধাম। সবার বিশ্বাস এক- বুড়ো নিয়মগাছে বাবার নামে সোয়া পাঁচ আনার পুটলি বাঁধলে আকাশিক বন্ধ পাওয়া যায়। কত দূর-  
৩৫ হাঙর নদী-য়েনেত

নুরান্ত থেকে লোক আসে। কত জনে সারা বছর অপেক্ষা করে থাকে এই মেলার জন্যে। আশার বৃক বেঁধে রাখে। তাই ছুটিতে সবাই। ছেটার শেষ নেই। আকাঙ্ক্ষার জপায়গ চাই। আকাঙ্ক্ষার পরিধিতি চাই।

গফুর অনেক দূরের তাল গাছের মাথায় ভাকিয়ে থাকে। ওর শরীর ডেঙে আসছে। ইদানীং কেহন চট করে ঝুস্ত হয়ে যায়। এই মৃহূর্তে গফুরের বড় বেশি হুকো টানতে ইচ্ছে করে।

পীয়ে ফিরে বৃক্ষি বেশ একটা পরিষ্কৃতির ভাব নিয়ে দিন কাটায়। গফুর লুকিয়ে লুকিয়ে ওকে দেখে। দেখতে ভালে; লাগে। ঘাসের বৃকে রাঙ্গিন প্রজাপতির কথা গফুরের মনে হয়। সংসারটা বৃক্ষিত উচ্ছ্঵াসে একটা সবুজ মাঠ হয়ে গেছে। গফুরের অনন্ত আকাঙ্ক্ষা যিথে হয়েছে দেখে ও আশ্রম। বৃক্ষির মধ্যে সে হতাশা এখন নেই। মন খারাপ করে মুখ কালো করে দিন কাটায় না। চুপে চুপে কাদে না। সবার কথা কুলে শিয়ে পুরুরঘাটে বসে থাকে না। যখন তখন গফুরের কাছে এসে দৌড়ায়। ছেলেমাসুরী করে। গফুরের মনে হয় বৃক্ষি এখন বাতাসে আঁচল গড়ায়। ওর পালে হাতরা লেগেছে। ছুটে ছুটে কাজ করে। কলীম কলীমকে আদরে ভরে তোলে। কলীম একদিন অবাক হয়ে বলে, মা তুমি এত শুশি কেন?

অকশ্মাখ লজ্জা পায় বৃক্ষি।

- মূর পাগল শুশি কৈ রে?
- হ্যাঁ তুমি অনেক ভাল হয়ে গেছ। এখন আর আগের মত বক না।
- তোকে আমি কখনো বকি?
- আগে একটু একটু বকতে এখন তাও না। বল না মা তোমার কি হয়েছে।
- বৃক্ষি উত্তর দিতে পারে না। বিস্তৃত বোধ করে। পাশ কাটিবার চেষ্টা করে।
- আমার বুঝো বাপের মত প্রশ্ন করেছে। যা বেলগে যা।
- না বললে থাব না। কিছুতেই থাব না। কলীম জেদ করে।
- এখন বেলতে গেলে বিকেলে কিন্তু নানু বানিয়ে দেব।
- সত্ত্বি তো?
- হ্যাঁ সত্ত্বি।

কলীম চলে যায়। গফুর হিটারিটিয়ে হাসে।

- তোমার হাসি দেখলে গা জ্বালা করে।

বৃক্ষির মুখ লাল হয়ে ওঠে। গফুর আরো জোরে জোরে হাসে। হাসতে হাসতে বৃক্ষি কে জড়িয়ে ধরে। শ্রীনাইল ধামে যাবার আগের দিনগুলোর বৃক্ষির জান্ম বিষণ্ণাতার নিচে গফুর তলিয়ে যাইছিল যেন। ওখান থেকে ফিরে আসার পর আবার যাথা উঁচিয়ে উঠেছে। বৃক্ষি এখন আশ্রম সতেজ আর প্রযুক্ত। এমন কি কলীমের বেশি আবদ্ধারে যাবে মাঝে বাল্লা ঘরের পাশে যাববেলও খেলে। পঞ্জশিলের সঙ্গে এখন পঞ্জীর হৃদ্দান্ত। গফুরের মনে হয় বৃক্ষি কি নষ্টিতার মতো এক পঞ্জীর বিশ্বাসের আকাঙ্ক্ষাকে বৃকে লালন করছে। এখন বৃক্ষির বৃকের মধ্যে এক নিষ্ঠার স্নোত বরে যাচ্ছে।

দিন পড়ায়। মাস পড়ায়। মাস আটক কেটে যায়। বৃক্ষি তবু বিশ্বাস হারায় না। গফুর একদিন টাট্টী করে।

- তোর বাবাকে দয়া করছে না বুঢ়ি?

বুঢ়ি গম্ভীরের মুখ চেপে থেরে ।

- ছি বাবার নামে এমন করে থলে না । একদিনে কি আর সব হয়? জানো না সবুরে পোশায় ফলে । বৈর্য ধরলে ঠিক কর পাৰ ।

- হ্যাঁ ভাল । আস্তা রাখা ভাল ।

গম্ভীর ঘনে ঘনে আশ্রম হয় । বুঢ়ির ছেলেমেয়ে হোক বা না হোক গম্ভীরের কিছু আসে থায় না । বিষ্ণু বুঢ়িকে যে নতুন করে পাশৰা গেছে এটাই লাভ । এ উপরি পাশনার মূল্যাঙ্ক তো কর নয় । ও ঘনে ঘনে শ্রীনাইল ধারের কেশাবাবাকে কৃতজ্ঞতা জানায় । বাবা তাকে দয়া করেছে ঠিকই ।

এর মাঝে জলিল আসে শহর থেকে । তব বিয়ে ঠিক করেছে ওর মা । বৌ মুব সুমনী । বৌ নিয়ে শহরে চলে যাবে । জলিলের বাবা নাহি । মা-ই সব । আর মায়ের ও একই ছেলে । জলিলকে দেখেই বুঢ়ি বিস্তু হয়ে থায় । জলিল কিছু বলার আগেই বলে, তোমার বিয়েতে আমি যাব না জলিল?

জলিল বিস্তু হয় । ছেটিবেলায় দু'জন দু'জনকে তৃই বললেও এখন কেউ কাউকে তৃই বলে না । বুঢ়ির মুখের দিকে চেয়ে জলিল কিছুই আঁচ করতে পারে না ।

- তোমার কি হয়েছে বুঢ়ি?

- কিছু না ।

- তবে আমার বিয়েতে কি দোষ হলো?

- কিছু না ।

জলিল কি বলবে ভেবে পায় না । দু'জন কিছুক্ষণ চুপচাপ কাটিয়া । বুঢ়ি একমানে কুটুম্ব-কুটুম্ব সুপোরি কাটে । বুঢ়ির মতো এমন চিকন করে সুপোরি আৰ কেটি কাটিতে পারে না । বিয়ে, উৎসবে ওৱ ধাটুনি বেড়ে থায় । ডালা ডালা সুপোরি কাটিতে কাটিতে কোমর ব্যথা হয় ।

- এত সুপোরি কি হবে?

- সকিনার ছেলের আকিকা হবে । ওৱা কাটিতে দিয়ে গেছে ।

- তনলাম শ্রীনাইল ধার পিয়েছিলে?

- হ্যাঁ । কেশাবাবার ধারে মানত করে এলাম ।

বুঢ়ির মুখচোখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে । জলিল কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে । তারপর বলে, আসলে মানত করে বিছু হবে না । ভাঙ্গার দেখানো দুরবার । গম্ভীর তাইবে বালা তোমাকে শহরে নিয়ে পিয়ে ভাঙ্গার দেখাতে ।

- ভাঙ্গাৰ? ভাঙ্গার কেনো? আমার তো কিছু হয়নি?

- সে সব ছেলা কথা । আমিও অতো বুঢ়ি না । আমার এক দোষকে দেখেছি ওর বাউকে ভাঙ্গারের কাছে নিয়ে যেতে । ভাঙ্গার দেখেটোবে বলেছে ওদেৱ কোন দিন ছেলেমেয়ে হবে না । ভাঙ্গারৰা সব বুঝতে পারে ।

জলিলের এমন আজগুৰি কথা বুঢ়ি কিছু বুঝতে পারে না । হ্যাঁ করে চেয়ে থাকে । ওতো জানে কেবল অসুব কৰলেই লোকে ভাঙ্গারের কাছে থায় ।

- কি সব আজেবাজে কথা ।

- আজেবাজে নয় বুড়ি। খাটি কথা।
- থাকগে আমি তনতে চাই না।
- বুড়ি রেগে যায়। সুপোরি কাটতে গিয়ে আঙুল কেটে ফেলে।
- উঃ মাগো।
- বুড়ি আঙুল ঢেপে ধরে উঠে যায়। ন্যাকড়া ছিড়ে আঙুল বাঁধে।
- দেখি বুড়ি কতোটা কেটেছে?
- না।

ও পুরুর ঘাটে এসে দাঢ়ায়। জলিলের কোন কিছু করার থাকে না। বুড়ির আচরণে বিরক্ত হয়। এসেছিল বুড়ির সঙ্গে ওর বিয়ে নিয়ে কিছু হাসি-তামাস করবে। বুড়ি খুশি হবে। জলিলের মনতো খুশিতে টইট্যুর। সব আনন্দ এমন করে যাচি হলো দেখে ও আর দাঢ়ায় না। কিছু কেনাকটার জন্যে বাজারের দিকে যায়।

ঘাটের পানিতে পা ডুবিয়ে বসে বিরক্ত হয় বুড়িও। জলিল এলেই এহন এক একটা কথা বলে যাতে বুড়ির সমস্ত অনুভূতি ওলোটিপালোটি হয়ে যায়। সেই কথাগুলো বুড়ি তার পারিপার্শ্বিকের জীবনমাপনের সঙ্গে মেলাতে পারে না। তখন বুড়ির কষ্ট বাঢ়তে থাকে। বুকের ভেতর যন্ত্রণার স্ন্যোত প্রবলবেগে গর্জন করে। ও নিম্নুম হয়ে যায়। কথা বলতে ভাল লাগে না। কাজ করতে ভাল লাগে না। কারো সঙ্গ অসহ্য ঠেকে। বুড়ি আজও পুরুর পাড়ে ঘুরে বেড়ায়। কলাগাছের আড়ে আড়ে প্রায় খালের কাছাকাছি যায়। তৌয়া গাছটার নিচে দাঁড়িয়ে খালের বুকে জোয়ার আসা দেখে। এই জোয়ার আসা দেখতে ওর ভীষণ আনন্দ। আস্তে আস্তে খালের বুক কেমন করে টইট্যুর হয়ে গঠে। এই দৃশ্য দেখতে দেখতে বিরক্তি ভূলে যায়। ও আবার আগের ধ্যানে নিয়ন্ত্র হতে পারে। জলিলের আজেবাজে কথাগুলো জোয়ারের জলে ভাসিয়ে দেয়।

ধূমধাম করে জলিলের বিয়ে হয়। দু'দিন পর ও বৌ নিয়ে শহরে চলে যায়। বুড়ির মন খারাপ হয়ে থাকে। কখনো চোখে জল এসে পড়ে। নিজেকে শাসন করে কুলিয়ে উঠতে পারে না। এর মধ্যে বুড়ির খুনখুনে বয়সী মা মারা যায়। মীর্ধদিন অসুস্থ থাকার দরুণ ওর মা-র মৃত্যু বাড়ির সকলের কাছে স্ফটির কারণ হয়। সে মৃত্যু ওকেও তেমন ঘায়েল করে না। বরং মার কষ্টটাই ওর বেশি খারাপ লাগতো। তবু বুড়ি ভাক ছেড়ে কাঁদলো। ওর মনে হলো ওর জীবন থেকে একটা শীতল ছায়া সরে গেল। মা'র মৃত্যুর চাইতেও জলিলের বিয়ে বুড়ির মনে বড় বেশি দাগ কাটলো। বুড়ি কিছুতেই ভুলতে পারল না। যেন জীবনের সীমানা বদল হয়ে গেল। মানসিক আশ্রয়হীন হয়ে খোলা প্রান্ত রে ঝাঁ ঝাঁ রোদের দুপুরে উদোম গায়ে ছিটকে পড়ল। বুড়ির সব অবলম্বন যেন নিঃশেষ।

যাবার আগে জলিল একদিন ঘাটলায় দাঁড়িয়ে বলেছিল, আমার বউ কেমন বুড়ি?

- চাঁদের মত। শহরে তো নিয়ছ। ধরে রাখতে পারবে তো?

বুড়ি বাঁকা করে ভাকিয়েছিল।

- এমন কথা কেন?

- এমনি বললাম।

বুড়ি হঠাৎ খিলখিলিয়ে হেসে উঠেছিল।

- তোমাকে কখনোই বুঝতে পারি না।

জলিল মুখ কালো করে চলে গিয়েছিল। শহরে যাবার দিন আর দেখা হয় নি। এখন ঘুরেফিরে সেকথা মনে হয়। বুড়ি বুঝতে পারে না এত জটিলতা ওকে আক্রমণ করে রাখে কেন?

ওদের বিবাহিত জীবনের সাত বছর কেটে যাবার পর ঠিক আট বছরের মাথায় বুড়ি সন্তানসন্তা হয়ে ওঠে। লক্ষণগুলো সব একে একে যতই স্পষ্ট হয়ে ওঠে ও ততই অস্ত্র হয়। যেদিন বুঝলো যে হ্যাঁ সত্যিই ওর ভেতরে পরিবর্তন আসেছে সেদিন দৌড়ে গফুরের কাছে আসে। গফুর কাথা মুড়ি দিয়ে ঘুমিয়েছিল। বুড়ি এক টানে কাথা সরিয়ে ঘোপিয়ে পড়ে ওর বুকে।

- কি হয়েছে তোর বুড়ি?

- দাঁড়াও বলছি।

বুড়ি পাগলের মত গফুরের বুকে মুখ ঘষে। বুড়ির এমন বেহিসাবি উচ্ছ্বাস গফুর আর কোনদিন দেখেনি। কখনো এমন করে এত কাছে এসে ও ধরা দেয়ানি। ওর যে কখন কি হয় বোঝা মুশ্কিল। আজ আবার কি হলো? অনেকটা সময় বুড়িকে শাস্ত হতে দিয়ে গফুর আন্তে আন্তে ওর মুখ তুলে ধরে।

- কি হয়েছে বলবি তো? কিছু না বললে বুঝবো কি করে যে তোর সুখ না দৃঢ়ে?

- ওগো বাবা দয়া করোছে।

- সত্যি?

- হ্যাঁ, আমি ঠিকই বুঝতে পারছি।

বুড়ি উত্তেজনায় হাঁফায়। এবার গফুরের পালা। খুশিতে মাতোয়ারা হয়ে ওঠে ও নিজেও। হঠাৎ মনে হয় খুশিটা শুধু বুড়ির একলার নয়। ওর নিজের ভেতরেও যে এত আনন্দ ছিল খবরটা না শোনা পর্যন্ত ও টের পারনি। লজ্জায়, আনন্দে উদ্ধাসিত বুড়ির মুখের দিকে অপলক তাকিয়ে থাকে গফুর। খুব সহজে সন্তান পেয়েছিল বলে সলীমের মা এমন করে খুশি হয়নি। আর দশটা সহজ পাওয়া বস্তুর মত ছিল সাদামাটা। বাচ্চা পেটে এসে গেছে চার মাস পর্যন্ত এটা সে নিজেও টের পারনি। খবরটা জানার পর গফুর ভীষণ বিরক্ত হয়েছিল।

- ধূত কি যে বামেলা?

- সলীমের মা মিনমিন করে বলেছিল, তুমি খুশি হও নি?

- না, একটুও না!

গফুর চেঁচিয়ে উঠেছিল।

- আমারও ভাল লাগছে না?

একই মিনিমনে ভঙ্গিতে সলীমের মা বলেছিল। সে ঘটনার পুরো ছবিটা গফুরের কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। কিন্তু বুড়ি? বুড়ি যে কি পেয়েছে গফুরের তা বোঝার ক্ষমতা নেই। গফুর সে চেষ্টাও করে না।

বুড়ি এখন সাধক পুরুষের মত নিবেদিত চিন্ত। ব্যাপারটার মধ্যে সে সিঙ্গ পুরুষের আলৌকিক ক্ষমতা আবিষ্কার করে। ও এখন মুক্তিবিহীন যা বলে সব শোনে। একটুও

এদিক শুধিক করে না। আওয়ার নিয়ম, পোসলের নিয়ম, রাত-বিরেতে বাইরে আওয়ার নিয়ম কোনটাই বাস দেয় না ও। মুক্তিদের চাপানো নিয়মগুলো বৃত্তির মাথার উপর জগতক পাথর। তবু দারুণ শান্ত হয়ের ঘর সব পালন করে। একটুও কষ্ট নেই ওর। নিয়ম আসার দুর্বিনীত বেপরোয়া সাহসও নেই আর। গফুর হিটিমিটি ছাসে— তুই একদম পাল্টে গেলি বৃত্তি?

— পাল্টালাম কৈ? যখন হেমন তখন তেমন তো ধোকতে হয়।

বৃত্তি তোর কপালে ঝোঁঠায়।

— ইস একদম লক্ষ্মী হোয়ে। ক'মিন আগোও পাশের ঘরের ঢাঢ়ী কি বকটাই না দিল তোকে।

— দেখ ভাল হবে না বলছি। সেতো মেলা দিন আগের কথা।

— ও ভাই তো। ঠিক আছে একটু তামুক সাজ বৃত্তি।

বৃত্তি গাঢ়ীর মুখে তামুক সেজে আনে। গফুর ওর সঙ্গে রসিকতা করে। ক'রেনো যেটো ওর একদম ভাল লাগে না। গফুর ওর গাঢ়ীর চেহারা দেখে আর কথা বাঢ়ায় না। পাছে কোন অঘটন ঘটে যায় সেজান্না বৃত্তি এখন জীবন বিষ্টাবত্তি।

ঠিক আট যাস পর বৃত্তির হেলে হয়। আস পোরে না। দুর্গাবীরা বলে আট আসে হেলে হেলে সেই হেলে ভাগ্যবান হয়। বৃত্তি অভশত ভাবতে চায় না। তখু ফুটফুটে সেই হেলের দিকে তাকিয়ে ও যাবতীয় দুঃখ জুলে যায়। নিজের অধো ত্বরানক পরিবর্তন অনুভব করে। সে হেট শিকর কচিমুখ ওর সমস্ত ভাবাবেগের শিকড় নাড়িয়ে শিয়ে গেল। কানে কানে বলে গেল, জীবনের অর্থ কত স্মৃত পাল্টে যায়। বৃত্তি এখন অনেক বেশি আত্মাত্ব। অঙ্গুরতা ওকে মাতিয়ে রাখে না।

হেলের নাম রাখা হল রাইস।

সলীম কলীম তো হেলে দেখে মহা খাল্লা। বাচ্চার হ্যাত পা নেড়ে ওরা খুশি হতে পারে না।

— মা তোমাকে বললাম একটা বোন আনতে তৃষ্ণি ভাই আনলে কেন?

— ঠিক আছে এর পরে একটা বোন আনবো।

— ভাই ভালো না খালি আরামারি হয়।

— আরাম কোলে একটু দাওনা আ।

কলীম বৃত্তির গা ঘেমে বসে। ওদের কৌতুহলের অন্ত নেই।

— তুই যেলে দিবি। দেখছিস না ও কত ছেটি!

— ও বুবেছি তৃষ্ণি ওকে এখন ঘেকেই বেশি আদর কর।

— মোটেই না তোকে সবচেয়ে বেশি আদর করি।

বৃত্তি কলীমের কপালে চুমু দেয়।

— তৃষ্ণি যখন ঘরে ধোকবে না তখন আমি ওকে বাটুল দিয়ে মেরে ফেলব। ঠিক যাবব। তৃষ্ণি তখন ভেট ভেট করে কাঁদবে।

— তৃষ্ণি যেহেন কানিস অঘন না রে?

বুড়ি হাসতে থাকে। সলীম কলীমের হ্যাত ধরে রইসে নিয়ে যায়। মুখে হ্যাত কথাই  
বলুক কলীমই রইসকে পছন্দ করে বেশি। ঘরে কেউ না থাকলে চুপিচুপি আসুন করতে  
আসে। আর বেশি আসুন করতে গিয়ে ঘৃষ ভাষ্টিয়ে কালিয়ে দেয়।

হ্যাত দিন যায় বুড়ি লক্ষ্য করে রইস যেন ঠিক সামাজিকভাবে বাঢ়ছে না। ওর  
দৃষ্টির মধ্যে আর দশটা ছেলের চলনাতা নেই। ও কেবল বোৱা হ্যাবার মত ফ্যালফ্যাল  
করে ভাকিয়ে থাকে। ওর সামনে শব্দ করলেও উচ্চকার না। ও বুক ঢেপে থে। দম  
আটকে আসতে চায়। বিশ্বাস করতে ইচ্ছা হয় না তবু বটকা লাগে। এত সাধের ছেলে  
কি ওর বোৱা আৰ কালা হল।

তবু ধৈর্য ধরে বুড়ি। কাউকে কিন্তু বলে না। নিজে নিজেই ছেলেকে বিভিন্নভাবে  
লক্ষ্য করতে থাকে। যতই দিন যায় বুড়ির ভয়টা গুটিসুটি পাকিয়ে ওঠে। আন্তে আন্তে  
আশঙ্কাটা সত্ত্বে পরিষ্কত হয়। বুড়ি একদিন আর্তনাদ করে ওঠে।

- ওগো দেখতো রইস আমাৰ ডাকে সাড়া দেয় না কেন?

গফুর অনুভব করে বুড়ির ডাকটা সব হ্যারানোৰ বেদনায় মুহূর্যান। ওর সৰ্বৰ যেন  
খোয়া গিয়েছে। গফুরও ব্যার্থ হয়। না রইসের কোন বুকম চেতনা নেই। ও আপন  
মনেই হ্যাত-পা নেড়ে খেলে। হ্যাসে। বোৱা যা ভাইদের ডাকে ওৱ কিন্তু যায় আসে না।  
শব্দশ করে না। রইসের হ্যাবভাব লক্ষ্য করে গফুরও নিৰাশ হয়। বুক ভাৱ হয়ে থাকে।  
ইয়া ঠিকই, পাশেৰ ঘৰেৰ রমজান আলীৰ হেয়েটিৰ মত ও সপ্রতিভ নয়। গফুরেৰ মনে  
হয় সব অপৰাধ ওৱ নিজেৰ। বুড়িৰ মুখেৰ নিকে ও চাইতে পারে না।

দিন হতই গড়াল হতই বুড়িৰ আকাঙ্ক্ষা নিয়শেষ করে নিয়ে রইস আৰ কথা বলল  
না। হ্যাবা-বোৱা ছেলেটা বুড়িৰ মুখেৰ বাঁচাৰ বিভীষণ ভাঙ্গন। ওৱ মনে আৱ কোন মাতৃল  
ভাবনাৰ জন্ম হয় না। অন্য কোন কিছুতে অনেনিবেশ কৰতে পাৱে না। সব কিন্তু খেড়ে  
ফেলে রইসকে নিয়ে মেতে ওঠে। রইসই বৰ্তমানে ওৱ সব আনন্দেৰ উৎস। ওৱ পঙ্কতু,  
ওৱ অসহায়ত্ব বুড়িৰ মাঝুদ্ধকে আৱো বেশি উহুল কৰে। অনুভব কৰে ছেলেটা ওকে  
ছাড়া আৱ কিছুই বোঝে না। এমনকি গফুরেৰ প্রতিষ্ঠ ওৱ বিশেষ কোন আকৰ্ষণ নেই।  
গফুর কোলে নিতে চাইলেও যায় না। কেঁদেকেটো মেঝে আসে। একদিন গফুর ওকে  
জোৱ কৰে আসুন কৰতে গিয়েছিল বলে নাকেৰ ডগাৰ ওপৰ খামচে নিয়েছিল। রাগে  
গফুর ওকে বিজ্ঞানায় সুড়ে ফেলে দিয়েছিল।

- তোমাৰ ছেলে সুযিই নাও।

বুড়িৰ খাৰাপ লেপেছিল। নিষ্ঠাৰ মনে হয়েছিল গফুরকে। ফুসে উঠেছিল ও  
নিজেও।

- ছেলে আছে বলে ওৱ মৰ্ম তুমি বোৱা না।

গফুৰ রাগে আৱ কথা বলেনি। প্ৰায় সাত আট দিন কথা বল ছিল দু'জনেৰ।

কলীমেৰ অনেক উৎসাহ হিল রইসকে কেন্দ্ৰ কৰে। কিন্তু বোৱা হওয়াত কলীমও  
দয়ে যায়। কথনো রেগে ওঠে, যা ও কথা বলে না কেন? আমাৰ একটুও ভাল লাগে  
না। ইচ্ছে কৰে মুটো খুমি লাগিয়ে দেই।

বুড়িৰ বুক ভাৱ হয়ে থাকে। ও কাউকে ওৱ বুকটা খুলে দেখাতে পাৱে না।  
সেখানে বেদনাৰ পাছাড় গড়ে উঠেছে। কথনো রইসকে বুকেৰ মধ্যে ফুপিয়ে  
৪১ হ্যাতৰ নদী শ্ৰেণী

কেন্দে গঠে। ওকে বেশি করে আকঢ়ে থারে। রাইসের যেমন না, তেমন রাইস ছাড়াও  
বুড়ির পুরিবী অক্ষকার।

রাইসের তিনি বৎসর বয়সে বুড়ি আৰ গফুৰ আৰ একৰাৰ শ্ৰীনাইল ধামে যায়।  
কেশাবাবাৰ নামে মানত কৰে নিম গাছেৰ ডালে পুটলি বাঁধে। এবাৰ আৰ গফুৰকে  
সাধাসামি কৰতে হয়নি। বুড়িৰ প্ৰস্তাৱে হেসেছিল।

বলেছিল, তৃই না বললেও আমি তোকে নিয়ে যেতাম বুড়ি। জানি তোৱ ইজ্জতৰ  
তৃষ্ণি হয়নি।

- ছি কথা বলতে নেই।

- সঙ্গি কৰে বলতো রাইসকে নিয়ে তৃই বুশি হয়েছিস?

- বাপ হয়ে এমন কথা বলতে নেই।

বুড়ি সুৱাসিৰ উন্নৰ না দিয়ে অন্য প্ৰসঙ্গে চলে যায়। এসব প্ৰশ্নৰ উন্নৰ হয় না।  
একটা পঙ্কু ছেলে তাৰ মাকে ক্লান্তিহীন যঞ্জপা ছাড়া আৰ কিইবা দিতে পাৰে? গফুৰ তা  
বোৰে। বোৰে বলেই বুড়িৰ সুখ থেকে কিছু শুনতে চায়।

শ্ৰীনাইল ধামে যাবাৰ সময় গফুৰেৰ মনে হয়েছিল কে যেন সাবাপথ জুড়ে এক  
বিৱৰাটি কংটা বিছিৰে রেখেছে। গতবাবেৰ মত বুড়ি এবাৰ আৰ তেমন উৎফুৰ নয়।  
পথেৰ কটে একটুতেই ক্লান্ত হয়ে যায়। উপরত্ব রাইস বিয়ক্ত কৰে। কান্দাকাটি কৰে।  
যেষ্টা পথে ইটিতেও কট হয়। কয়েকবাৰ পথেৰ মাকে পাছেৰ নিচে বলে বিশ্বাস নিয়ে  
তাৰপৰ মেলায় পৌছে ও। কোন বুকমে নিম গাছে পুটলি বৈধে ঘৰে কেৰাৰ জন্মে  
ব্যাকুল হয় গঠে। মেলায় সারাদিন ঘোৱাঘুৰি কৰাৰ বিশ্বাসৰ ইজ্জত অনুভব কৰে না।  
বুড়িৰ চোখে-সুখে ক্লান্তি ছাড়া আকাঙ্ক্ষাৰ কোন উজ্জ্বল আলোৰ রেখা আবিষ্কাৰ কৰতে  
পাৰে না গফুৰ। ওৱ বুব খাৰাপ লাগে। মনে হয় বুড়ি হায়িয়ে যাচ্ছে ওৱ জীৱন থেকে।  
অধ্য এবাৰ ওৱ মনে কোন বিধা ছিল না। ও ছিল সাধক পুতুলৰে সাধনাৰ মত  
নিৰবেদিত চিন্ত। বিশ্বাস অবিদ্যাসেৰ কোন আশঙ্কা গফুৰকে পিছু টেনে রাখিনি। গফুৰ  
আবাৰ বুড়িকে ওৱ আগেৰ অবস্থানে ফিরিয়ে আমতে চায়। চায় বুড়িৰ সাহচৰ্যৰ ঘনিষ্ঠ  
উন্নাপ, নিৰ্মল আনন্দ আৰ বেড়াৰ মধ্যে অটিকে ধাকা ঘৱ-ঘৱ খেলাৰ সুখ।

কিন্তু না ফল হয়নি। জীৱনেৰ সোনাৰ গোলাপ আৰ ফুটল না। সঙ্গত কাৰণেই  
রাইস বুড়িৰ জীৱনে আৱো অপৰিহাৰ্য হয়ে গঠে। গফুৰ সারাদিন বাইছৈৰে ধাকলে, সলীম  
কলীম কুলে গেলে রাইস ছাড়া পাশে আৰ কেট থাকে না। মায়েৰ আঁচল ধৰে ঘুৰে  
বেড়ায় ছেলে- পুৰুৰাটো, রান্নাঘৰে, টেকিঘৰে, সুপোৱি বাগানে। রাইস কথা বলতে  
পাৰে না বলেই একা একা কথা বলা বুড়িৰ অভ্যাস হয়ে যাচ্ছে। এ জিনিসটা আগে ওৱ  
মধ্যে ছিল না। মনে হয় ওৱ মধ্যে একটা দিক পৰিবৰ্তন হচ্ছে। ছেলেকে কেন্দ্ৰ কৰে  
একটা অদলবদল ঘটছে। একা একা কথা বলতে দারুণ ভয় লাগে। সুপোৱি বাগানে  
লাল টকটকে সুপোৱি কুঢ়োতে কুঢ়োতে বুকেৰ কাৰনা খুলে যায়।

ও রাইস, রাইসৱে তৃই আমাৰ একটা ছাড়-জ্বালানি, পৰাপ-পোড়ানি পোলা হলি  
ৱে। তোৱে নিয়ে আমাৰ দুঃখ ছাড়া সুখ নাই। তবু ভাল, তৃই আছিস। না থাকলে তো  
সারা জীৱন হ্য-হৃত্তাশ কৰতাম। তৃই আমাৰ কানা ছেলে পথালোচন।

বুড়ি শব্দ করে হেসে গঠে। একটা লাল সুপোরি রইস মুখে পোরে। ও সেটা কোচরে পুরে রইসকে কোলে উঠিয়ে নেয়। বুকে জড়িয়ে ধরে। চুমোয় অঙ্গুর করে তোলে। রইস হাত পা তুঁড়ে নিকে নামতে চায়। বুড়ি সজোরে জাপটে ধরে। ও তখন কেবলে ফেলে। বুড়ি দূষ করে ওকে ঘাটিব ওপর বসিয়ে নেয়।

— মারের আদর তোর সব না। হতভাগা হেলে।

বুড়ির চোখ ছলছল করে। আঁচলে চোখ মুছে নেয়। রইস গুটিগুটি পা ফেলে বুলো আগমন্তৰ শব্দ থেকে একটা সুপোরি উঠিয়ে আনে। বুড়ির দিকে তাকিয়ে হাসে।

ওরে দৃষ্ট হেলে মার সঙ্গে ইয়ার্কি হচ্ছে? আবার সুপোরি কুড়ানো হয়েছে। মাপো কত আমার উপযুক্ত হচ্ছে। হ্যাঁ রে রইস আমার বুঁড়ো বয়সে তুই আমাকে ভাত দিকে পারিব না? ওরে রইস বড় হলে মাকে কি তুই এখনকার মত ভালবাসবি না কি বৌর ন্যাওটা হয়ে আবি?

রইস বুড়ির হাঁটি জড়িয়ে ধরে। দু'হাত বাড়িয়ে কোলে উঠিতে চায়। ও রইসকে বুকে তুলে কোচড় ভর্তি সুপোরি নিয়ে ঘরে ফেরে।

মাকে মামে আবাক হয় গফুর। আশ্চর্য দৈর্ঘ বুড়ির। কোন সিন হেলের গায়ে হাত তোলে না, একটুও বিরক্ত হয় না। সারাক্ষণ যেন দেয়াল তুলে আগলে বেঢ়ায়। এখন বড় আনন্দের সময় রইসের।

গফুর হুঁকো টানতে টানতে বলে, তুই বড়ত বেশি সহিতে পারিস বুড়ি? এমন মা আমি আর দেবিনি?

— আমি না সইলে ওর কে আছে বল?

গফুরের প্রশ্নের উত্তরে ধমধম করে বুড়ির কষ্ট।

হেলেটা কেন এমন হল বলত বুড়ি?

ও একটুক্ষণ চুপ করে থেকে সুপোরি কাটিয়া মন দেয়। গফুরের হুঁকো থেকে গড়গড় শব্দ হয়। এক সময় সুপোরি কাটা থামিয়ে গফুরের মুখের দিকে তাকায়, ওগে আমার বোধহয় কেন পাপ ছিল।

গফুরের হুঁকো টানা থেমে যায়।

— না বুড়ি না। সব বাজে কথা।

বুড়ি ফিকে হাসে।

— মুকুরিবা তো বলে।

— খুত! ওদের আবার কথা। ওরা আনন্দের দোষ ধরতে পারলে বাঁচে।

গফুর আবার হুঁকো উঠিয়ে নেয়। বুড়ি সুপোরি কাটে। কেউ কথা বলে না। কেবল কিন্তু শব্দ হয়। শব্দটা ছড়িয়ে যায় বাতাসে। বাইরে পুটপুটে রাত। আজ আবস্যা। হেলেরা পুরিয়ে গেছে। বুড়ি কুলি উকে নিয়ে উঠে যায়। গফুর বুড়িকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য হ্যাজার রকম চেষ্টা করে। জানে ও আগলে ধরে না রাখলে বুড়ি ভেঙে যাব। ওর চোখ দিয়ে জল গড়ায়। চুপচাপ গিয়ে পুরুরাটে বসে থাকে। আসলে পাপ নয়। পাপের কথায় গফুরের বিশ্বাস নেই। পরিত্য ফুলের মত বুড়ি। পাপের স্পর্শ কেন ধাক্কে ওর জীবনে। ও তো কোথাও কোন ফঁকি দেয়নি। কাউকেও টকায়নি। তবুও কেন যে এমন হয়ে যায় জীবনটা!

এক সহয় যৌবনের দিন ফুরিয়ে যায়। শীতে বর্ষায় বসন্তে টুপটোপ পাতা অনবরত  
করে। বিরোধীলৈ দিনগুলো নির্বিবাদে গড়ায় ওদের। জলিল কয়েকবার পায়ে এসেছে  
একবারও দেখা করেনি বুড়ির সঙ্গে। ওর মেয়ে হয়েছে দুটো। কারো কারো কাছে  
জলিলের কথা জিজেস করে বুড়ি। ও নাকি ভালই আছে। শহরে একটা দোকান  
করেছে। এখন আর বিকশা চালায় না। গফুরের স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে গেছে। হাঁপানি ধরেছে  
গুকে। অমজমাটি কাশ। রাতে ঘুমোতে পারে না। ঘোলা চোখে বুড়ির দিকে তাকিয়ে  
থাকে। ওর জন্মে খারাপ লাগে। বুড়ির শরীর এখনো ভাঙ্গেনি। ও কোমর সোজা করে  
হাঁটে। গফুরের ইটিতে কষ্ট হয়। কিন্তুই ভালো লাগে না। মনে হয় দিন ফুরিয়েছে।  
তবুনি বুকের তেতুর আকস্মা চড়চড়িয়ে বাড়ে। যৌবনের দিন ফিরে পেতে ইচ্ছে করে  
কেবল। পায় না বলে মেজাজ খারাপ থাকে। সবার সঙ্গে বাগারাণি করে। রইসকে  
দুর্মদাম পিটুনি দেয়। বুড়ির সঙ্গে বেঁকিয়ে কথা বলে। ও বাতদিন দেবা করে। গফুরের  
মন ভরে না। সব সহয় খুঁত-খুঁত করে। একদিকে অসুস্থ স্বামী, অনাদিকে পপু ছেলে  
দুর্যোগ থাকে ও হিমশিম থাকে। কখনো সব ছেড়েছুঁড়ে নিয়ে ঢলে যেতে ইচ্ছে করে।  
জলিলের কথা যানে হয়। জলিল ওর সঙ্গে আর দেখা করে না। অনেকদিন ও পায়ে  
আসে না। শহরে জলিল বেশ উহিয়ে বসেছে। জলিলকে দেখার বড় সাধ হয়। যখন ও  
কাছে আসতো তখন অত টান ছিল না। দূরে সরে পিয়ে জলিল বুড়িকে উদাস করে  
নিয়েছে। এখন ওর মনের অধ্যে ব্যাকুল আর্তনাদ।

বুড়ি বুঝতে পারে না যে বুড়ো বয়সে গফুর কেন এত বদলে গেল? যে আনুষ্ঠান  
ওর জীবনের চারদিকে একটা বেড়া রেখেছিল সে এখন বেড়া ভাঙা পাগলা ঘোড়া।  
ওকে তছনছ করে দিতে চায়। ওর জীবনে এখন পারিবারিক শান্তি নেই। গফুর ওর  
দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। নেই বিরুপ প্রতিক্রিয়া বুড়িকে আক্রমণ করে রাখে।  
রইসকে নিয়ে ক্ষেতে লাল শাক তুলতে গেলে ওর সঙ্গে কথা বলে, বুড়িলি রইস তোর  
বাপটা একটা আস্ত হ্যারামী। যাগো মা এহন সোক আমি দেখিনি। হতো মনি আমার  
জলিলের সঙ্গে বিয়া তাহলে ঠিক হতো। এখন শহরে ধাক্কতে পারতাম রে রইস। উঁ  
কি যে যজা হতো। কেমন করে গাঢ়ি যায় তো বাজিয়ে দেখতে পেতাম। দেখতাম  
শহরের মানুষকে। রইসলে তুই বড় হয়ে শহরে একটা চাকরি নিবি। তারপর আমাকে  
নিয়ে যাবি শহরে। ছয় মাস রাখলেই হবে। কি রে পারবি না? অমা হ্যাঁ করে দেখছিস  
কি?

রইস অবাক হয়ে মা'র দিকে তাকিয়ে থাকে। চট্ট করে একটা লাল শাকের মাথা  
ভেসে বুড়ির দিকে এগিয়ে দেয়। রইসকে বুকে তুলে কোঁচড় ভর্তি লাল শাক নিয়ে ঘরে  
ফেরে। বান্না ঘরের দাঁওয়ায় পা জড়িয়ে শাক বাচ্চতে বসে। ঘর থেকে গফুরের কশির  
শব্দ আসে। বুড়ি, বুড়ি করে কয়েকবার ডাকে। ও সাড়া দেয় না। দিতে ভালো লাগে  
না। গফুর ভেকে ভেকে চুপ করে থাকে।

বেশ অনেক দিন অসুস্থ ভৃগুল গফুর। রইসের ঠিক তেরো বছরের মাথায়  
দুদিনের জুরে আরা গেল। কোনো কিন্তু ভাবার বা বুকে উঠার অবকাশ ছিল না বুড়ির।  
অসুস্থ অবস্থায় ভীষণ জ্বলিয়েছে গফুর। কিন্তু আরা যাবার পর কেমন নিখৰ হয়ে গেল  
বুড়ি। একটা লোকের অতিরু যখন নিয়শেষ হয়ে যায় সে তখন পরিবার পরিজনের  
হাতের নদী ঝেনেড

সবাইকে অনুভবে পতিশীল করে। সে কারণেই গম্ভীরের প্রতি প্রবল আকর্ষণ না থাকা সত্ত্বেও বৃদ্ধির বুকের ভেতরের সবুজ বন হলুদ হয়ে যায়। লাল গোলাপের পাপড়িগুলো অকালে বাতাস ছাড়াই থাবে যেতে থাকে। বৃদ্ধি একলাকে বেশ বয়স্ক হয়ে যায়। মাথার চূল সামান্য ভরে উঠে।

সলীম সংসারের দায়িত্ব কাঁধে তুলে নেয়। ও আরো দীর ছির এবং পন্থীর হয়েছে। সাংসারিক বৃদ্ধিও খুব। অল্প কর্মদিনেই সব গুচ্ছিয়ে ফেলে। জমিজমার হিসেব বোঝে চমৎকার। ধানের গঁজে ও ছটকটি করে। রাতে শুয়োতে পাবে না। ধান মাড়াইয়ের সময় সারারাত বারান্দার বসে কাটিয়ে দের। সলীমের সব কিছু বৃদ্ধির ভাল লাগে। রইস নির্বাধের হাত বারান্দায় বসে থাকে। কখনো উচ্চে ঘাণ্যা পাখির দিকে তাকিয়ে ছাততালি দিয়ে হেসে উঠে। বাধার গলা জড়িয়ে ধরে। কুকুরটার সঙ্গে ওর ভাবি ভাব। কুকুরটাও বেশির ভাগ সময় রইসের সঙ্গে সঙ্গে কাটায়। ওর আদর নেয়। ওর দিকে তাকালে বৃদ্ধির আনন্দ নষ্ট হয়ে যায়। ও এখন বৃদ্ধির সঙ্গে সুপোরি বাগানে যায় না কিংবা শাক তোলে না। বৃদ্ধি ওর ভাবে না। বৃদ্ধি আরো একলা হয়ে যায়।

কলীম চাঢ়া পলায় পান গায়। ভাটিয়ালী সুরের আমেজ ওর গলায় অনুভূত আসে। বৃদ্ধি মাঝে মাঝে ঘনোযোগ দিয়ে শোনে। ভালগালে। বাপের মতো ব্যভাব হয়েছে ওর। ভোর রাতে উঠে ডিঙি নিয়ে মাছ ধরতে যায়। ডাকাডাকি করে মাঝে উঠান্ত। জালটা আর বলুইটা যাবার সময় হাতে বৃদ্ধিরই তুলে দিতে হবে। নইলে ও কিছুতেই যাবে না। সক্ষা রাতে বৃদ্ধি জাল, খনুই ওর জন্যে গুচ্ছিয়ে রাখে। তাতে হয় না। ও বলে, তুমি আমার হাতে জাল তুলে না দিলে মাছ পাব না। বৃদ্ধি জানে, এটাই কলীমের ব্যভাব। ছেটি থেকেই ওর উপর এমনি আবদার করে আসছে। ভোর রাতে উঠতে অবশ্য বৃদ্ধির বারাপ লাগে না। কলীম সুপোরি বাগানের আড়াল থেকে চিন্দকার করে, হা, যাগো আসি। তারপর লাফিয়ে ডিঙিতে উঠে। তখন তুম হয় গোম। গোম গাইতে গাইতে ও যখন আধারে মিলিয়ে যাব তখন অনুভূত একটা রেশ জেলে থাকে বৃদ্ধির মনে। ভেসে আসা গানের শীর্ষ সূর ধরে ও অনুভব করে এমন অনেক ভোর-বাত ওর নিজের স্মৃতির কৌটায় জয় আছে। একটুও নষ্ট হয়নি। একটুও দাগ পড়েনি। তবে গোম গাইতে না গফুর। বৃদ্ধি সঙ্গে থাকত বলে। কেবল ওর হ্যাতটা ধরে দ্রুত সুপোরি বাগান পেরিয়ে যেত। কোন দিন সুপোরি বাগানের মাঝাখালে জড়িয়ে ধরে চুম্ব দেত। বাদুরের পাখা বাপটিনীতে ভয় পেয়ে গফুরের বুকের সঙ্গে যিশে যেত। বৃদ্ধি কৌটির ঢাকনাটা বক্ষ করে দেয়। ভাবে, ছেলেদের জীবন এবং পারিপার্শ্বিকতায় কোন অসঙ্গতি নেই। সব টিক আছে। হাল বাওয়া, ধান বোনা, ধান কাটা, ধান মাড়াই, মাছ ধরা, ডিঙি বাওয়া। তবু গফুর নেই। আুৰ গফুর নেই। বলে বিরাটি কোন পরিবর্তন হয়নি। ওদের জীবনে কড় উঠেনি। দাক্ষ রান্দবদলে দিকন্তু হয়নি কেউ। কেবল একটা ঘাণ্যা আর উঠোনে পড়ে না। কাঁধের উপর জাল ফেলে কিশোরী বউয়ের হাত ধরে থালে যায় না। জলের সঙ্গে জালবাসার খেলা গড়ে তোলে না। অনেক রাতে হাটি থেকে ঘরে ফিরে বৃদ্ধির নাম ধরে ভাকাভাকি করে না। এইসব জেবে বৃদ্ধির বুক যখন চেপে আসে তখন জলিলের কথা ভাবে। জলিলের ভাবনায় বুকের ভেতর অন্যরকম প্রেতি অনুভব করে। সে স্নেতে ভেসে যাব পারিব যাবতীয় পদ্ধিলতা। জলিল মানেই অলৌকিক ঈশ্বর। বৃদ্ধির

নিরবচ্ছিন্ন প্রবহমান আনন্দ। যে আনন্দ ব্যক্তিকে স্নেতে প্রবাহিত হয়ে ওকে অপার্থিত সুখ দেয় এবং প্রতিদিনের সংসারের বাইরে নিয়ে আয়।

সলীম কলীম না ধাকলে বাড়িটা নিমুম হয়ে থাকে। বৃক্ষ কবনো আপন মনে বক্রবক্র করে। ও রইস, রইসের ভোকে কি আমি এমন করে চেয়েছিলাম। ওই হাবা ছেলেটা একবারও যা বলে কি ভাকতে পারিস না? তোর কাছ থেকে যা ভাক শোনাব জন্যে আমার প্রাণটা ফেটে যাব বে? কত সাধ ছিল মনে, কত সাধি-সাধনা করলাম? বোবা ছেলেটা তোর মুখ দিয়ে কথা ফেটাতে পারলাম না? এমন চূপ হয়ে থাকিস কি করে? যাপো যা? রইসের ও রইস একবার মুখটা খোল বাবা? আমার সোনার ছেলে বুকের মানিক সাত রাঙার ধন? একবার হ্যাঁ কর আমি তোর কাছ থেকে একটু শব্দ জনি? এই আমি তোর মুখের কাছে কান রাখলাম। বল বাবা বল? একবার বল? যা বলে প্রাণ ঝুলে ভাক দে? সেই ভাকে ঘাট-ঘাট বন-প্রান্তের আকাশ-বাতাস কেঁপে উঠুক? সেই ভাকে গীয়ের সব মানুষগুলো সৌভে তোর কাছে ছুটে আসুক? অবাক হয়ে দেশুক তোর শক্তি, তোর ক্ষমতা? প্রাণ হেক তুইও হ্যাঁ ছাঢ়তে পারিস। ও রইস, রইসের ভোকে নিয়ে আমি কি করব? তুই কোনু কাজে লাগবি? হাল বাইতে পারিস না, যাই আরতে পারিস না, সংসার দেখতে পারিস না। আঃ বুকটা আমার কেমন যে করে। আমি চাই তুই একটা কিংবদন্তি হয়ে যা রইস, রইসে?

বৃক্ষ হঠাৎ করে রইসকে ঝাঁকুনী দেয়। খাইচে ধরে ওর মুই কাঁধ। রইস ফ্যালফ্যাল করে যা-র দিকে দেয়ে থাকে। তাৱপৰ ওর চোখ দিয়ে জল গড়ায়। ও শব্দ করে কাঁদে না। সে অঙ্গুল দিকে তাকিয়ে ধূমকে যায় বৃক্ষ। রইসের হাথাটা বুকের সঙ্গে জড়িয়ে ধরে হ্ হ্ করে কেঁদে গঠে।

সংসারের আরম্ভ বৃক্ষের শিখিল হয়ে আসে। সামা চোখে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকে। সলীম কাছে এসে বসে।

- যা তুমি কি এত ভাব?
- কই রে? বৃক্ষ হেসে ফেলে।
- হ্যাঁ ভাব। অন্য ঘরের চাটি খালার মত তুমি সংসার কর না। সারাদিন ব্যাক থাক না। অগভীর কর না। এত চূপচাপ থাক কেন যা?
- আমি ভাবছি তোর বিয়ে দিয়ে বৌ আনব ঘরে। সে এসে সংসার দেখবে। আমার এবাব তুঁটি।
- হ্যাঁ, ভাসলে তো তোমার পোয়াখাবো। যেটুকু সংসার ছিলে তাও থাকবে না। সেটি হবে না।
- আমার তো বয়সও হয়েছে সলীম। তুই মত দিয়ে দে। আমি যেয়ে দেবি। তোমা সারাদিন বাড়ি থাকিস না। তৈ বোবা ছেলেটাকে নিয়ে আমার একলা কি করে যে কাটে সে তোরা কি বুঝবি? তুই না করিস না বাবা?

বৃক্ষ সলীমের হাত জেপে ধরে। সলীম মুখ নিচু করে থাকে। তাৱপৰ যাবা নাড়ে।

- তিক আছে দেখ। কিন্তু তোমার মনের মত হওয়া চাই। বৌ দিয়ে তুমি কষ্ট পাবে সে আমার সইবে না।

সলীম মা-র সাথনে থেকে পালিয়ে যায়। বুড়ির শুশি লাগে। ইচ্ছে করে পুকুরে ঝাপিয়ে কিছুক্ষণ সীতার কেটে আসতে। ওর ঘরে সোক আসবে। বাড়তি একজন মানুষ। বুড়ি এখন মানুষ চায়। চারদিকে অগণিত ধৈ-ধৈ মানুষ।

এর মাঝে একদিন মীতা বৈরাগিনী আসে। বুড়িকে দেখে চোখ ঝুঁঠকে তাকায়।

- তোকে দেখে মনে হচ্ছে আমাদের বয়স হয়েছে সই।

বুড়ি ভ্রান হ্যাসে।

- বেলা তো অনেক হলো।

মীতা পা ছড়িয়ে বসে। আজ ও একা।

- তোর মনের মানুষ কৈ সই?

- আসেনি। বলল আমি বেরতে পারব না। তুই ভিখ মেপে নিয়ে আয়। ও এখন এমনই করে।

- কেন চিঢ় থরেছে বুড়ি?

- এক রুকম তাই। বন্ধন ঝালায়। ভাল লাগে না। একদিন ছেড়ে ছুড়ে চলে আসব।

বুড়ি অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে।

- হ্যাঁ করে দেখছিস কি? চাটি খেতে দে। যাই। ফিলতে দেরি হলে আবার রেগে যাবে।

বুড়ি ভাত আনতে যায়। মনে মনে ভাবে, মীতা যেন একটু বদলে গেছে। ও আর আগের মত নেই। তখন ও নিজের সঙ্গে কথা বলে, ও বুড়ি তুই কি কম বদলেছিস? তুই তো আর আগের মত নেই। এমনি হয়ে বুড়ি। এমনি হয়। কেউ চিরকাল একরকম থাকে না।

- ও সই কৈ রে ভাত দিবি না?

ও আবার তৎপর হয়। ভাবনায় মগ্ন হয়ে হ্যাত শিখিল হয়ে এসেছিল। ভাতের সানকি আর জলের প্রাস নিয়ে আসতেই মীতা খেকিয়ে গুঠে।

- তুই একদম ভারী হয়ে গেছিস। বাবা চাটি ভাত খাওয়াবি তা ও আবার তাগাদা দিতে হয়। নাহু তুই যেন কেমন হয়ে গেছিস সই?

মীতার কলাপাতায় ভাত চেলে দিতে দিতে ভ্রান হ্যাসে বুড়ি। কথা বলে না। মীতা তাড়াছড়ো করে থায়। বুড়ি এক কৌচক চাল দেয় ওকে।

- বাঁচালি সই। আজ আর দোরে দোরে যেতে হবে না।

মীতা কৃতজ্ঞতার হাসি হাসে। ওর শরীরটা গাছ-গাছালির আড়ালে মিলিয়ে থাবার পরও বারান্দায় বুটিতে হেলান দিয়ে বসে থাকে। মীতা একটা দমকা ঘূর্ণির মত আসে। কিছুক্ষণ ধূলো উড়িয়ে সব কিছু এলোমেলো করে আবার চেল যায়। উঠোনে ঢুঁটা কলাপাতা গড়ায়। বুড়ি সেদিকে তাকিয়ে থাকে। না, মীতা আর কিছুই ফেলে যায়নি। অথচ কেন যে মনে হচ্ছে সাজা বাড়ি ঝুঁড়ে মীতা দৰদবিয়ে হাঁটিছে। সে শব্দ বুড়িকে অঙ্গীর করে তুলেছে।

দু'বাসের মধ্যেই ঘটা করে সলীমের বিয়ে হয়। সলীমের বৌ রমিজা, ছেটখাটো মিঠি হোয়ে। হাসি-শুশি। প্রথম দেখাতেই ভাল লাগে। বিয়ের পরদিন বুড়ি ওকে শুরিয়ে ঘুরিয়ে তনের বাড়ির সীমানা দেখাল।

- বুঝতে বৌমা এখন থেকে এসব তোমার। আমি আর কেউ না। আমাকে চারটে খেতে দিও তাতেই হবে।

রমিজা কথা বলে না। ঘোমটা ফাঁকে উৎসুক ঢোক হোলে রাখে।

- জায়পাটি তোমার মনে ধরেছে বৌমা?

রমিজা মাথা নাড়ে।

- পারবে না সামাজ দিতে।

- আপনি দেখিয়ে দিলে পারব।

- আমা দেখ মেয়ের বুড়ি। আবার আমাকে জড়ানো হচ্ছে। আমি আর নেইগো হোয়ে। এবার আমার ছুটি।

বুড়ি রমিজার ঘৃতনি নেড়ে আদর করে। মাথার ঘোমটা টেনে ফেলে দেয়।

- এত ঘোমটা দিয়ে জড়োসড়ো হয়ে থাকলে সৎসার দেখবে কে?

রমিজা লজ্জা পায়। বুড়ি হাসে।

- আমাকে তোমার শরম কীসের বৌমা। আমি তোমার মায়ের মত। কোন অসুবিধা হলে আমাকে বলবে। আমি তো আছি তোমার জন্যে।

দু'জনে ইঁটিতে ইঁটিতে সুপোরি বাগান ছাড়িয়ে পুরুর ঘাটে এসে পাঁচায়। সবকিছু রমিজার ভাল লাগে। শুভরবাড়ির অজানা ভীতি ওকে কানু করে রাখে না। বুড়ির মূখের দিকে তাকিয়ে ওর বুক দুলে উঠে। বাপের বাড়ির আয়াময় পরিবেশ থেকে বিজিন্ন হয়ে এসেও ও উপলব্ধি করল গভীর হমতাময় বুকের ছায়া ওর জন্যে উন্মুক্ত আছে। ওর কোন অভাব নেই।

ঘাটের কাছে দৌড়িয়ে বুড়ি রমিজাকে বলে, যাও মা দেখ সলীমের কি লাগবে? ও যা পাগল হেলে। একটু এদিক ওদিক হলে রেগে কঁহি হয়ে যায়।

রমিজা মাথার ওপর ঘোমটা টেনে ঢেলে যায়। বুড়ি কাঠের সিঙ্গি বেয়ে পুরুরের পানির কাছে এসে বসে।

অঞ্চলিনেই রমিজা সৎসারের সব দায়িত্ব তুলে নেয়। চমৎকার গোষ্ঠানো হোয়ে। বুড়িও রাখে। দেখে তনে বুড়ি হ্যাফ ছেড়ে বাঁচে। মনে হয় সৎসারের বোঝাটা কাঁধের ওপর নিয়ে দীর্ঘসিন একটানা এক সবুজ বনের মধ্য নিয়ে পথ ঢেলেছে। এখন বোঝাটা পথের ধারে নামিয়ে গাছের ছায়ায় শুয়িয়ে পড়েছে। চারদিকে সোনালী পাতা করে। অপ্রের কোকিল প্রশান্তি হয়ে ভাকে। কোন ভীষণ শব্দে সে ঘূম ভাঙ্গে না। কেবল রইস রয়ে যায় ওর জন্যে। সকাল বেলা ওকে এনে বারান্দায় বসিয়ে রাখে। পুরুর ঘাটে নিয়ে গোসল করায়। খাওয়ায়। বুঢ়ো বয়সে বুড়ির যেন নতুন করে পুরুল খেলা। ওর মাঝে মাঝে মজা লাগে। শৈশব কৈশোর চোখের সামনে দীক্ষ আলো জ্বলে হাজির হয়। বুড়ি কথনো তন্ত্র হয়ে যায়। আশ্চর্য সুন্দর স্বাস্থ্য হয়েছে রইসের। যে দেখে সে অবাক হয়। বয়সের চাইতে অনেক বড় দেখায়। মুখের দিকে তাকিয়ে কেউ ভাবতে পারে না ছেলেটি বোরা-হ্যাবা-কালা। ছেলেটির কোনো বোধশক্তি নেই। ও এই পৃথিবীর বাইরে হাতের নদী ঘেনেড়ে

বাস করে। মাকে মাঝে ওর মুখের দিকে অপলক তাকিয়ে থাকে বুড়ি। বুক দুমড়ে মুচড়ে উঠে। সব দৃঢ় বোধগুলো একাকার হয়ে বুকের মধ্যে এক বিরাট নদী হয়ে যায়। তখন নদীর বালুচরে হাঁটতে গিয়ে বুড়ি প্রকৃতির কাছে এসে দাঢ়ায়। শৈশবের মত, কৈশোরের মত, ঘর ভাল লাগে না। খাল পাড়ে দাঢ়িয়ে নৌকোর চলে যাওয়া দেখে। শিমুল গাছের নীচে দাঢ়িয়ে সেঁশের দিকে যাবার রাজ্ঞায় মানুষের যাতায়াত দেখে। এসব দেখতেই ভালো লাগে এখন। মা নেই শাসন করার জন্যে। স্বামী নেই ঘরে ভাকার জন্যে। বুড়ি এখন অবাধ স্বাধীন। ছেলেরা নিজেদের কাজ নিয়ে ব্যস্ত। রমিজা রান্নাবাড়ি সামলায়। রইস কখনো বুড়ির সামনে থাকে। কখনো থাকে না। ওকে নিয়ে বুড়ির কোন ঘামেলা নেই। বুড়ি মনের সুখে সুপোরি খোজে, কোঁচড় ভর্তি লাল শাক উঠিয়ে আনে। নইলে পুরুর পাড়ে বসে মাছ ধরে। বুড়ির এখন হৈ-হৈ আনন্দ! সময় ভালই কাটে।

রমিজা বুড়িকে ভীষণ ভালবাসে। আদর যত্ন করে। যেন কোন কিছুতে অসুবিধা না হয় সেনিকে খেয়াল রাখে। ছোটবেলা থেকে দেখে আসা এবং শোনা অনেক দজ্জাল শান্তির ধারণা বুড়ি ভেঙে দিয়েছে। বুড়ি যেন অবিকল রমিজার আপন মা। কৃতজ্ঞতাবোধের সঙ্গে সঙ্গে ভালবাসা ও রমিজাকে তাড়িত করে।

— আম্মা আপনার যখন যা দরকার হয় আমাকে বলবেন।

রমিজা বুড়ির পায়ে তেল মালিশ করতে করতে কথা বলে। বুড়ি চোখ বুজে আদর উপভোগ করে। মেয়ে নেই বুড়ির। মেয়ে থাকলে এমন হয়। কাছে থাকে, ভাত এগিয়ে দেয়, মাথা আঁচড়ে দেয়, বিছানা ঠিক করে রাখে। এই অভাব বুড়ি রমিজা আসার পর অনুভব করছে। রমিজার কথায় ও মনে মনে হাসে। সব দরকারের কথা কি আর রমিজাকে বলা যায়? ওর যে কত অজন্ম ভাবনা তা রমিজার মত ছোট মেয়েকে কি করে বোঝাবে? রমিজা বুড়ির সঙ্গী হতে পারে না। ওর সঙ্গে প্রাণ খুলে কথাও বলা যায় না। তবে ওর আদর বড় ভাল লাগে। মনে হয় জীবনে একটা সুর বেজে ওঠে থেকে থেকে। যে সুরের সঙ্গে ওর কোন পরিচয় ছিল না। তবে বড় ক্ষণিকের সে বোধ মুহূর্তে আবার কোথায় যেন সব হারিয়ে যায়। আর কিছুই খুঁজে পায় না। রমিজার সাধা নেই বুড়ির মনের তল খুঁজে পাওয়া। দুপুরবেলা বুড়ির পাশে তয়ে ও অনেক কথা বলে। ওর বাবার কথা, মার কথা, গোয়ের কথা। মাঝে মাঝে ঝাপছাড়া কথা বলে। কথা বলতে বলতে ও তন্ময় হয়ে যায়।

— জানেন আম্মা ছেলেবেলায় কাদার মধ্যে মাছ কুড়োতে আমার খুব ভাল লাগত। আশ্বিন মাসে মাঠ থেকে পানি নেমে গেলে সাদা বকের ঝীক নেমে আসতো সে কাদায়। আমরা সব ছেলে-মেয়েরা বকের মত মাছ খুঁজতাম। কি যে মজা হত তখন।

রমিজার কঠ বদলে যেত আস্তে আস্তে। ও খুব সুন্দর করে বলতে পারত। ওর গঁজে বুড়ি কখনো নিজের শৃঙ্খি ফিরে পায়। কান পেতে মনোযোগ দিয়ে শোনে। বুড়ির নিজের সঙ্গে যিলে গেলে সে ঘটলা শুনতে খারাপ লাগে না। রমিজার সঙ্গে বুড়িও তাল দেয়। কিন্তু রমিজা অন্য প্রসঙ্গে গেলে বিরক্ত হয়। মেয়েটা কথা একবার আরম্ভ করলে আর থামতে চায় না। পাশ ফিরে শোয়। রমিজা বুঝতে পারে না বুড়ির বিরক্তি। একটানা বলে যেতে থাকে। একসময়ে থামে। বুড়িকে ডাকে।

- ও আম্বা, আম্বা?

বুড়ি তখন ঘুমিয়ে পড়েছে।

- আমার কথা শুনলে আম্বাৰ ঘূম পায়।

রমিজা হাই তোলে।

সলীম ওকে বাপেৰ বাড়তে যেতে দেয় না বলে মন খারাপ কৰে থাকে প্ৰায়ই।

বুড়িৰ মনে হয় রমিজাৰ স্বপ্ন দেখতে ভালবাসে। বাপেৰ বাড়িৰ স্বপ্ন। ফেলে আসা দিনগুলোৰ স্বপ্ন। শৈশব-কৈশোৱেৰ সেই গী-টা ওৱ কাছে এখন অচিনপূৰী হয়ে গেছে। ইচ্ছে কৰলেই আৱ চুটে যেতে পাৱে না। হেসে খেলে বেড়াতে পাৱে না। রমিজা এখন বন্দী জীবনযাপন কৰছে। সলীম যে কেন ওৱ সঙ্গে এমন কৰে তাৰও হাদিস পায় না বুড়ি। ছেলেকে এখন আৱ বোৱাৰ ক্ষমতা নেই। অনেক বদলে গেছে সলীম। সারাদিন ব্যাঞ্জণ থাকে শুব। রাত কৰে ঘৰে ফেৰে। ফিরে চারটে খেয়ে সটোন ঘূম। কথা বলতে চাইলে বিৱৰণ ইয়। ওৱ নাগালই পায় না বুড়ি।

- আম্বা আপনি রাতদিন কি এত ভাবেন?

- কৈ? কিছু ভাবিনা তো?

- উহু ভাবেন। আমি টেৱ পায়।

বুড়ি অবাক হয়। রমিজা কি টেৱ পায়? কতটুকু বোঝে ও?

- রাইসেৰ জন্মে আপনাৰ মন খারাপ থাকে না আম্বা?

- হ্যাঁ তা থাকে। ছেলেটাৰ যে কি হৰে?

- কি আৱ হৰে। আল্লাহু আছে। আপনি কিছু ভাববেন না।

রমিজা বিজ্ঞেৰ মত কথা বলে। ও যখন মুকুজিৰ সাজে বুড়িৰ তখন বেশ ভাল লাগে। যেয়েটা একদম সৱল। মনটা ভাল। কোন ধৰনেৰ কুচিঙ্গা কৰে না। বুড়িৰ মনে হয় ওৱ চারপাশেৰ মানুষগুলো ঠিক ওৱাই মত। ওৱ সঙ্গে ভাঙ্গে ভাঙ্গে মিলে যায়। না, ঠিক তা নয়। ধৰুকা কি খায়নি বুড়ি? দেখেনি কি হিংসা, ঝগড়া, রেষারেফি? আসলে এসব বুড়ি ভাবতে চায় না। ভাঙ্গাৰ ঘৰে ঢুকিয়ে তালা দিয়ে রাখে।

তবুও খারাপ লাগে যখন দেখে সলীম রমিজাকে হাৱে। সলীমেৰ অভিযোগ, ও মাকি কোন কাজেৰ না। বুড়ি ভেবে পায় না কেন? লক্ষ্মী যেয়ে রমিজা। গুছিয়ে সংসাৱেৰ কাজ কৰে। ছিমজাম পৰিপাটি। কোথাও কোন গলদ নেই। তবুও সলীম ওৱ ওপৰ বিৱৰণ। অভিযোগেৰ অন্ত নেই। রাত্রিবেলা পাশেৰ ঘৰ থেকে সলীমেৰ শাসানী এবং ধৰ্মকানি কানে আসে বুড়িৰ। রমিজা যখন শুনতন্ত্রিয়ে কাঁদে তখন বুড়িৰ দম আটকে আসতে চায়। সলীমেৰ আচৰণ ওৱ কাছে বড় অনুত্ত লাগে। সলীমকে জিঞ্জেস কৰতে ওৱ বাধে। এতদিনে বুড়িৰ মনে হয় ওৱ অভিজ্ঞতাৰ বাইৱেও অনেক কিছু ঘটে। যে ঘটনাকে বুঝতে যাওয়া বোকায়ি। বুঝতে না চাইলে যন্ত্ৰণা। প্ৰথমদিকে বুড়ি সলীমেৰ আচৰণে আপত্তি কৰেছে। ওৱ ওপৰ রাগ কৰেছে। রাগে কাজ না ইওয়ায় অনুনয়-বিনয় কৰেছে। কিন্তু কিছুই শোনেনি সলীম। একদিন রেগে গিয়েছিল, ঝুঁমি আমাৰ ব্যাপারে বুঝবে না মা। ঝুঁমি চূপ থাক। সব ব্যাপারে নাক গলাতে আস কেন?

সলীমেৰ তীব্ৰ ভাষায় থমকে গিয়েছিল বুড়ি। অপমান লেগেছিল। সলীমেৰ মুখেৰ দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে নিঃশব্দে ঘৰ ছেড়ে বেৰিয়ে এসেছিল। দুদিন ফৰ্ম খারাপ হাঙৰ নমী ঘোনেড়

ছিল। মনকে অনেক বুঝিয়েছে। ঠিকই বলেছে সলীম। ও বড় হয়েছে ওর ব্যাপারে মাথা ঘাসানো একদম উচিত না। কিন্তু রমিজা যখন কান্দে তখন সহিতে পারি না যে। বুড়ি নিজেকে ধরকায়। সহিতে হবে। না সয়ে উপায় কি? রমিজাকে নিয়ে যা শুশি করার অধিকার সলীম গেরেছে।

এখন বুড়ি চুপই থাকে। কিছু বলে না। মাঝে মাঝে রমিজার জুটি আবিকারে তৎপর হয়। কেন ও সলীমকে শুশি করতে পারে না? পরক্ষণে নিজেকে আবার শাসন করে। হিং মা হয়ে এমন চিন্তা করা ঠিক নয়। তাজাড়া রমিজাই বা তাকে কি ভাববে? একদিন রাতে ঘর থেকে বের করে নিয়েছিল সলীম। রমিজা কান্দতে কান্দতে বুড়ির পাশে এসে উঠেছিল। বুড়ি ঘর সঙ্গে কথা বলেনি। কিন্তু হাত বাঢ়িয়ে চোখের পানি মুছিয়ে নিয়েছিল শুধু স্পর্শ নিয়ে সাফ্টনা নিয়েছিল ওকে। শান্তভিত্তির আদরে বেশি করে কেঁপেছিল রমিজা। তবু বুড়ি জিজেস করেনি যে সলীমের সঙ্গে কি হয়েছে। শেষ রাতের নিকে সলীমের মৃদু শাসনাত্মক ঘূর তেওঁ যায়। দেখে ওকে বিছানা থেকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। বুড়ি সাজাশব্দ না করে চুপ-চাপ তয়ে থাকে। তখন বুড়ির মনে হয়েছিল ব্যাপারটা একান্তভাবেই ওদের দুঁজনের। সেখানে বাইরের কারো কিছু করার নেই। তারপর থেকে ওদের ব্যাপারে আর মাথা ঘাসায়নি। সলীম যখন রমিজাকে মারে তখন পুরুষ পারে বাসে থাকে। নইলে পড়শীর ঘরে চলে যায়। ভীষণ কথা বলে। হাসে, অন্যান্য হওয়ার ভাল করে। যদিও মন পড়ে থাকে রমিজার কাছে। সলীম বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেলে ফিরে আসে। রমিজার মাথা বুকের সঙ্গে চেপে ধরে। রমিজা কোন কথা বলে না। বুড়িও না। এজনে মাঝে মাঝে বুড়ি অবাক হয়। রমিজার মুখে কোন অভিযোগ নেই। সলীমের বিকলে কিছু বলে না। বড় মীরবে সঙ্গে থাকে।

এধিক থেকে কলীম অনেক শাস্তি, রাগ কর। বুড়ি মনে মনে ভাবল কলীমের একটা বিয়ে দিতে হবে। ওর এখন বিয়ের বয়স হয়েছে। আসতে যত শাস্তি হোক বিয়ে দিলে ও নিজেও হয়ত বউকে মারবে। কোন কোন পুরুষ আছে যারা বউর ওপর বীরত্ব দেখাতে ভালবাসে। বাইরে সমকক্ষ পুরুষের সঙ্গে পারে না বলে ঘরে ভাদের যত আস্কালন। অবশ্য কলীম এমন নাও হতে পারে। ও বুবই ভাল হেলে। কলীমের প্রতি বুড়ির পক্ষপাতিত্ব আছে। মনে মনে কলীমের জন্যে যেয়ে খুঁজতে খুঁজতে ওসমান মৃধার হেয়েটা চোখে পড়ে যায় বুড়ির। কলীমের সঙ্গে বেশ মানাবে।

রাতে খাবার সহয় দু'ভায়ের সামনে কথাটা পাঢ়ে। সলীম সারাদিন বাড়ি ছিল না। কোথায় কোথায় মুঠেছে কে জানে। খেয়েদেয়ে ঘয়ে পড়বে। অন্য সহয়ত্বে ওকে ধরাই যায় না। দু'দিন বসে কথা বলার জো নেই। সংসারের কাজের কথা ও উন্তে চায় না। বলতে গেলেই, পরে হবে যা বলে বেছিয়ে যায়। বুড়ির মাঝে মাঝে রাগ হয়। কি এত রাজকাজে ব্যস্ত ও? সলীম খুব তাজাতাড়ি ভাত খাচ্ছে। বেশিক্ষণ বসে থাকতে ভাইছে না। সলীমকে উদ্দেশ্য করে বুড়ি বলে, কলীমের একটা বিয়ে এবার দিতে হয় বাবা? দু'ভায়ে একসঙ্গে আপনি করে।

- এখন না যা?
- কেন? এখন নয় কেন? আমি মরালে হবে?
- বুড়ি রেপে যায়। উন্তর দেয় সলীম।

- তুমি আজকাল বড় তাড়াতাড়ি রেগে যাও মা।
- তাত্ত্ব বলবি। তোরা এখন বড় হয়েছিস না?
- শোন, মাথা ঠাণ্ডা কর। তুমি তো কিছু জান না, দেশের অবস্থা এখন একদম ভাল না।
- ওমা দেশের আবার কি হলো? জুর এলো নাকি?
- বুড়ি হেসে উঠে। রহিজাও খুক্খুক হাসে। রেগে যায় সলীম।
- আঃ মা যা বোব না তা নিয়ে হাসাহাসি করো না। আমাদের সামনে একটা কঠিন সময় আসছে।

সলীম চক্কচক্ক করে পানি খায়। এলীমও মুখ নিচু করে খেয়ে যায়। বুড়ি ভাত নাড়াচাড়া করে। গুদের খাওয়া হলে ও আর রহিজা খাবে। জিহ্বার শব্দ ছাড়া আর কোন শব্দ নেই। অকল্প্যাও পুরো ঘরে নীরবতা নেমে আসে।

সলীম আজকাল গায়ের একজন মাত্তকর গোছের লোক হয়েছে। ও এখন অনেক বোবে। বেশ গুছিয়ে কথা বলতে পারে। বুড়ির চোখের সামনে দিয়ে ছেলেটা বদলে গেল। বুড়ির ভালই লাগে। পেটের ছেলে না হলে কি হবে সলীম কলীমের সঙ্গে ওর একটা আত্মিক যোগ আছে। সে যোগ নাড়ি-হেঁড়া ছেলের চাইতে কম না। বুড়ির বুকের মধ্যে অহংকার জন্মায়। কাচারীঘরে সারাষণ লোকজন আসা-যাওয়া করে। কখনো জোরে, কখনো ফিসফিসিয়ে কি সব কথাবার্তা বলে ওরা। বুড়ির মনে ভাবনা জোটে। কি হলো দেশটার? কৈ বুড়ির এত বছরের জীবনে হলদী গো-র কিছু হয়েছে বলে তো মনে পড়ে না। মৌসুমী ফসল বোনা, সময়ে ফসল কাটা। কোন বছর ভরা গোলা, কোন বছর অভাব। কখনো আকাল, দুর্ভিক্ষ। প্রবল খরা কিংবা বন্যা। এর বাইরে তো এ গায়ে বড় রকমের কিছু ঘটেনি। তাহাড়া প্রাকৃতিক কিছু হলে বুড়ি টের পায়। শুধু দৃষ্টিতে নয়, ইন্সিডেন্টের পায়। এ ব্যাপারে ওর জুড়ি নেই।

খেয়ে উঠে সলীম চলে যায়। সেদিকে তাকিয়ে বুড়ির মনে হয় সলীম বেশ একটা পুরুষ হয়েছে। ছেলে-ছোকড়া ভাবটা ওর মধ্যে এখন কম। আর কিছুদিনে সেটাও খাবে। কলীম খেয়ে উঠতে যাবে তখন ওকে ধরে বসে বুড়ি।

- হ্যাঁ রে বাবা কি হয়েছে দেশটার? জন্মাবার পর থেকে তো কিছু হতে দেখলাম না।

- কোন দিন হয়নি বলে কি এখন হবে না মা?
- তা বলবি তো কি হয়েছে?
- সে মেলা কথা তুমি বুঝবে না মা।
- তোদের মুখে এই এক কথা। বুঝবো না কি? বোকালেই বুঝবো?

রহিজা পাশ থেকে চট করে বলে, আমাদের বোঝাবে কি আচ্ছা কলীম ভাই নিজেই জানে না কি হয়েছে।

- হ্যাঁ, জানি না তোমাকে বলেছে। দেখ এবার আমাদের একটা যুক্ত করতে হবে। দেশ স্বাধীন করতে হবে।
- ওমা এ আবার কি কথা? স্বাধীন আবার কি রে?
- বুড়ি চোখ গোল করে তাকায়। সুযোগটা নেয় কলীম।

- এজনে তো বললায় কিছু বুঝবে না।
- যতসব আজগুবি কথা। আসলে একটা কিছু নিয়ে থাকতে না পারলে তোমাদের দু'ভায়ের ভাল লাগে না। মাগো কত যে তোমরা পার।

রহিঙ্গা হোড়ুন কেটে খালাখাসল ছাঁচিয়ে বাল্লাধরে ঢলে যায়। কলীম ওর কথার উভয় দেয় না। বিড়ি টানবে বলে উঠোনে নাই। একটু পরে ভেসে আসে ওর কঠের গান। বুড়ি ভাবনায় পড়ে। হ্যাত পা ছাঁচিয়ে বারান্দায় বসে থাকে। যখন কোন সমস্যায় পড়ে তখন গফুরের কথা বেশি করে মনে হয়। দূরের তারার দিকে তাকিয়ে থাকে। আকাশের বুকে ফুটিফটা জুলে তারার। বাশবনের মাথার অক্ষকার নিবিড় হয়ে ওঠে। যুদ্ধ কি? যুদ্ধ কখনো দেখেনি বুড়ি। গফুরের সঙ্গে বিয়ের কদিন পর তনেছিল দেশ স্বাধীন হয়েছে। তখন কোন যুদ্ধের কথাবার্তা হয়নি। গায়ের লোক এমন গন্ধীর হয়ে যায়নি। সলীমের মত ধ্যানমে আচরণ করেনি। এখনো স্পষ্ট মনে আছে তখন গায়ের ছেলেরা সবুজের ওপর সাদা রঙের চাদরতারা মার্কা পতাকা নিয়ে লাফালাফি করছিল। গাছের আগায় বৈধে দিয়েছিল। যোটিকথা একটা দাঙ্গল ধূমধার হয়েছিল। সবার মনে যুক্তি ছিল। কিন্তু এখন কেন স্বাধীনতা মনে যুদ্ধ? সলীম কলীম কেন এমন বদলে গেল? কি হল দেশটির? নিষ্ঠার সাংঘাতিক কিছু। নইলে বিয়ে পর্যন্ত বক করে দেবে কেন ওরা।

সুচেল হয়ে ওঠে বুড়ির ভাবনা। খরা বা বল্যার ঘত এ ঘটনা নয়। পুড়িয়ে বা ভাসিয়ে দিয়ে থায় না প্রকৃতি। এর সঙ্গে মানুষের যোগ আছে। সেজনে সলীম কলীম ভাবনায় পড়ে, তৈরী হয়। প্রকৃতি নেয়। বুড়ির সামনে সমস্যার নতুন দিগন্ত-দূরার খুলে যায়। সেটা ওর মগজে ঘুরপাক থায়। সে আবর্ত ওর ইন্দ্রিয়কে তীক্ষ্ণ করে তোলে। কি যেন গুরু পায় বাতাসে। ওর মনে হয় পোষা কুকুরটার ঘেউ ঘেউ শব্দও যেন কেমন। একটু অন্যরকম। চিরকালের চিরচেলা নয়। যে কোন সচেতন বৃক্ষিসংপ্রদ লোক তা বুঝতে পারবে। বুড়ি হলসী গৌয়ে ঘুরে বেড়ায়। অনুভব করে হলসী গৌয়ে চিরকালীন শান্ত সংযোগ বর্ষপ্রবাহে জোয়ার এসেছে। যুদ্ধ সবে যাওয়া, যা খেয়ে মাথা নোয়ান মানুষগুলোর কঠে এখন ভিন্ন সুব। চোয়ালে ভিন্ন আদলের ভঙ্গ।

বুড়ি গুরু বাধতে এসে বহমজান আলীর দিকে তাকিয়ে থমকে যায়।

- বহমজান ভাই কৈ যাও?
- বাজাবে। অনসুরের দোকানে ট্রানজিস্টারে খবর তুমবো। এবার সাংঘাতিক একটা কিছু হবে সলীমের মা। আহরাও ছাড়ব না।
- কি হবে বহমজান ভাই?
- এখন আসি। পরে কথা হবে।

বুড়ি কিছু ভেবে কুলিয়ে উঠতে পারে না। কেন এমন হল দেশটির। বাধা আজকাল কারণ অকারণে ঘেউ ঘেউ করে। বাশবনে শক্ত লক্ষ্য করে দৌড়ে যায়। ফিরে এসে বুড়ির পায়ের কাছে বসে গরগর শব্দ করে। জিজ্ঞা বের করে লম্বা শ্বাস নেয়। বুড়ি মাথায় হ্যাত বুলিয়ে দেয়।

- তোর এত অঙ্গের লাগে কেন বাধা? তোর কি হয়েছে? কুই কি কিছু বুঝতে পারিস? ছেটিবেলা থেকে কত কিছুই যে বুঝতে চেষ্টা করেছি পারিনি। এখন আমি বুঝতে চাইবে বাধা। আমার শরীরটা অন্য কথা বলে। আমিও ধরতে পারছিরে বাধা, এ খরা বা বন্যা নয়। এ অন্য কিছু, একদম অন্যরকম।

- আমা যে কি কুকুরের সঙ্গেও কথা বলে।

মামিজার কথায় বৃত্তি লজ্জা পায়। সত্য মাঝে মাঝে আশপাশের সব কিছু একদম ভুলে যায়। তখন মনে হয় নিজের ঘনটাই মন্ত সঙ্গী। নিজের সঙ্গে আপন মনে কথা বলাতেও কম সুখ না, খেলাটো জমে গঠে। তখন আর কিছু খেয়াল করতে পারে না। আসলে বাধাটো উপরাফ হাত।

- আমা আপনার কি হয়েছে? আপনিও কি ওদের মত হয়ে গেলেন?

মামিজার হাসিতে বৃত্তির রাগ হয়। ওর মুখের দিকে তাকায় না। খেয়েটো ভেপো হচ্ছে। সব কিছুতে নাক গলাতে আসা। ওর কি দরকার শান্তির দিকে এত খেয়াল করার? বৃত্তি রাগের চোটে বাধার পায়ে এক লাধি দিয়ে ওকে উঠিয়ে দেয়। তারপর রাইসকে নিয়ে পুকুরঘাটে চলে যায়।

আজকাল প্রতিদিনই নতুন মনে হয় বৃত্তির। সকালের আড়মোড়া ভাঙ্গতে কোন আলসা নেই। চমৎকার বরষারে লাগে। দরজা খুললেই এক অলক সতেজ বাতাস ফুসফুসের মধ্য দিয়ে ঢুকে এক দৌড়ে পুরো শরীর শিক্ষ করে ফেলে। বুক ভরে খাস টেনে কাঠের সিঁড়ি বেয়ে নেমে হাঁস মুরগির বৌয়াটোর কাছে এসে দাঁড়ায়। একটানে দরজা খুলে দেয়। কলকলিয়ে বেরিয়ে আসে ওরা। গোয়ালে যায়। গুরুটাৰ গলায় হ্যাত বোলায়। বাছুরটার গা ঢাপড়ে দেয়। সব কিছুতে এখন আলস। সারাদিন কেহন করে যে কাটে টেব পায় না। বীশবনের মাধার ওপর দিয়ে বীকবীক বালিহাঁস উড়ে যায়। উঠোনে ছায়া পড়ে। অসম্ভব সুন্দর হলুদ গলাটা সকালের রোদের মত লাগে। কোথায় যেন আলগা রংতে বরপা বইছে। অথচ ধরতে পারছে না বৃত্তি। সে রং এবার বন্যা হবে। সে বন্যা নতুন পলিমাটি বয়ে আনবে। উর্বরা শ্যায়াল মাটিকে প্রিশ্যৰ্শণী করবে। বৃত্তি খালের ধারে যায়। মনে হয় মৃদু-স্ন্যোতের ছেটি খালের শরীর বদলে যাচ্ছে। বদলে যাচ্ছে পানির রেখা; জলের বুকের কেলি। বদলে যাচ্ছে সবুজ শ্যাওলার মাধা নাড়া, পারের মাটির সর্বী-বেলা। বদলে যাচ্ছে মাটির গতর। জ্বর্ধণিতের ধূকধূক শব্দধানি। কেহন যেন উদাহ হয়ে উঠতে চাইছে খালের শরীর। চিরকালের চিরচেলা সৌকা বাগোয়া, মাছ ধরা খালটা কত দ্রুত পাল্টে গেল। যেন বীক বদলাতে চায়, যেন স্ন্যোতে বিশাল কিছু বয়ে আনতে চায় কিংবা দু'কুল ভাসিয়ে সাগরে যেতে চায়। বৃত্তি খালের পানিতে হ্যাত ভেজায়, গালে ডলে, চোখে মাখে, মাধার দেয়। যদি পানি তাকে কোন নতুন কথা বলে দেয়? যদি বলে কেন হলদী গায়ের প্রাণ বদলে যাচ্ছে। কোন অযোধ শক্তির টানে হলদী গী তার আপন স্বরপের বাইরে পা বাড়াচ্ছে? কে তাকে এখন সাহসী, বেগবান এবং বৌবনবঙ্গী করে তুলল?

বৃত্তি স্টেশনের দিকে চলে যাওয়া রাস্তার দিকে তাকিয়ে থাকে। ছেটিবেলায় কতদিন জগিলের হ্যাত ধরে ঐ রাস্তা দিয়ে লুকিয়ে লুকিয়ে স্টেশনে গেছে। ঐ রাস্তার হাতের নদী যেনেন্দে

ধূলোমাটি, লজ্জাবতী লতা, ভাঁটিযুল, কচুপাতা, লব্দা ঘাস সব কিছুই তো ওর মুখ্য। কোনটাকে বুড়ি না চেনে? অথচ এখন মাঝে হয় এই রাস্তাটা একদম অচেনা। কোনদিন এই পথে হাঁটেনি। এই পথে হাঁটতে দাঙ্গল সাহস লাগে। ধূলো-ওড়ানো কাঁচা রাস্তাটা রোমের সোহাগে অক্ষরক করে। কেমন বৃক ডিক্কিয়ে হ্য হ্য করছে। যেন ভাকছে, এস একবার দেখে থাও। দেখ কোথায় নিয়ে যাই। কত লোক আসা-যাওয়া করছে রাস্তা নিয়ে। কেউ ওর দিকে ফিরেও তাকায় না। সবার পায়ের ডলার গতি দুর্বার হয়ে উঠেছে। এই মাটির সঙ্গে মানুষগুলোর পায়ের আশ্চর্য মিল। এই মাটি ওদের সঙ্গে কি কথা বলে? কি মন্ত্র শিখিয়ে দেয়? এই রাস্তা যদি বুড়িকে বলে দিত হলনী গাছের প্রাপ কেন বদলে যাচ্ছে? এই উপরপিয়ে ওঠা প্রাপটা কে এতদিন সুয় পাড়িয়ে দীর্ঘির বৃকে লুকিয়ে রেখেছিল? এই রাস্তা কেন বুড়িকে একুনি বলে নিয়েছে না যে হলনী পীর লোকগুলো কোন লক্ষ্যের দিকে যাত্রা করছে?

গাছের শেষ মাথার বড় শিমুল গাছের নিচে পিয়ে বলে বুড়ি। ওখানে বলে কুলঘরের মাঠে ছেলেদের হৈচৈ শুব মনোযোগ দিয়ে দেখে। ছেলেগুলোর ঘাঁথে সেই অকারণ ছেলেমানুষী দৃষ্টিয়ির চপলতা নেই। ওরা যেন কেমন নকুল চড়ে কথা বলে। ওরা কেবলই উন্নেজিত হতে থাকে। ওরা এ গায়ের বেড়িটা ভেঙে দিতে চাইছে। ওদের গায়ে এখন অসুরের শক্তি। নেট্টি পরা টিপ্পিং-এ ছেলেগুলো যে এখন দামাল হতে পারে তা বুড়ি ভাবতেই পারে না। পেট ভরে ভাত খেতে পায় না যারা ওরা আবার লজ্জবে কি? কিন্তু ওদের দিকে তাকিয়ে বুড়ির ঘন ভরে যায়। রাইসের মুখ্যটা মনে পড়ে। রাইস যদি ওদের মত এমনি করে দামাল হতে পারত? এ চক্রল শক্তিমান ছেলেগুলোর পাশে নিজের পঙ্ক অসহায় ছেলেটার কথা আনে করে বুড়ির বৃক ভার হয়ে গেল। না, ও কোন কাজেই লাগবে না। ওকে কোথাও লাগানো যায় না। হলনী গায়ের নকুল সম্ভাবনায় জেগে ওঠা প্রাপের জোয়ারে রাইস অপ্রয়োজনীয়। একেবারেই কুচ্ছ। মাথার ওপর শিমুল গাছের ছায়া বড় হতে হতে অনেক বড় হয়ে যায়। কৃষ্ণার্ত ঘন নিয়ে ছেলেগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকে। ওরা যদি বলে দিত কেন হলনী গী এমন করে বদলে যাচ্ছে? কেন ওরা ভাস্তুলি আর মার্বেল খেলা হেঢ়ে দিয়ে বড়দের মত ভাবুক হয়ে গেছে? ওদের প্রাপে এখন কোন বাস্তাস বইছে? ওরা কেন বন্ধুক হোঝা শিখতে চাইছে? কোন বন্ধি দেশের বাস্তাস হয়ে গেল ওরা? কোন সম্ভাব্য জায় করবে বলে মাতোয়ারা হয়ে উঠেছে? ওরা কি চায়? কি নেই ওদের? কোন অয়োজনে ওরা রক্তের হেলি খেলায় মাত্বে? উঠতে পিয়েও বলে পড়ে আবার। উঠতে ভাল লাগছে না। এ জায়গাটা শুব প্রিয় বুড়ির। এখানে বলে হলনী গীকে বড় আপন করে দেখো যায়। যে দেখায় উপরের খোলস ঘরে পিয়ে তেতরের প্রাণ কলমলিয়ে গুঠে। অভ্যন্তর-অন্টন, সুঁফ-দারিদ্র্য, নিলীকুন, বস্তনা হলনী গীর সম্মত প্রাপকে জীর্ণ মলিন করে রেখেছে। এ মলিনতা বুড়িকে স্পর্শ করে যায়। খিরক্ষিতে বাস্তাস বইছে চারদিকে। ফান্টের উম্মেতি গুরম করলো হঠাত করে উবে যায়। তখন বেশ লাগে। বুড়ির আশপাশে অনেক পাখি উড়ে। দূরের পাছে হলুল বউ কথা কও এক যানে ভাকে। এক ঝাঁক পরাগচমকানি মাথার ওপর দিয়ে উড়ে যায়। বুড়ি পা ছাড়িয়ে বলে।

হঠাতে মনে হয় শিমুলের গোটা আচমকা ফেটে গিয়ে যেমন তুলোগুলো দিঘিদিক ছুটতে থাকে তেমনি হয়েছে হলদী পায়ের অবস্থা। পায়ের মানুষগুলোর বুকের ডেকের জমিয়ে রাখা শিমুল বীজ ফাগনের গরম বাতাসে আচমকা ফেটে গেছে। মানুষগুলো ছুটছে। ছুটছে একটা লক্ষের দিকে। সে লক্ষ ঐ শিমুল তুলোর মত সাদা ধৰধৰে উজ্জ্বল। শিমুলের লাল ফুলের বীজ থেকে যেমন ঐ উজ্জ্বলতার জন্য হয় এও তেমনি। রক্তলাল ফুলের মত মানুষগুলোর চেহারা এখন রক্তাভ। কেবল ফোটার অপেক্ষায় প্রহৃ গুনছে। বুড়ির বুক যেন কেমন করে। মানুষগুলোর মুখের আশণাই বুকের মধ্যে তুলোর মত হালকা ধৰধৰে সাদা হয়ে যায়। বুড়ি ছটফট করে। ওরা কেন কেউ কিছু বলছে না ওকে? কি যে হচ্ছে সারা গী জুড়ে? বাইরের ডবকা ছেলেগুলো সামনে গেলে ভাগিয়ে দেয়। বলে, তোমাদের মতো বুড়োদের দিয়ে কোন কাজ হবে না। এ এক কঠিন সময়।

- আমি কোন কাজেই লাগব না?

- না, গো, না। কিছু পারবে না।

বড় বেশি সাহসের কথা বলে ফুরকবা। বুড়োদের বাদ দিয়ে দিতে চায়। নেহংটি পরা ছেলেদের কি এত কিছু মানায়? রমজান আলীকে ধরে বসে ও।

- কি হচ্ছে রমজান ভাই বলতো?

- সে তুমি বুকাবে না। যারা এতকাল আমাদেরটা খেয়েছে এবার আমরা তাদের দেখে নেব। আর চুপ করে থাকব না।

- পারবে?

বুড়ি চোখ বড় করে তাকায়।

- কেন পারব না? দেখছ না আমাদের ছেলেরা তৈরি হচ্ছে?

- নেহংটি পরা ছেলেদের কি এত কিছু মানায়?

বুড়ির কথায় হো-হো করে হেসে ফেলে রমজান আলী।

- ভালই বলেছ সলীমের মা। মানায না মনে করেই তো আমরাও এতকাল চুপ ছিলাম। আর তো পারি না। ওরা উঠতে উঠতে আমাদের মাথা ছাড়িয়ে আকাশে উঠে গেছে।

- কি যে বল বুঝি না?

- বুকাবে না। ঘরে যাও। মাথা ঠাণ্ডা কর।

রমজান আলী সোজা রাস্তা ছেড়ে আলপথে নেমে যায়। বুড়ি ঘরে ফেরে।

ওদের কথা বিশ্বাস হয় না বুড়ির। সলীমের কাছে জিজেস করে। সলীম গহীর, ভাবনায় হঞ্চ। বুড়িকে কিছু বলে না। বুড়ির যেন এ পায়ের সারিতে অপাঙ্কের হয়ে গেছে। অথচ বুড়ির সেই নিরেট মনটা অনবরত এক লক্ষ আবিক্ষারে তৎপর।

বুড়ি কাচারী ঘরের বাঁশের বেড়ার পাশে কান পেতে দাঢ়িয়ে থাকে। ওদের কথা শোনার চেষ্টা করে। সলীমের কঠ উজ্জ্বলায় থমথম করে। ওরা কি যেন বলাবলি করে। কিছু বুঝতে পারে না বুড়ি। তবুও মনে হয় ও নিজেও যেন নিজেকে প্রস্তুত করছে। একটা কিছু ঘটনার মুখোমুখি হওয়ার জন্য প্রস্তুতি। যে ঘটনা বুড়ি কোনদিন হাতের নদী ঘুনেড়

দেখিনি এবং আর কোন দিন দেখবেও না। সেই যে বাইশে ফাতেম রেতিওতে একটা বক্তৃতা হয়েছিল সলীম ওকে ডেকে তা উনিয়েছিল। বলেছিল, তাঁর নাম বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। কি দরাজ গলা! সেই কঠিন এখনো গমগম করে হলদী গী জড়ে। বৃত্তি সকলের সঙ্গে অভিভূতের মত উনেছিল। তখু এটুকু বুবেছিল যে একটি মানুষ ওদের সকলের হয়ে কথা বলছে। একদম ওদের জন্ময়ের কথা। হলদী গীর মাঠ, ফেড-ফসল, গাছগাছালি, গজ-জাগল, পাখ-পাখালি এবং মানুষের কথা। সিরাজ হিয়া কথাগুলো ধরে রেখেছে একটা যন্ত্রে। তারপর থেকে সেই কথাগুলো ওরা প্রায়ই শোনে। তবতে তবতে ওদের রক্ত গরম হয়ে ওঠে। সলীম মুখস্ত করে ফেলেছে কথাগুলো। খুব বেশি কিছু না বুঝলেও দুটো লাইন বুড়ির মনে সারাক্ষণ মাতামাতি করে, এবারের সঞ্চার মুক্তির সঞ্চার— এবারের সঞ্চার স্বাধীনতার সঞ্চার। বুড়ির এর বেশি কিছু মনে থাকে না। সলীমকে গিয়ে জিজ্ঞেস করলে সলীম বলে দেয়। আবার ভুলে যায় ও। কিন্তু কানের পটে রেশ জেগে থাকে সব সময়। তাতে বুড়ি আজন্ম হয়ে থাকে এবং সে সূর ধরে বুড়ি আরো অনেক কিছু বুকে উঠতে চেষ্টা করে। সেই বজ্জ্বলকষ্টের মানুষটাকে দেখতে খুব ইচ্ছে করে বুড়ি।

একদিন সলীমকে ধরে বসে, বঙ্গবন্ধুকে আমাকে একদিন দেখাবি বাবা?

সলীম হেসে ফেলে।

— কেমন করে? ঢাকা অনেক দূরের পথ। তাছাড়া আমিও তো দেখিনি তাঁকে। কেবল মনে মনে একটা মুখ বানিয়ে নিই।

— আমিও বানাই সলীম।

বুড়ি উৎসাহ ভরে বলে।

— কিন্তু দেখিনি বলে এক একবার এক একবক্ষ হয়ে যায় রে।

— ঠিকই বলেছ। যেবার গঞ্জে এলো বক্তৃতা করতে ওখানে যেতে পারলাম না অসুব ছিল বলে। আর বুঝি দেখা হবে না?

— হবেরে হবে। বেঁচে থাকলে ঠিকই হবে।

বুড়ির উৎসাহে ভাটা পড়ে না। হলদী গীর এখানে সেখানে ঘুরে ঝুঁত হয়ে গেলে সলীমের বৌ-র পাশে এসে বসে। আজকাল সলীম রমিজাকে আর মারে না। রমিজার বাস্তা হবে। ও মা হবে। বুড়ি হাঁফ ছেড়ে বাঁচে। বুড়ির মত সাধনা করতে হ্যানি ওকে, অনায়াসে মা হয়ে যাচ্ছে। রমিজার মেজাজ আজকাল খুব ভাল অনায়াসে মা হয়ে যাচ্ছে। একটা কিছু পেতে যাচ্ছে এ বোধ ওকে সুখ দেয়। বুড়ি ওর পরিত্নক মুখের দিকে হাঁ করে চেয়ে থাকে। ওকে এখন জীবন ভাল লাগে বুড়ির। রমিজার পাশে এসে বসলে ও সন্ন্যেহে বুড়ির দিকে তাকায়।

— আম্মা আপনার কি হয়েছে? মুখ একদম শুকিয়ে গেছে?

— রোদে ঘুরেছি কিনা তাই অহন দেখায়। সত্যি সারা গায়ে যেন কি হয়েছে রমিজা?

— কি আবার হবে? আপনাকেও ওদের ভূতে পেয়েছে।

রমিজা খুক্খুক করে হাসে। ওর হাসির একটা চঙ আছে।

হাসতেই থাকে রমিজা । ওর এই হাসি সলীম সহ্য করতে পারে না । রেগে যায় ।

- হাসিস না রমিজা । হাসির কথা নয় ।

- আমার অতশ্চত ভাবনা নেই আমা তাই হাসি । এ বুড়ির সবাই যেমন গল্পীর হয়ে গেছে তাই আমি একাই হাসি । রাইস আমার হাতে দুধ খায়নি । সে কি রাগ কিছুতেই খাবে না । আপনার জন্য বসে রায়েছে ।

রাইস-রাইস-রাইস ।

বুড়ির ছেলের কথা মনে হয় । এই ছেলের জন্যে বুড়ির কত আকাঙ্ক্ষা ছিল । এক সময় ছেলের জন্য পাগল হয়ে উঠেছিল । আজ আর তড়িঘড়ি করে ছেলের কাছে ছুটে যেতে ইচ্ছে করল না । বেশ কিছু দিন ধরে রাইসের দিকে তেমন খেয়াল দিচ্ছে না । ও একা একা ঘুরে বেড়ায়, নয় বারান্দায় বসে থাকে কিংবা উঠোনে বাধার সঙ্গে খেলা করে । যেহেতু রাইস কথা বলতে পারে না তাই ওর কোন অভিযোগ নেই । বুড়ির অবহেলা ও নীরবে মেনে নেয় কিংবা বুড়ির আদর সোজাগও নীরবে উপভোগ করে । রাইস একদম একলা । কারো সঙ্গে ওর কোন যোগাযোগ নেই । বুড়ি হাঁটুতে ঘুতনি রেখে চূপচাপ রমিজার পাশে বসে রাইল । বৃষ্টিবাদলা না থাকলে রমিজা উঠোনের ছলোয় রান্নাবাড়ি করে । রান্নাঘরের চাইতে বাইরে বাঁধতেই নাকি ওর ভাল লাগে । রমিজা গল্পনে আগনে ভাত ফোটায় । তকনো পাতা দাউদাউ জলে, বাতাসে সেটা আরো দপ্দিয়ে ওঠে । বুড়ি একদৃষ্টে আগন দেখে । উগ্বৰগ করে ফুটে ওঠা ভাতের দিকে তাকিয়ে থাকে । মনে মনে ভাবনা এসে জড়ে হয় । হলদী গীত তো এমন উগ্বৰগ করে ফুটছে । আগন দিল কে? এ আগনে কোন পাতিলের ভাত সেন্দে হবে?

ফাগন শেষে চোত এল । চোত মানেই তো সূর্যের আগনে খেলা । বৌ-বৌ করে গায়ের বুক । মাটি বস্ত ঢাড়া, রোদের তাপে পা ফেলা যায় না । বুড়ি এখন বেশি বেরুতে পারে না । বেরুলে গায়ে আগনে-বাতাসের হলকা লাগে । পায়ের নিচে ঠোসকা পড়ে । কেমন হাঁফ ধরে যায় । খালের পানি চিকচিক করে । ও রমিজার সঙ্গে গল্প করে ।

জানিস রমিজা আমার জীবনে হলদী গী-কে এমন গরম কোন দিন দেখিনি । রোদ তো নয় যেন গলগনে আগনের হাঁপরের মুর্দ্দা কে খুলে দিয়ে রেখেছে । বাইরে বেরুনোর জো নেই ।

- আপনি এক ঘোরাঘুরি করবেন না আমা । সারাদিন ঘোরাঘুরি করে আপনার শরীর কেমন হয়ে গেছে । শেষে একটা অসুব না বাধলে বাঁচি । কাল থেকে যেন আপনাকে বাইরে না দেখি ।

- তা কি হয়? ঘুরতে আমার মন চায় রে । দেখিস না ওরা কেমন মেতে উঠেছে ।

- থাক, ওরা মাতৃক । আপনার দরকার নেই ।

রমিজা বুড়িকে ছোট মেয়ের মতো শাসন করে ।

- না রে রমিজা এমন কথা বলিস না । ওরা যখন 'জয় বাংলা' বলে চেঁচিয়ে ওঠে মনে হয় আমার প্রাপ্তি ধরে কে যেন নাড়িয়ে দিয়ে গেল । এমন ডাক আর হয় না রমিজা । রমিজারে তুই আনেক কিছু বুঝিস না । আয় আমরা চিন্কার করে বলি, জয় বাংলা ।

রামিজা হঁ করে বুড়ির মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। বুড়ির মুখ যেন এক পৰিত্র  
জ্যোতিতে উষ্টুসিত হয়ে উঠেছে।

- জানিস রামিজা সবকিছু ভুলে যাই কিন্তু এই ডাকটা আমি ভুলি না। কথনো ভুলি  
না। ভুলতে আমি পারি না। কেন এমন হয় বল তো?

- আমি জানি না আম্মা।

- আমি দেখি রে এই ডাক হলদী গাঁকে ভাসিয়ে নিয়ে গেছে। আমার এত বছরের  
জীবনে আর কোন ডাকে হলদী গাঁয়ে এমন জোয়ার দেখিনি রামিজা। আহা কি যে ভাল  
লাগে। মনে হয় মরে যাই। এখন মরে গেলে আর কোন দৃশ্য নাই।

- আম্মা আপনি এত ভাবেন কেন?

বুড়ি ওর সঙ্গে আর কোন কথা বলে না। নিজের মধ্যে ডুবে যায়। রামিজা শান্ত  
চূপচাপ ঘোরে। এতসব হট্টগোল পছন্দ করে না। তাছাড়া ওর শরীরও ভাল নেই।  
ভেতরের প্রাণের সৰ্কণ ছটফটিয়ে বাঢ়ছে। ও রামিজাকে ব্যতিবাঞ্ছ করে রাখে। বুড়ি  
আকাশ দেখে। রামিজা বলে ভাবেন কেন? এতসব কর্মকাণ্ডের ভেতর থেকে কেউ কি না  
ভেবে পারে? তৈরের আকাশ উজ্জ্বল নীল। বাঁশবনে ছাতার পাথি ডাকে। সেটা ধামলে  
কুটুম্ব পাখি ডেকে ওঠে। বুড়ি কান পেতে শোনে।

- কুটুম্ব পাখি ডাকে রামিজা?

- নির্ধার আমার বাপের বাড়ির লোক আসবে। উঃ কতদিন যে বাবাকে দেখিনি।  
ছেটি বোন দুটো এলে আরো ভাল হয়। ওরা আমাকে যা ভালবাসতো। আমাকে ছাড়া  
ওদের এক মুহূর্ত চলতো না। সারাক্ষণ আমার পিছে পিছে ঘুরতো।

রামিজার শুশিভরা মুখ চেয়ে দেখে বুড়ি। বাবার বাড়ির কথা তনলে রামিজার মুখ  
শুশিতে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। ও তখন অন্য এক জগতে চলে যায়। বাবার বাড়ির সাদ  
বুড়ি পায়নি। ওর কাছে শুনুর বাড়িও যা বাবার বাড়িও তা ছিল। বুড়ির মনে হয় মেঘে  
মেঘে অনেক বেলা হয়েছে। গফন করে মরে গেছে সেই স্মৃতিও বাপসা হয়ে এসেছে।  
সলীম কলীম কোনাদিন ছেটি ছিল কি না তাও আজ আর মনে নেই। কিমুনি আসে।  
ঝি-ঝি দুপুর ঘুমের আমেজ ঘনিয়ে আনে। দাওয়ার ওপর রামিজা ঘুমিয়ে গেছে। রইস  
ঘরে। সলীম কলীম এখনো ফেরেনি। বেলা গড়িয়ে যায়। ওরা ফেরেনি বলে কেউ  
দুপুরের ভাতও খায়নি। রামিজাকে খেতে বলেছিল বুড়ি। ও খায়নি। সলীমের আগে ও  
খায় না। ওদের অপেক্ষায় বসে থাকে বুড়ি। বাঁশের খুটিটা সঙ্গে হেলান দিয়ে বসে।  
তলে শুম এসে যেতে পারে। বাবেবারে তস্তা ছুটে যায়। মনে হয় কলীম যেন উঠোনের  
মাথা থেকেই চিন্কার করছে। বলছে, মা ভাত দাও। ওর যেন তর সইছে না। ক্ষুধায়  
পেট চৌ চৌ করছে। কলীম ভীষণ ক্ষুধার্ত। বুড়ি ধড়ফড়িয়ে উঠে বসে। চোখ খুলে  
দেখে কেউ কোথাও নেই।

বুড়ি বিহ্বল হয়ে যায়। কে ডাকে অমন মা মা করে? কার প্রাণ ফেটে যাচ্ছে মা  
ডাকের জন্যে? কে অমন চিৎকার করে ভাত চায়? বুড়ি কান খাড়া করে চেয়ে থাকে।  
পুরো হলদী গাঁ যেন চিৎকার করছে ভাতের জন্যে। আকালে, বন্যায়, খরায় এমন  
চিৎকার ও অনেক তনেছে। তধু তাই নয় এমন চিৎকার ও অহরহ শোনে। এই

চিহ্নকারই হলদী গাঁর নিয়তি। চিহ্নকার করতে করতে হলদী গাঁর লোকগুলোর মুখ দিয়ে রক্ত উঠে মরে। বুড়ির অস্ত্র লাগে। মনে হয় কতগুলো শব্দে ওর চারপাশটা গমগম করছে, যা ভাত দাও- যা ভাত দাও। ভাত দাও-ভাত দাও-ভাত দাও। অন্তর ছটফট করে।

বুড়ি উঠোনে নেমে আসে। কাচারীঘর ফাঁকা। সামনে এসে দাঁড়ায়। রাঙ্গা বরাবর যতদূর চোখ যায় দেয়ে থাকে। কেউ কোথায়ও নেই। মাঠের ধারে গুরু বাঁধা। দু'একটা ছাগল চরে বেড়ায়। বুড়ি আরো একটু এগিয়ে বড় জলপাই গাছটার নিচে এসে দাঁড়ায়। অনেক দিনের পুরোনো প্রকাও গাছটা ডালপালা ছড়িয়ে অনেকটা জায়গা জুড়ে দাঁড়িয়ে আছে। যেন বিরাট একটা সরাইখানা। যে কেউ এসে দু'দণ্ড জিরিয়ে নিতে পারে। সেখানে দাঁড়িয়েও বুড়ি আপ্রাণ চেষ্টা করে লোক দেখার। না কেউ কোথাও নেই। হঠাত করে হলদী গাঁ যেন জনমানব শূন্য নিখুঁতপুরী হয়ে গেছে। সব লোকগুলো কোথায় গেল? বুড়ি বাঁশবাগান থেকে গরুটা বুলে বাড়ির আশিনায় নিয়ে আসে। কিছুদিনের মধ্যেই গরুটা বিয়োবে। রমিজা ঘূর থেকে উঠে চুপচাপ বসে থাকে। রইসও বারান্দায় এসে বসেছে।

- কেউ ফিরেনি আম্বা?

- নারে। তোর আর না খেয়ে থাকা ঠিক না। চল আমরা খেয়ে নিই।

রান্নাঘরে বসে ডিনজনে ভাত খায়। সাদা ফকফকে ভাতের দলা হঠাত করে বুড়ির কাছে কেমন শক্ত মনে হয়। বারবার পানি খায়।

- কি হলো আম্বা?

- খেতে মন লাগে না রে।

বুড়ি ভাত মাড়াচাঙ্গা করে। রইস গপগপিয়ে খায়। ওর পেটে ভীষণ কিদে। বুড়ি ওর দিকে চেয়ে থাকে।

সক্ষ্যায় সলীম কলীম ফিরে আসে। দু'জনের মুখ শুকনো। সারাদিন কিছু খায়নি।

- কোথায় ছিলি তোরা?

- মিটিৎ শুলতে গিয়েছিলাম।

সলীমের সংক্ষিঙ্গ উত্তর। বুড়ি দু'জনকে ভাত বেড়ে দেয়। খেয়েদেয়ে বারান্দায় বসে ওরা। সারাদিনের ঝুঞ্চিতে হঠাত করে ঘূর আসে না। রমিজা রান্নাঘরে ধালাবাসন গোছগাছ করে। বাঁশবাগানের মাথার ওপরের গোল চাঁদ থেকে আলো চুইয়ে পড়ছে। বুড়ির মনে হয় কি সুন্দর রাত। বিরক্তিয়ে বাতাস বইছে। বছদিন হলদী গাঁকে এমন মোহনীয় মনে হয়নি ওর। ওর ইচ্ছে করছে এমন চাঁদের আলোয় মাঠঘাট প্রান্তর একবার ঘূরে আসতে। আহা কি সুন্দর এই হলদী গাঁ।

- ইচ্ছে করে তাক ছেড়ে বুক ফাটিয়ে গান গাই?

গা না কলীম?

বুড়ি উৎসাহ দেখায়।

কিন্তু কেমন করে আসছে না মা?

কলীম উঠোনে পায়চারি করে। বিড়ি ধরায়। বাঘার পিঠ ঢাপড়ে দেয়। রমিজা এসে ওদের কাছে বসে। সারা দুপুর শুমিয়েছে বলে রাইসেরও ঘূম নাই। ও বুড়ির পিঠের সঙ্গে হিশে বসে আছে।

- আজকের রাতটা কি যে সুন্দর!

চুপচাপ থাকা সলীমও ওইটুকু না বলে পারে না। নারকেল পাছের ছায়ায় দাঢ়িয়ে কলীম ওনওনিয়ে পান গায়। কখনো কিছু শব্দ জোরে উঠে আসে। আবার নেমে যায় কঠো। সলীম বসেই থাকে। আজ ওর ঘূম পায় না। রমিজা হাই কোলে না। ওরও ঘূম পায়নি। আর বুড়ির চোখ থেকে তো ঘূম পালিয়েছে। এক সময় রাইসও উঠোনে নেমে যায়। পুর্ণিমার ঠাদের দিকে তাকিয়ে হাততালি দিয়ে হেসে ওঠে। বাড়ির সামনের জমকুল গাছ পর্যন্ত হেঁটে আসে। বাঘা ওর পিছু পিছু ঘোরে। বুড়ির পরিবারের সবাই আজ তবা পুর্ণিমা সাক্ষী করে কিছুটা এলামেলো, কিছুটা উদ্ভাস্ত সময় কাটায়।

চোত মাসের দশ তারিখে ওদের কমলামী ট্রানজিস্টারে করে ঢাকার ব্ববর এলো। মিলিটারি নেমেছে ঢাকার আজপথে। তখন চৈত্রের আকাশ মুঠো মুঠো রোদ ছাড়িয়ে থাকে মাঠেঘাটে। রমিজা গরম ভাত নামিয়েছে চুলো থেকে। আর সলীম চেজাজে। একটি অব্যাক, অবজ্ঞাত ছোট গ্রাম হলদী গায়ের সলীম চিংকার করছে ক্ষোভে, আকেশে। বুড়িকে ধরে কাঁকুনি দেয় কয়েকটা। শপথ নেয় অস্তুত বলিষ্ঠ কঠে। বুড়ি কেবল অব্যাক হয়ে তাকায়। কোন কিছু বোঝার ক্ষমতা ওর নেইও। যে হেলে যাকে কোনদিন পাত্তা দেয়নি সে হেলে আজ মা-কে ধরে চেজাজে। বৌ-কে, এমনকি ওর পেটের সন্তানকে সাক্ষী করে কেমন শক্ত শক্ত কথা বলছে এক প্রত্যায়নিষ্ঠ আবেগে। বুড়ির মুখ থেকে কোরানের আয়াতগুলো যেন ভঙ্গি সহকারে নিঃসৃত হয় সলীমের কঠ তেমনি ভঙ্গিতে, আবেগে, শপথে গহণয় করছে। সলীমের এ চেহারা বুড়ি কোনদিন দেখেনি। সলীমকে অনেকদিন রাগতে দেখেছে কিন্তু সে রাগের সঙ্গে এ রাগের অনেক তফাত। এ বিক্ষোভ যেন অন্য কিছু। অন্যরকম। সলীম যেন সামনে শক্ত রেখে রস্ত আকেশে বিস্ফোরিত হতে থাকে। একসময় ট্রানজিস্টার বক করে কোথায় যেন স্কুটি বেরিয়ে যায়। কলীমকেও সঙ্গে নেয়। ওদের কাঁও দেখে বিরক্ত হয় রমিজা। পেটের ভেতর শক্রটা নড়াচড়া করে। বেচারীর তবা মাস। শরীর ভাল নেই। মেজাজ বিচড়ে থাকে।

যতসব আজগাহী কাজবাজ। কেবলায় ঢাকায় কি হলো তার দেখা নেই। ওনারা এখানে চিংকার তরু করলেন।

রমিজা গজগজ করে ভাতের ইঁড়ি শিকার ওপর উঠিয়ে রাখে। আড়তোখে বুড়ির দিকে তাকায়।

- ও আস্যা আপনার কি হলো?

বুড়ি উত্তর দেয় না। চুপচাপ বসে থাকে। 'জয় বাংলা' শব্দটা উধাল পাতাল করে বুড়ির শরীর থেকে বেরিয়ে আসতে চায়। সলীম কলীম ঐ ভাক ভাকতে ভাকতেই বেরিয়ে পেছে। এখন সেই শব্দ মুঠো বুড়িকে জ্বাপটী ধরে রেখেছে। হ্যাত পা কেমন অবশ লাগে। হ্যাকরে রমিজাৰ দিকে তাকিয়ে থাকে।

- দেখছেন কি আমা? ও আমা?
- রমিজা আয় আমরা ওদের মত 'জয় বাংলা' বলে হাঁক দিয়ে উঠি।
- তাতে কি হবে?
- আহ, রমিজা তুই কিছু বুবিস না। বুঝতেও চাস না।
- সেই ভাল বাপু, অতশ্চত আমার শয় না।

বুড়ি দাওয়া থেকে নেমে আসে। ইচ্ছে করে সবার মত সাবা গী মাত্রিয়ে তুলতে। জলপাই গাছটার নিচে এসে দোড়ায়। পাছের সঙ্গে কথা বলে— জলপাই গাছ সবাই বলে আমি কোন কাজে লাগব না। কেন লাগব না? লাগালেই লাগতে পারি। আমার ইচ্ছে করে কিছু করতে। হলদী গী আমার বড় প্রিয়। ছেলেবেলা থেকেই তো এর ধাস-লতাপাতা, ধূলোমাটি, জলকানা আর লেংটিপুরা মানুষগুলো আমার আপন হয়ে আছে। জলপাই গাছ- আমার বড় সাধ হলদী গীর জন্যে আমি মরে যাই। মরে গিয়ে হলদী গীকে বলি, হলদী গী তোর জন্যে, তখুন তোর জন্যে আমার পরাগটুকু দিলাম। এ পরাগ আমি আর কাবো জন্যে বাধিনিরে। এটা তোরই।

বুড়ির বিড়বিড়ালি থেমে থায়। দূরের মাঠে ছেলেরা জটিলা করছে। এতদূর থেকে কথা শোনা যায় না। বাতাসে কান পেতে রাখে। যদি কিছু ভেসে আসে। বুড়ির পলায় কাছটা শুনিয়ে এসেছে। বৃক্ষের বুকের আবেগ নিয়ে হ্যাঁ করে তাকিয়ে থাকে। হাথার উপর কৃত্য পারি ভাকে। ঘৰা পাতা ছিচ্ছিয়ে দেজি ছুটে পালায়। কোন কিছুতেই বুড়ির খেয়াল নেই।

দিন সাতকেরে ঘৰো পোড় খাওয়া মানুষ হয়ে দিবে আসে জলিল। সবাই গোল হয়ে ওর কাছ থেকে ঢাকার ব্যব শোনে। ওর বৌ আর মেঝে দুটো মারা গেছে। সেই শোকে নিশেহানা। তখুন জলিলের পেশি-জহুল পেটিনো শরীরটা শক্ত হয়ে গেঁটে।

- আমাদের এর প্রতিশোধ নিতে হবে সলীম। আমরাও হেঁড়ে দেব না।
- হ্যাঁ ঠিকই। প্রতিশোধ চাই। রক্তের বদলে রক্ত।

বুড়ি বেড়ার পাশে-দাঁড়িয়ে শোনে। সবাই চলে গেলে জলিল এসে বসে বুড়ির দাওয়ায়। ওকে এখন চেনা যায় না। অনেক বদলে গেছে। হাথার চুল অর্ধেকের বেশি সাদা হয়েছে। বুড়িকে দেখেই জলিলের আবেগ কেঁপে গেঁটে। শ্বশিত কঠে এলোমেলো কথা বলে।

সব মানুষ যখন ধূমিয়ে রাতের আধারে পাকিস্তানী সৈনান্মা বাঁপিয়ে পড়লো। আগুন। গুলি। সাউন্ডার্ট করে জুলে চারদিকে। মানুষ চিন্দ্রায়। আমি বাড়ি ছিলাম না। শিয়েছিলাম নীরাতিশগ্নি। বাবুবাজার বাণি পোড়ার সঙ্গে সঙ্গে ওরাও পুড়ে মরলো। সব আমারে বললো পাশের ঘরের তাহের। ওরও কেউ বাঁচেনি। ও একলা পালিয়েছে।

জলিলের চোখ দিয়ে দরদরিয়ে জল গড়ায়। বুড়িও কানে।

- আমি এমনটা দেখি নি বুড়ি। মানুষ মানুষকে এহল করে আর কি করে? উৎ আস্তা ওদের প্রাণে কি আয়াদয়া নাই? চোখ বক করলে আমি আগুন দেখি। কলির শব্দ শনি। মানুষের চিরামিতে কান ফেটে মেঝে চায়। বুড়ি আমার ঘূর আসে না।

জলিলের মুখের শিরাভলা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। বুড়ি নির্ণয়ের তাকিয়ে থাকে। এক সময় থেমে থেমে বলে, যারা আমাদের ওপর তলি চালালো তারাতো আমাদের দেশেরই মানুষ জলিল ভাই?

- হ্যাঁ আমরা তো একদেশেরই মানুষ। দেশটাতো পাকিস্তান। অন্য নাম তো কৰিনি।

- তাহলে গুরা আমাদের মারে কেন? গুরা কি আমাদের ভালবাসে না?

বুড়ির কষ্ট উত্তেজিত হয়ে ওঠে। জলিল চুপ করে থাকে। এর উত্তর ওঁজানে না। বুড়ির কথা নিজেও ভেবে দেখে।

বুড়ি আবার বলে, আমাদের জন্মে যাদের মায়া নেই তাদের জন্মে আমাদের মায়া কি জলিল ভাই?

- ঠিক বলেছো। এ জন্মেই তো আমরা আলাদা হব। একথাই তো সবাই বলে, আমি কেবল বুবুতে পারি না।

জলিল উত্তেজিত হয়ে ওঠে।

- ভেবেছিলাম শোধ বেব। দেশের জন্ম লড়ব। আমি যাই বুড়ি।

জলিল দ্রুত পায়ে নেমে যায়। সলীমকে খোজে। বুড়ি বসেই থাকে। ওর কাছে এখন সব কিছু পরিকার হয়ে আসছে। ওর ঘষ্ট ইন্দ্রিয় দিয়ে সব বুঝে ফেলে। আগুন মানেই কেবল রমিজার ভাত রীতা নয়। আগুন আরো অন্য কিছু। তলি শব্দটাও বুড়ির অভিজ্ঞায় নতুন করে সংযোজিত হয়। তলি দিয়ে পারি শিকার করতে দেখেছে বুড়ি। কিন্তু মানুষ মারতে দেখেনি। বুড়ি বিড়বিড় করে, এই গুলিটা যখন আমাদের শরীরে ঢুকতে পারে তখন ওদের শরীরে ঢুকবে না কেন? বুড়ি সাহসী হয়ে ওঠে। আমাদের ছেলেরাও তো ওটা পাল্টা হোকার জন্মে তৈরি হচ্ছে। বুড়ি উঠে প্রিয় জলপাই পাছের নিচে এসে দাঁড়ায়। এখান থেকে গায়ের অনেক কিছু দেখা যায়। দেখতে পায় মাটের অধ্য দিয়ে ঢুক্ত হৈটে যাচ্ছে জলিল।

চৈতের শেষ রমিজার ছেলে। হ্যাঁ। ফুটফুটে ছেলে। বেশ বড়সড়। অবিকল পফুরের মত। বুড়ির কাজ বাঢ়ে। সারাক্ষণ নাতি নিয়ে যেতে থাকে। কাজল পরায়, তেল মাখায়। গো চকচক করে। ওকে নিয়ে গান গায়। বুড়ির প্রাপের বক্ষ দুর্যোর হেন খুলে পেছে। এ ছেলে কি করবে, কোথায় রাখবে বুবুতে পারে না? রমিজা বুড়ির কাজ দেখে ছাসে।

- আম্বার শুশি যেন আর ধরে না।

গর্বিত মায়ের সব রমিজার কষ্টে। বুড়ি রমিজাকে দেখে। শুশিতে ওর মুখটা চকচক করে।

- কি দেখেন আম্বা?

- দেখি তোকে। রইস হওয়ার পর আমি তোর মত সুখ পাইনি রমিজা।

- এই দেখ কোথা থেকে কি কথা।

রমিজা তাড়াতাড়ি পুরুর ঘাটে চলে যায়। বুড়ি বাধার পায়ে ধাঁকাড় দেয়, এই বাধা তোর শুশি লাগছে না? আমাদের ঘরে একজন নতুন মানুষ এসেছে।

বত দিন যায় মাতিকে কেন্দ্র করে বুড়ির আবেগ তরঙ্গিয়ে থাঢ়ে। ছেলেকে দোলাতে দোলাতে বুকের সঙ্গে চেপে ধরে। ও রাইসের মত নয়। ও হাসে, তাকায়, মুখ নিয়ে বিচিত্র শব্দ করে। যখন বুড়ির লিকে তাকিয়ে হাত-পা ঝুঁজে খেলে তখন বুড়ি বুকের ভেতর জমানো সব দুঃখের কথা ভুলে যায়। ওর সঙ্গে কথা বলে, ও দানু, দানুরে তুই আমার সাত কাজার ধন। বুকের মালিক। তুই এমন একটা সহয়ে এলি! এটা এখন জায় বাংলার সহয়ে। দেখছিস না চারদিকের বাজাসে উধাল-পাখাল চেষ্ট। দানুরে তুই জানতেও পারিস না যে তোর বাপের বুকের মধ্যে প্রতিশোধের আগুন। হলদী গী এখন গায়ের চামড়ার বদল ঘটাবে বলে তৈরি হয়ে উঠেছে। ও দানু, দানুরে তুই যখন বড় হবি দেখবি হলদী গী আব হলদী গী নেই। হলদী গী বদলে গেছে। যারা তারের বুকে গুলি চালায় আমরা তাদের সঙ্গে থাকি না রে।

বুড়ি মাতিকে চুমোয় চুমোয় ভরিয়ে দেয়। পরক্ষণে সলীয়ের ওপর ঝেগে ওঠে। সারাদিন ওর কাজ আব কাজ। কি যে এত কাজ?

বুড়ি একদিন বলেছিল, হ্যাঁ রে বাপ হয়ে ছেলেটাকে তো একদিন ভাল করে দেখলিও না? এ কেমন কথা?

ভূত ঐ মুরগির বাজা আমি দেখব কি? তুমি দেখ। বড় হোক তখন ও আমার।

বুড়ির আবাক হয়ে ওর দিকে তাকায়।

- কি দেখছ কি? আজ্ঞা মা তুমি যে ওকে কোলে নিতে বল তা কি আমি পারি? হাতের ফাঁক নিয়ে তো পড়ে যাবে। তাছাড়া আমার সহয় কৈ ছেলে সোহাগ করাব? আমার কৃত কাজ।

- ঐ কাজ নিয়েই তুই থাক। বড় হলেও ছেলে তুই পাবি না।

- আজ্ঞা নিও না। শোন মা, ও যাতে একটা স্বাধীন দেশের মাটিতে বড় হতে পারে সেই প্রতিভাই তো আমি নিয়েছি। বড় হয়ে ও গর্ব করতে পারবে যে ওর বাপ একটা নতুন দেশের জন্যে দুঃখ করেছিল। আমার ছেলের বুকের মধ্যে এই অহংকারের ধীঁজ আমি পুঁতে দিতে চাই মা। এটাই আমার সোহাগ। তুমি ওকে এখন সোহাগ কর ও যাতে বড় হয়। মানুষ হয়।

সলীয় হাসতে হাসতে বেরিয়ে যায়। কথাগুলো বুড়ির বড় ভাল লাগে। কথাগুলো বুকের কৌটো খুলে তার মধ্যে জমিয়ে রাখে। দুসময়ে এসব কথা ভীষণ কাজ দেয়। বুড়ির দুঃখ ঝুলিয়ে দেয়।

রাইস আবে আবেক হয়ে বাজাকে দেখে। কি যেন এক বিশ্বয় ওর চোখের সামনে। এত ছোট বাজা এত কাছ থেকে ও আব কখনো দেখেনি। হ্যাত পা নেড়েচেড়ে যাবে যাবে বিকল হয়ে যাব। যাবতেও ওঠে। রাইসের ভয়ে নাতিকে সারাক্ষণ আগলে রাখে বুড়ি। ও কখন কি অঘটন করে ফেলে বলা যায় না। মাতিকে নিয়ে বুড়ির সহয় চমৎকার কাটে। সলীয় কলীয় বেশির ভাগ সহয় বাড়ি 'থাকে না। কখনো বা রাখেও ফেরে না। রমিজা সাংসারিক আমেলায় ছেলের দিকে নজর দিতে পারে না। ফেলে নাতির সব দায় দায়িত্ব বুড়ির একলার। ও একটা ছোটী দেশ। বুড়ি ঐ দেশের মালিক। ঐ দেশে আব কারো প্রবেশের অধিকার নেই। দুপুরের কঢ়া রোদে বাইরে যখন ঘুরু হ্যাতের নবী ঘোনেড়

ভাবে তখন বৃক্ষিক অস্ত্রের আর শূন্য হয়ে যায় না। বামিজার ছেলে সরোবরে নীল পর হয়ে অনবরত গুরু হড়ায়। প্রশান্তির আলো হয়ে ঝুলে বৃক্ষিক মন নামক সমুদ্রের বাতিঘরে। ভাবনার পাখিচলো সে বাতিঘরের ঢারপাশে বারবার কিন্তু জয়ের আশয়। নাতির ডিঙ্গায় ভাল করে বৃক্ষতেও পারে না বৃক্ষ। বস্তুণা কখনো হমুর হয়ে ওঠে। বৃক্ষিক এখন সে অবস্থা, দিনভলো পালে বাজাস লাগা সৌজন্যের মত।

বৈশাখের শেষ দিকে গান গাইতে গাইতে নীতা বৈরাণিনী আসে। একলা, চরশদাস নেই। হাঁটির কাষ্টাকাষ্টি শাকি ওঠানো। ধূলোর ধ্বনিত পা। ঝোন্ত চেহারা, ককনো ধাসের মত রুক্ষ চুল বাজাসে ওঠে। নীতাকে যেন বয়সে পেরে বসেছে। ওকে দেখে ককমকিয়ে ওঠে বৃক্ষিক চোখ।

- সই কাতলিন আসিসনি। আর কম।

হাত ধরে নীতাকে বারান্দার উপর এনে বসায়। ত দোভারাতি মাঝিয়ে বাখে একপাশে। পিঠের উপর থেকে কাপড়ের পুটলীটি ও মাঝায়। পা দু'খানা জড়ো করে বসে।

- নাতি বৃক্ষি?

- হ্যাঁ।

- চান্দের মত হেলে।

নীতা সরল হাসি হাসে। বুকের নিচে দুম করে বিসের যেন একটা শব্দ হয়। হেলে, সামী এসবের কোন বালাই নেই ওর জীবনে। বৃক্ষিক এখানে এলে বুকটা কেন মুক্তফে ওঠে। যত বয়স বাঢ়ছে ততইই এসব বোধ পুরু হচ্ছে। এখন আর ওর মৌখিন নেই। মৌখিনের মাসকতা নেই। পথে পথে দূরে ঝোন্ত হয়ে যায় নীতা। বিশ্রাম ঢায়, আশ্রয় ঢায়। দু'বৃক্ষি আত ঢায়। নীতা হঠাতে করে সব দুঃখবোধ একপাশে ঠেলে রেখে কোমরে গৌজা কৌটো থেকে আয়াক দের করে।

- কিরে কি জাবছিস?

- আবাহি তোর মত একটা সংসার পেলে ঠেলেছুলে দুকে যাই।

- কি যে বলিস সংসার কি তোর ভাল লাগবে? তোর মুখে তো আগে কখনো এমন কথা শনিনি?

- যত বয়স বাঢ়ছে ততইই তোকে আমার হিংসে হয়।

- সব তোর ধাজে কথা।

বৃক্ষি হেলে গাঢ়িয়ে পড়ে। নাতিকে আদর করে। নীতার বৈরাণী যন ধূ-ধূ করে। ধূসর হয়ে যায় সামনের দিনভলো। পেছনের দিনভলো কল্প অধুময় ছিল। ধরের ঢার দেয়াল কল্পনাই করতে পারত না। এখন আবাজায় বসেও সব কেমন এলোমেলো হয়ে যায়।

- তোর মনের মানুষ কই সই?

- মনের মানুষ? মনের মানুষ হেতে এসেছি। এখন এই দেশটাই মনের মানুষ। নীতা সোজা ঝুলে নেয়। টুটোৎ কানিন সঙ্গে সঙ্গে ও আবার নিজের দুবসে হিঁরে আসে। মাঝে মাঝে এখান থেকে বেরিয়ে গিয়ে একটা অকান্ত বস্তুণা পায়।

ও গান ধরে :

সোনাৰ গায়ে বসত কৱি

সোনা মারেই জানি

বাংলা মায়ের কথা কইয়া

জুড়াইতো পৰাণী

মায়ের কোলে দুধের শিত

আদৰের নাই শেষ

আমাৰ সোনাৰ বাংলাদেশ।

বুড়ি হনোয়োগ দিয়ে গান শোনে। সঙ্গীয় কলীমের কথা মনে হয়। ওৱা ও ঠিক এই বলে। নীতার কষ্ট বুড়ির অন্তর ছুয়ে সারা গায়ে ভেসে চলে যায়। বাঁশবনে, খালের ধারে, স্টেশনেৰ রাস্তায়, শিমুল গাছের মাথায় একটা ছোট বলের মত লাফিয়ে লাফিয়ে যায়। বাতাসেৰ সঙ্গে তাৰ সব ভাৱ। বুড়ি অভিভূত হয়। নীতাকে বড় আপন, বড় কাছেৰ মনে হয়। ও এখন কেবল মনেৰ মানুষ খৌজা বাউল নীতা নয়। নীতার সুখ-দুঃখ কষ্টেৰ গান মিলিয়ে নীতা বুড়িৰ ঘৰেৰ লোক। দূৰেৰ নষ্টত্ব হয়ে কেবল জুলে না। নীতার দোতারার টুট্টাং কৰনি সারা বাড়িয়া জেগে রয়। উঠোনে রমিজা বাঁশপাতা দিয়ে ভাত ফোটায়। মুঠো মুঠো তকনো পাতা চুলেৰ মধ্যে গুঁজে দিচ্ছে। একদফা পুড়ে নিঃশেষ হৰাব আগেই আৱেক মুঠো দাউদাউ কৰে জুলে ওঠে। আগুন দেখতে দেখতে নীতার দোতারা থেমে যায়। বলে, আজ আমাৰ যাৰাব তাড়া নেই সই। তোৱ ছেলেৰা বাড়িতে নেই তো?

- না, তাছাড়া ওৱা কখন কিনবে তাৱও ঠিক নেই।

- ওৱা থাকলে বড় সংকোচ লাগে।

মিছামিছি লজ্জা পাস। ওৱা বড় ভাল ছেলে।

কি রেঁধেছিস সই?

ধূন্দুল দিয়ে শোল মাছ। লাল শাক ভাজি। ভাল। নারকেলেৰ ভর্তা।

বাঃ বেশ। খাওয়াটা ভালই হবে। ভাল আৱ নারকেলেৰ ভর্তা হলোই আমাৰ জলবে। ভাল যাৰাব খেতে না পেয়ে জিহ্বায় চড়া পড়ে গোছে সই।

- কি আমাৰ ভাল যাৰাব। তুই তো বেশি কিছু বাসই না।

নীতা হেসে মাথা নাড়ে।

বুড়ি রমিজাকে ভেকে বলে, ও রমিজা, সই আজ এখানে ভাত খাবে।

- ভালই তো। তাৱপৰ নীতার দিকে তাকিয়ে বলে, আমাৰ সই এলে আমা খুব খুশি হয়। আপনি কিষ্টি বেশি বেশি কৰে আসবেন।

- প্রায়ই তো আসি।

- কই আসেন? একবাৰ গোলে আমাৰ কথা তো ভুলেই যাম। আবাৰ কতদিন পৰে যানে পড়ে।

- পথে পথে ঘূৰি। আখড়াৰ দিন কাটে। আমাদেৱ কি পথেৰ ঠিক আছে।

রমিজা হেসে যাবা নাড়ে। চুলো থেকে ভাত নামাতে ব্যাস্ত হয়ে পড়ে। বুড়ি ভালায় করে মুড়ি এনে নীতার সামনে দেয়। ঘটিতে করে জলও। রইস বারান্দার একপাশে বসে আছে। মুখ দিয়ে লালা গড়াজ্জে। বাম হাত দিয়ে বারবার মাছি তাড়ায়। বুড়ি নাতিকে ঘুম পাঢ়ায়।

নীতা রইসকে মুড়ি দেয়। ও খাবার জন্যে আগ্রহ দেখায় না। ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেয়। নীতা হেসে ফেলে।

- আমাকে তোর ছেলের পছন্দ নয় সই। দেখতেই পারে না।

- ওর কথা আর বলিস না। আমার কত সাধ, কত আকৃষ্ণ ছিলরে সই।

- এই দেখ কি কথায় কি কথা। যা তোর নাতিকে ওইয়ে দিয়ে আয়। ও ঘুমিয়ে গেছে।

বুড়ির গঠে না। নাতিকে কোলে দোলায়।

নীতা আনমনে মুড়ি চিরোয়া। রমিজার রাঙ্গা শেখ হয়েছে। গনগনে চুলো লাল হয়ে আছে। তাপ ছড়াজ্জে। রমিজা গাহচা নিয়ে পুরুরাটে যায়। নীতা ওর চলার দিকে তাকিয়ে বলে, তোর বৌমার স্বাস্থ্য ভাল হয়েছে রে?

বুড়ি বোকার মত বলে, হ্যাঁ ও খুব ভাল হয়েছে।

নীতা পায়ের নখ দিয়ে মাটি আঁচড়ায়। মুড়ির দিকে মনোযোগ নেই। খেতেও ভাল লাগে না। তখনো মুড়ি গলায় আটকে যায়। আনমনে দূরের জামজুল পাছের দিকে তাকিয়ে থাকে। উঠোনের ওপর দিয়ে একটা তিতির ভাকতে ভাকতে উড়ে যায়। বুড়ি অশ্঵ষ্টি বোধ করে। কোলের মধ্যে নাতি ঘুমিয়ে গেছে। ওকে ঘরে ওইয়ে দিয়ে আসতেও ইচ্ছে করে না। কি হল নীতার? ওর মনে দোতারার তার কি ছিড়ে গেল? এমন বেসুরো হয়ে গেল কেন? কি হেন ভাবছে নীতা। কখনো নীতা এমনি করে বুড়ির কাছ থেকে সরে যায়। কখনো কাছে আসে আপন হয়ে। তখন বুড়ির মনে হত নীতা। আজ একলা এসেছে। সঙ্গে কেউ নেই।

- তোর মনের মানুষ কৈ সই?

- মনের মানুষ?

- ওমা ভুলে গেলি নাকি? তোর চরণদাস?

- চরণদাস আব্দায়।

- এলো না তোর সঙ্গে?

- এখন আমি ওর কেউ না। ও আবার মনের মানুষ জুটিয়েছে। ওর কথা বলিস না সই। আস্ত ছেটেলোক। এমন হারামী লোক আমি দেবিনি।

- তাহলে তুই এখন কি করছিস?

- আমার জান্যে এখন আছে অলিল বাটুল। খুব ভাল মানুষ। সারা-দিন বসে বসে গান লেখে। এই যে গাইলাম গুটা তো ওর লেখা গান। আমাকে বলে কি জানিস সই? বলে আমি ঘরে বসে বসে গান লিখবো তুই রাঞ্চায় রাস্তায় গেয়ে বেড়াবি। তবে তো দেশের মানুষ দেশের কথা জানবে। আমরা যদি গানে গানে না জানাই তবে গীয়ের লোকগুলো জানবে কোথা থেকে? ওর কথা শুনলে পরাণ জুড়িয়ে যায় সই। কতো ভাল

ভাল কথা বলে অবিল বাটিল। আবক্ষায় কত লোক আসে। রোজ আমি ওর পান গাই। লোকে চুপ করে শোনে। জানিস কারো কারো ঢোকে জলও এসে যায়।

অবিল বাটিলের কথায় উচ্ছিসিত হয়ে ওঠে মীতা। আবেগে চোখ বুজে আসে। ও গুমগুম করে। মীতার তরঙ্গে মুখে দেশের রেখা খুঁজে ফেরে। ও এখন অন্য জগতের বাসিন্দা।

আগে যখন গান গাইতাম তখন মনে হতো নিজের জন্য গাই। এখন মনে হয় সবার জন্য গাই। গাইতাম ভঙ্গির গান, প্রেমের গান। এখন গাই দেশের গান।

মীতার মুখে প্রশংসিত ছাপ। বুক তরে শ্বাস টানে। বুড়ির দম আটকে আসতে চায়। অবাক হয়। মীতা এত কথা শিখল কোথা থেকে? ও তো এত কথা জানত না? আগে কথনো বলেনি। ওর মনের মানুষ নিয়ে ব্যতু থাকত। ডিখ করত, গান গাইত। সঙ্গী ছাড়া পথ চলতে পারতো না।

- তুই এতো কথা শিখলি কোথা থেকে সই?

- সবই অবিল বাটিল। একদিন আবক্ষায় আমার গান বলে ঘরে নিয়ে গেল। বাততত্ত্ব আমার গান তনল। অবিল বাটিলের হত এমন করে কেউ আমার গান তনতে চায়নি। আমি ইন-প্রাপ দেলে পাইলাম। মনে হল এমন করে কোনদিন কার জন্যে পাইনি। আমি এক অন্য মানুষ হয়ে পিয়েছিলাম সই। চৰণদাস আমাকে ছেড়ে যাবার পর থেকে কেবল চিন্ধার করে গান গাইতে ইচ্ছ করত। আমি ওকে তুলতে চাইছিলাম। নিজের দুর্ব ছাড়াতে চাইছিলাম। অবিল বাটিলের মিটি কথায় সেদিন আমার গলা গানের নদী হয়ে পিয়েছিল। গান শেষে অবিল আমাকে বুকে টেনে সিল। তখন অনেক ঝাক। চারদিকে নিয়ন্ত্র অক্ষকার। ঝি ঝি-র ডাকও বন্ধ ছিল। শেষ মাত্রাকু দু'জনে চুপচাপ পিয়েছিলাম। কেউ একটি কথাও বলিনি। অবিল বাটিলের চগতা বুকে অনেক তাপ সই। আমার মনে হয়েছিল জন্ম বৃক্ষ এবার সার্বক হলো।

বুড়ি সহজ ইন্দ্ৰিয় সজাগ করে মীতার কথা শোনে। মীতা যেন কৃপকথার গল্প বলছে। সেই সাত সমুদ্র তের নদীৰ পারেৰ গল্প। বুড়িৰ জীবনেৰ ছাড়া সেই সমৃদ্ধেৰ পাড়ে আৱ পড়ে না। সেজনোই পঞ্জেৰ জন্মো বুড়িৰ এখন এত ঔৎসুক। তনতে পেলো আৱ ছাড়ে না।

জানিস সকালে উঠে অবিল আমাকে বললো, তুই এখন আমার মীতা। এই ঘৰ তোৱ আৱ আমার। নিজেৰ বুকে হাত দিয়ে দেখালো। বললো, এই বুক তোৱ মুমুক্ষুৰ জন্মো। আৱ তোৱ ঐ মিটি গানেৰ গলা তোৱ একলাৰ নয়। ঐ গলা সবার। এবার থেকে আমি গান বীধৰো। তুই গাইবি। মাস তিনিক অনেক গান গাইলাম। বিৱহেৰ গান, দেহেৰ গ্ৰন, বাটিল গান, ঘৰামি গান কতো কি? ভাৰপৰ জানিস সই সেই মাত্রন আসে রেতিওতে বঙ্গবন্ধুৰ ভাষণ শোনাৰ পৰ ও বলল, এসব গান আৱ ভাল লাগে না মীতা। এবার থেকে অন্য গান বীধৰো। আমি বললাম কি? বলল, দেশেৰ গান। দেশেৰ মানুষ এখন অন্যবন্ধম হয়ে গোছে বৈ। দেশেৰ গান শিয়েই ওদেৰ এখন জাপিয়ে রাখতে হবে। এই গান দিয়েই আমৰা আজ দেশেৰ কাজ কৰবো। সেই থেকে আমি এই গান গাই। আৱ অন্য কিছু ভাল লাগে না। কত জায়গায় ঘুৱে গান গাইলাম। লোকে

আমাদের ঘিরে ধরে রে । শরীরে ঝুব যোশ পাই । জানিস পরতদিন যখন গান গাইতে শুরু করলাম লোকে আমাদের সঙ্গে গাইতে শুরু করলো । ওরা বলল, আমরাও তোমার সঙ্গে গাইবো । আমি এক লাইন গাই তারপর ওরা গায় । সে কি উন্নেজনা ! সকলে দেশের গানে পাগল হয়ে উঠল । মনে হল আকাশ-বাতাস যেন গানে গানে ভরে গেল । কালকে তোর কথা মনে হল । তাই আজ চলে এলাম দেখতে ।

- সেই মানুষটাকে আনলি না কেন ?
- ও বেশি বেরতে পারে না । মাঝে মাঝে পায়ে একটা ব্যথা হয় ।
- আবার এলে আনবি ।
- হ্যাঁ তোর এখানে একবার না আনলে নিজেই শান্তি পাব না যে ।
- নীতা দু'হাত দিয়ে চুলের খৌপা বাঁধে ।
- বেলা অনেক গড়িয়ে গেল এবার উঠি সহ ?

বুড়ি নাতিকে দোলনায় শুইয়ে দেয় । রমিজা গোসল সেরে ফিরে এসেছে । ভিজে কাপড় সপ্ৰসপ্ৰ করে । ওর ভিজে শরীরের দিকে তাকিয়ে নীতার দেহ শীতল হয়ে যায় ।

- চল সহি ভুব দিয়ে আসি ।
- বুড়ির কথায় সাড়া দেয় নীতা ।
- চল । যা গরম । সব যেন পুড়ে ।

দু'জনে পুকুরের ঘাটে এসে দাঢ়ায় । পুকুরের শ্যাঙ্গলা স্বৰূজ জলে অনেকক্ষণ ধরে নিজের ছায়া দেখে নীতা । চারদিকে ঘন ঝোপঝাপ । তারই ছায়ায় ঠাণ্ডা শীতল জল । এই গরমেও গায়ে হিম ধরে । পুবদিকের একটা গাছে বসে কুটুম পাখি ডাকে ।

- বুড়ি বলে, আজকাল কেবলই কুটুম পাখি ডাকে ।
- কুটুম আসবে ।

- তেমন কুটুম আর কৈ ? আর আসবেই বা কে ? আছেই বা কে ? বুড়ি যেন নিজেকেই বলে । নীতা সরসরিয়ে পানির বুকে নেমে যায় । এক ভুবে চলে যায় পুকুরের মাঝখানে । বুড়ি ঘাটের কাছাকাছি থেকে ভুব দেয় । ও কখনো গভীর জলে যেতে পারে না । কেমন ভয় লাগে । শরীর শিরশিরিয়ে ওঠে । দুই তিন ভুব দিয়ে বুক পানিতে দাঢ়িয়ে থাকে বুড়ি । এক দুই তিন । কুটুম পাখি ডাকে একটানা । বুড়ির মনের কুটুম পাখির আনাগোনা । কুটুমের আগমনের উল্লাস নেই, কেমন একটা ধিতানো ভাব । এই কুটুমের জন্যে পিঠে পুলির উৎসব নেই । বরং জল চেলে চুলো নিবিয়ে ঝুকিয়ে থাকা । বুড়ি বিষ্ণু হয়ে যায় । জলের বুকে নিজের শরীর । মাথার ভেতর কুটুম পাখির আনাগোনা । চেতনায় সুপোরি বাগানের আলো-আধারি । বুড়ির মন ছটফট করে । দুপুরের সূর্য ঠিক মাথার ওপর । গরম রোদ পুকুরের গায়ে তেমন উত্তাপ দেয় না । ছায়া ছায়া বিস্তার । পাড় ঘুঁষে ভাঙ্কের ঠোটের মত কাল জল । ফিসফিসানি শব্দের মত পাতা বারে । হঙ্গুল পাতা জলে ভাসে । গাছের নিচে বিছিয়ে যায় । বুড়ি জল ছেড়ে ঘাটে উঠে যায় । ভেজা গামছা দিয়ে চুল বাঢ়ে । নীতা চিৎ-সাতারে পুকুরের জলে ভাসে । ওর মনে অধিল বাড়লের ছবি । অধিল বাড়লের গক্ষভরা উত্তাপ । কঠে অধিল বাড়লের

গান। বুড়ির মন এখন মুছে যাওয়া শোটের মত। ধার কমে গেছে। তেমন গভীর দাগের আঁচড় পড়ে না। বুড়ি ভাবে, নীতা সব পারে। এজনে জীবন ওর কাছে বোঝা নয়। জীবনের দায় ওকে কাঁধে বোঝা মুটের মত বাঁকা করে রাখে না। কিন্তু বুড়ি কাত হয়ে গেছে। ওর আর সোজা হয়ে দাঢ়াবার ক্ষমতা নেই। জীবনকে যত আকড়ে ধরেছে তত বাস্তিত হয়েছে। ও যদি পারত সব বক্সল পিছে ফেলে রেখে কেবলই এগিয়ে যেতে, যদি পারত পথে পথে গান গাইতে, মন চাইলে নির্ভাবনায় ঘুমিয়ে পড়তে, শ্রান্তিতে কারো বুকে আশ্রয় নিতে। ধূত বুড়ি কিছুই পারবে না। ওর তেমন শক্তি নেই। সবকিছু এক জায়গায় এসে আটকে থাকে। বুড়ি মানসিক দিক দিয়ে যতই এগিয়ে যাক না কেন পারিপার্শ্বিক সীমাবদ্ধতা আটেপৃষ্ঠে জড়িয়ে রাখে। বেরনোর কোন পথ নেই। তালগাছের উঁড়ি দিয়ে তৈরি করা ঘাটের ওপর দাঁড়িয়ে নীতার ভাসমান শরীরের দিকে তাকিয়ে থাকে। ও নিশ্চিত নির্ভাবনায় হাল ছেড়ে দিয়ে ভাসছে। উঠে আসার কোন লক্ষণ নেই।

বুড়ি ঘাটের ওপর দাঁড়িয়ে কাপড় ছাড়ে। তকনো কাপড় গায়ে জড়ায়। শরীরের এখানে সেখানে জলের ফেঁটা লেগে থাকে। নীতা পুরুরের মাঝখান থেকে চিৎকার করে।

- কিরে তোর হয়ে গেল?
- হ্যাঁ। উঠে আয় সই। থিমে পেয়েছে।
- বড় ঠাণ্ডা জল। আর একটু থাকি?

বুড়ি নিম্নপায়ের মত দাঁড়িয়ে থাকে। নীতার কথার পিঠে কোন কথা বলতে পারে না। নীতার ইচ্ছেশক্তি আছে। ও যখন যা খুশি তা করতে পারে। বুড়ির চারপাশে তো নিয়াম। তাই নীতার জন্মে ঘাটের ওপর দাঁড়িয়ে থাকা ছাড়া উপায় কি? খানিকক্ষণ বিরতির পর আবার কুটুম্ব পাখি ভাকে। বুড়ি অস্থির হয়ে ওঠে। হ্যাঁ করে আকাশ দেখে। এখন কত বেলা? বুড়ি সরে এসে নারাকেল গাছের উঁড়িতে টেস দিয়ে দাঁড়ায়। মনের বিষণ্ণতা কাটে না। ছায়া ছায়া ঝোপঝাড়, শ্যাগুলা জল, হাঁসের ঝাঁক, মাছরাঙা সবকিছু দৃশ্য ওর চোখের সামনে ওলোটপালোট থায়। মাথা পরিষ্কার হয়ে যায়। ওখানে আর কুটুম্ব পাখি আসে না। বুড়ি অনায়াসে পাখির ডাক কেড়ে ফেলে। নীতা ঘাটের দিকে এগিয়ে আসছে।

- উঃ অনেকদিন পর শরীরটা একদম জুড়িয়ে গেল। তোর এখানে এলেই মন আমার ঘরের দিকে ছোটে সই।

বুড়ি কথা বলে না। নীতা গামছা দিয়ে চুল আড়ে।  
- রাগ করছিস নাকি? খুব কিন্দে পেয়েছে? মনের মত কিছু হলে আমার আবার থিদেটিদে উবে যায়।

- হয়েছে চল।
- বুড়ি আগে আগে হাঁটে। পেছনে নীতা।

রমিজা ভাত বেড়ে উঠিয়ে রেখেছে। সব কাজ ও খুব পরিপাটির সঙ্গে করে। সলীম কলীম কেউ ফেরেনি। কখন ফিরবে ঠিক নেই। ওদের ভাত শিকায় উঠিয়ে রাখে। খেতে বসে খুশি হয়ে যায় নীতা।

- বাহু বটে তো খুব ভাল রাখে। আমরা হাটঘাটের মানুষ। যত্নের খাবার পেলে ধন্য হয়ে যাই।

- তুই ঘর বাঁধিস না কেন সই?

- ধূত ওসব সব না।

এক ঢেক জল থায় নীতা। ভর্তা দিয়ে ভাত মাখিয়ে একটু একটু করে থায়। বুড়ির আগে খাওয়া হয়ে যায়। হাত ধূয়ে উঠে পড়ে। নীতার দিকে তাকিয়ে ওর মনে হয় তড়িঘড়ি করে আয়েশটা শেষ করে দিতে চায় না ও। আয়েশ উপভোগ করতে চায়। বুড়ির সব কাজে হটোপুটি। বটপট শেষ করে ফেলে। হরিপুরের মত বুড়ি আগে আগে দৌড়ায়। আর নীতা কচ্ছপ। ধীরে ধীরে ছন্দতাল সব বজায় রাখে। তাই নীতার জীবনে ছন্দপতন হয় না। ও অনায়াসে তাল ঠিক রাখে। আর বুড়ির তাল কেটে যায়।

খাওয়া-দাওয়ার পর বুড়ি চিকন সুপোরি কাটতে বসে। বিকেলের দিকে পান চিবুতে চিবুতে চলে যায় নীতা। পিঠে কাপড়ের পুটিলি, হাতে দোতারা, কঞ্চি গান:

জননী জন্মান্ত্রিম

আমার সোনার বাংলাদেশ.....

নীতা বোধহয় পথ খুঁজে পেয়েছে। নীতার সেই অঙ্গুরতা নেই। মনের মানুষের অভাব ওকে বিষণ্ণ করে রাখে না। এখন একলাই পথ চলতে পারে। কারো অপেক্ষায় বসে থেকে পথচালা থামিয়ে রাখে না। ও নিজের ভেতর একটা আশ্রয় খুঁজে পেয়েছে। ওর আর অন্য কিছুর দরকার নেই। আসলে এমনি হয়। ভেতরের চাওয়া ফুরিয়ে গেলে বাইরের কোন কিছুর জন্যে আর ঝুঁটিতে হয় না। তখন নিজের ওপরে চমৎকার ভালবাসা পজায়। সমাহিত হয়ে যায় মন। বারান্দায় এক কোণে মানুর পেতে রমিজা ছেলে বুকে নিয়ে ঘুমিয়ে আছে। ওর ঘুমন্ত মুখের দিকে তাকালে মনে হয় না যে পৃথিবীর জন্যে কোন চিন্তা ওর মনে আছে। এ জন্যেই ও শান্তিতে ঘুমোতে পারে। যত জুলা বুড়ির। এমন একটা মন না থাকলেই বোধ হয় ভাল হত। কখনো অকারণ যত্নণায় বুক ফেটে কান্না আসে। পরক্ষণে বুড়ি নিজেকে শাসায়। বারাপ কিছু না ভাবাই ভাল। আসলে রমিজার ঘুমের অন্য কারণ আছে। সারাদিন ভীষণ খাটুনি করে বেচারী। সংসারের সব কাজ একলা সামলায়। খুব অসুবিধা না হলে বুড়িকে ধরতে দেয় না। বুড়ির মায়া হয় ওর জন্যে। দুপুরে ঘুমোতে পারে না বুড়ি। সলীম কলীমের ভাত আগলে বসে থাকতে হয়। এই একটা কাজ রমিজা ওকে দিয়েছে। রাতের বেলাও তাই। ওদের ফিরতে যত রাতই হোক বুড়ি ওদের ভাত নিয়ে বসে থাকে। আজও বারান্দার ওপর গালে হাত দিয়ে বসে আছে। বাড়িটা চুপচাপ। নিস্তুর। বুড়ি নিঃসঙ্গ। মাঝে মাঝে বুক মোচড় দিয়ে ওঠে। নীতার দোতারার টুট্টাং শব্দের মত।

দুপুরে কিংবা বিকেলে মাঝে মাঝে জলিল আসে। খুব দ্রুত বুড়িয়ে গেল ও। বুড়ির কাছ থেকে পান চেয়ে নিয়ে থায়। এখন আর কেউ নেই ওর। মা-ও মারা গেছে

অনেকদিন আগে। কোনদিন রাখে, কোনদিন রাখে না। কখনো রমিজার কাছে এসে বলে, হাঁড়িতে কিছু আছে নাকি রমিজা?

রমিজার হাঁড়িতে পাঞ্চ সব সময় থাকে। জলিলকে কখনো ফিরিয়ে দিতে হয়নি। বুড়ি কাছে বসে জলিলের খাওয়া দেখে। জলিল কখনো মুখ তুলে বলে, নেইটি পরা মানুষগুলোর পেটে ভাত না খাকলে কি হবে কলজায় সাহস আছে বুড়ি। সেই দিনকার ঢাকা শহর তো তুমি দেখিনি। অফিস-আদালত, কল-কারখানা, স্কুল-কলেজ সব বক্ষ। মিছিল আর মিছিল। এখনো আমার চোখের সামনে ভাসে। তারপর- তারপর রাতের অঙ্ককারে .....। নাহ মাথাটা কেমন করে। গুলি- আগুন।

- এসব কথা থাক। তুমি খাও জলিল ভাই।
- আমাদের হাতে কিছু ছিল না বুড়ি।
- ছিল না এখন জোগাড় কর।
- সেটাই তো করছি। প্রতিশোধ না নিয়ে ছাড়ব না।

জলিলের খাওয়া শেষ হয়। বুড়ি পান এগিয়ে দেয়। পান নিয়ে চলে যায় ও। বুড়ি ধীভিতে চিকন সুপোরি কাটে। কুটুস কুটুস শব্দে বুড়ির মনে হয় সোনার কাঠি, ঝপার কাঠি। জলিলের কথাগুলো ঝপকথার মত। বন্যা, খরা, আকাল ছাড়া আর কোন দানব তো বুড়ির চোখে পড়েনি। অথচ জলিলের কথায় সেই দানবের একটা ছবি ফুটে ওঠে। ওর সুপোরি কাটা থেমে যায়।

জৈষ্ঠের মাঝামাঝি। বুড়ির সিদুরিয়া গাছের আমে পাক ধরেছে। ওর মনে খুশি। নাতিটাও বেশ ভাঙ্গে হচ্ছে। কি যে আনন্দ ওকে নিয়ে। এখন ওকে বুকে করে এখানে ওখানে যায়। পরিবর্তনটা সহজেই টের পায়। কি যেন হয়েছে ওদের। এবার অন্যরকম। বুকের ছাতি মূলিয়ে ‘জয় বাংলা’ বলে চিকির করে না। সলীম কলীমের মুখ ওকনো। ঠিকমত খাওয়া-দাওয়া করে না। কথা বললে রেগে যায়।

আবার মনে ভাবনা এসে জড়ে হয় বুড়ির, হলদী গাঁৱ লোকের চোখে মুখে কেন সজ্জাস? কাচারীঘারের পাশে দাঁড়িয়ে একদিন সলীম আর জলিলের কথা শোনে।

- গাঁয়ে চোকার মুখের পুলটা যদি ভেঙে দেই জলিল চাচা তাহলে ওরা আর চুক্তে পারবে না?

- না রে ঠিক হবে না। ছোট একটু নদী। ওরা নৌকা জোগাড় করে পার হবে। কিন্তুতেই ওদের আটকে রাখা যাবে না।

- হ্যাঁ ঠিকই বলেছেন। ভেঙে দিলে বরং গাঁয়ের লোকের অস্বিধা হবে।

দু'জনে চুপ করে থাকে। বুড়ি সরে আসে। খালের ধারে দাঁড়িয়ে দেখে। স্টেশনে যাবার রাস্তার পাশেও দাঁড়ায়। লোকগুলো ফিসফিসিয়ে কি যেন বলাবলি করে। সবার চোখে আতঙ্ক। বুড়ি বুঝতে পারে না ব্যাপারটা। কি হল আবার? ওরা কি এত ভাবে? ঘুরেফিলে রমিজার কাছে এসে বসে।

- জানিস রমিজা ওদের যেন আবার কি হয়েছে?

রমিজা ডালের পাতিল নামিয়ে রেখে অবাক হয়ে তাকায়।

- কাদের?

- এই যে হলদী পীর লোকগুলোর ।

- ধূত আম্বাৰ যে কি বাতিক ! কেবল সারাদিন রোদে ঘোৱাখুৰি কৰলে মাথা গুৰু হবে না ।

ও বলুইয়ে রাখা মাছগুলো টেনে নিয়ে মাছ কাটিয় মনোযোগ দেয় । বুড়ি আৰ কথা শুনে পায় না । রমিজা অবলীলায় কচকচ করে আছ কাটে । রক্তেৰ ধাৰা গড়ায় বিটিৰ গায়ে, রমিজাৰ হাতে, আটিৰ ওপৰে । তাজা ফটফটে মাছগুলো সলীম পুকুৰ থেকে ধৰে দিয়ে গেছে । এক খ্যাপে অনেক উঠেছে । জালে বেঁধে মাছ উঠোনোও দেখেছে বুড়ি । আজ ভেতৱেৰ পুকুৰ থেকে মাছ ধৰেছে ও । সলীম কথনো এক খ্যাপেৰ বেশি দুই খ্যাপ দেয় না । নিজেৰ হাতে মাছ মাৰাটা সলীমেৰ বিশেষ শব্দ । পাৰতপক্ষে অন্য কাউকে দিয়ে মাছ ধৰাব না ও । বিশেষ কৰে বাড়িৰ পুকুৰেৰ মাছ । জাল ঘোড়ে দেৰাৰ সঙ্গে সঙ্গে মাছগুলো বুড়িই টুকুৱিতে উঠিয়েছে । এনে ভালা দিয়ে ঢেকে রেখেছে । কাটিতে বসেনি । রমিজা অন্য কাউকে কাটিতে দেয় না । এ নিয়ে বুড়ি মাকে মাকে ঠাণ্ডা কৰে ।

- আৰেক জন্মে তুই ঠিক বেছুনী ছিলি রমিজা । নইলে মাছেৰ সঙ্গে তোৱ এত ভাৰ কেন ?

রমিজা হাসে । সেই চিৰাচৰিত বৃক্ষৰূপ হাসি । ওৱ মাছ কাটা শেষ হলে ঝাঙ্কাৰ দিয়ে গুঠে ।

- আপনি যে সারাদিন কি এত ভাবেন আম্বা ?

- বুড়ি ওৱ কথায় উন্তুৰ না দিয়ে বলে, কুটুম্ব পাৰি ভাকে রমিজা ।

- ভাকুক । কে আৰ আসবে । আমাৰ বাপ তো গত মাসেই এসে গেল । এই মাসে আৰ আসবে না ।

রমিজা মাছ ধূতে পুকুৰঘাটে চলে যায় । কথনো বুড়িৰ এ ধৰনেৰ উন্তুত ভাৰনা চিন্তায় ও বেগে যায় । শাকভী বলে বেশি কিছু বলতে পাৰে না । রমিজাৰ পিছু পিছু বুড়িও পুকুৰঘাটে এসে বসে । জ্যাগাটা সীমণ ছায়াচ্ছন্ন । জলেৰ বুকে শ্যাওলা ভাসে । বেতবনে ভাঙ্ক ভাঙ্কে । বিৱাটি একটা বৰাই গাছ পুকুৰেৰ ওপৰ ঝুঁকে পড়ে আছে । পচা পাতাৰ গৰ্জ আসছে, গৰ্জ আসছে কাদামাটিৰ । রমিজা ঘাটেৰ জল ঘোলা কৰে মাছ ধূয়ে চলে যায় । মাছেৰ আঁশটো গৰ্জ বুড়িৰ কেমান বিদম্বুটো লাগে । নারকেলেৰ চিকল পাতাৰ ফাঁক দিয়ে এক টুকুৱো রোদ এসে পড়েছে পানিৰ ওপৰ । সব কিছু একাকাৰ হয়ে মুছে পিছে বাটিৰ গায়ে রক্তেৰ শ্বেতধাৰা বুড়িৰ চোখেৰ সামনে ভেসে গুঠে । তাজা ফটফটে মাছগুলোৰ লাফানি বৰ্ষ হয়ে যায় এক পোতে । বুড়িৰ মনে হয় কুটুম্ব আসবে । অৰ্থাৎ এই যে এ কুটুম্ব সে কুটুম্ব নয় । বন্যা, মহামারী, ধৰা যেমন ও বষ্ট ইন্দ্ৰিয় দিয়ে টেৰ পায় এ কুটুম্বেৰ আগমন ভেমলি । মাঠ ঘাটি প্ৰান্তৰ তোলপাড় কৰে দিয়ে ওৱ আঙিনায় কুটুম্ব আসছে ।

বাতে ঘূম আসে না বুড়িৰ । সক্ষাৰাত থেকে সলীম কলীম জন্মনা-কলুনা কৰছে । তোৱৰাতে সলীম সীমাত পাৱ হওয়াৰ জন্মে চলে যাবে । কলীম ধাকবে ওদেৱ দেখাশোলাৰ জন্মে । রমিজা কানুকাটি কৰে এখন শান্ত হয়ে উয়ে আছে । বুড়ি ওদেৱ ৭৩ হাতৰ নদী ঘোনেড়

কথা কিছুই বুঝতে পারে না। বিকেলে জলিল অলছিল গ্রামে থাকা নাকি নিরাপদ নয়। তাড়াহুড়োয় বেশি কথা বলতে পারেনি। সলীমের সঙ্গে জলিলও যাচ্ছে। জলিলের সঙ্গে দু'দণ্ড কথা বলার ইচ্ছে ছিল। কিন্তু হয়নি। ওরা ভীষণ ব্যাস্ত। কথা বলারও সময় নেই। গীরে কি হলো আবার? বুড়ির জীবনে এমন ঘটনা ঘটেনি। গ্রাম থেকে কাউকে পালিয়ে যেতে হয়নি। যত কিছুই ঘটুক সকলে গ্রামে থেকেছে। সুখে-দুঃখে বিপদে-আপদে বুকে বুক ছিলিয়ে। কিন্তু এখন কি হল? কারা ওদের ভাড়িয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে? হলদী গী কি সবল করে নিল কেউ? এর আগে হলদী গী কোনদিন এমন করে নিয়েকে জানান দেয়নি। বুড়ির ছেলেবেলায় মাঝে মাঝে শহুর থেকে লোক আসত বসন্তের টিকা দেবার জন্যে তখন বুড়ি দেখতো বাড়ির মেরেরা তামে যে যেদিকে পারত বুকিয়ে যেত। কিন্তু তখন তো গোটা গোঁফের লোকের চোখেমুখে এমন ভয়-ভীতি দেখেনি। বরং লুকোনোর জন্যে বাবার কাছে পালি উন্ত ওর আ, চাচি, বোনেরা। এখন কি হল? বুড়ির কিছুই ভাল লাগে না। বিজ্ঞান থেকে উঠে দাওয়ায় এসে বসে। ওপাশ থেকে সলীম ডাক দেয়।

- কি হয়েছে মা?
- কিছু না গো।
- বাইরে গিয়ে বসলে কেন?
- বুকটা কেমন ধূঢ়ফূঢ় করে।

সলীম উঠে এসে ওর পাশে বসে। কলীম আসে। রমিজাও। বুড়ি টের পায় আসলে ওরা কেউই ঘুমোয়নি। সবাই চুপচাপ তরেছিল কেবল। অক্ষকারের দিকে তাকিয়ে ওরা আকাশ পাতাল ভাবছে। হঠাতে বুড়ি শব্দ করে কেনে ওঠে। নিজের আবেগ ধরে রাখতে পারে না। এ কলিলের উমেট পরিবেশে ভেতরে ভেতরে একটা কুকু অভিমান জয়ে উঠেছিল। আজকের কান্না তার বহিপ্রকাশ।

- আঃ মা চুপ কর। কেউ শব্দতে পাবে।
- কুই যাৰি কেন বাবা?
- বৰুৱা পেয়েছি গ্রামে মিলিটাৰি আসবে।
- মিলিটাৰি? বুড়ির চোখ বিক্ষৰিত হয়।

বুঝতেই পারছ আমাকে পেলে ওরা জ্যান্ত রাখবে না। বসে বসে মরার চাইতে ওদের সঙ্গে একবার লড়েই দেখি। শোন মা, আমি যে যাচ্ছি একথা কাউকে বলবে না। জানাজানি হলে তোমাদের ওপর বিপদ আসবে। কেউ জিজ্ঞাসা করলে সোজা বলে দেবে জানি না।

বুড়ি মাথা নাড়ে। কলীম চুপ করে বসে আছে। ও এমনিতেই কম কথা বলে। অক্ষকারে ওদের শ্বাস-প্রশ্বাস ওঠানামা করে। সলীম একটা বিড়ি ধরায়। রমিজার ছেলে কেনে উঠলে ও চলে যায়। অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ ওদের তিনজনের সামনে হাতের মুখের মত হঁ করে আছে। কারো মনে কেৱল স্পষ্ট ধারণা নেই। সামগ্ৰিক অবস্থাকে নির্দিষ্ট কাঠামোৰ মধ্যে কেউ ধৰতে পারছে না। সলীম লড়তে যাচ্ছে। ফলাফল জানা নেই। ও ফিয়ে আসতে পারবে কি না জানে না। যারা এখানে থাকবে তারাও একটা অনিশ্চিত হাতুর নদী প্রবেশ

অবস্থা মোকাবেলা করার জন্যে প্রস্তুতি নিছে। এর বাইরে গুরা আর কেউ কিছু জানে না। গুরা শুব সাধারণ। ওদের কোন গভীর রাজনৈতিক প্রজ্ঞা নেই— চেতনা নেই। গুরা কেবল বোঝে দেশের সীমানা এবং ঘাটি। এটুকু সবল করেই গুরা এগোয়। বিপদে বুক পেতে দেয়। প্রয়োজনে ঝীপিয়ে পড়ে। প্রাপের এই গভীর টানটুকু আছে বলেই গুরা অনন্যনীয় এবং দুর্বার হয়ে গুঠে।

সলীম শেষ টান দিয়ে বিড়িটা উঠানে ছুড়ে ফেলে। গুরা তিনজন অনেকল ধরেই চুপচাপ। কারো ঘূর্বেই কথা নেই। কলীম হাই তোলে। সলীম উঠে দাঢ়ায়।

— যাও মা ঘুমোও। আবার ভোররাতে উঠতে হবে।

বুড়ি আঁচলে চোখ মোছে। সলীম বুড়ির কাছে এসে বসে।

— ও-মা-মাপো। তুমি এমন করলে কে আর আমাকে শক্তি যোগাবে বল? তুমি হন আরাপ করলে কে আর আমাকে সাহস দেবে? তোর ভোর রওনা করতে না পারলে দিনের বেলা আবার সব জানাজানি হয়ে যাবে। যাও মা, ঘুমোও।

সলীম বুড়িকে হ্যাত ধরে টেনে উঠায়। গুর কথায় বুড়ি কোন সাহসনা পায় না। উঠতেও ইচ্ছে করে না।

— তোরা যা বাবা। আমি একটু পরে আসি।

সলীম কলীম চলে যায়। আশেপাশের বৌপুরাপে খস খস শব্দ হয়। বুড়ির বুক ভয়শূন্না হয়ে থাকে। তখন সলীমের পালিয়ে যাওয়া ওকে কেমন অভিহ্বত করে রাখে। ও কিছুতেই মেনে নিতে পারে না। ঝিঁঝির শব্দে বুড়ির কানে তালা লাগে। বীশবনের ঘাঘার ওপর দিয়ে অনেক দূরের আকাশটা ধূসর, ত্রিয়মাণ। ফেলে আসা দিনের মত হনে হয় বুড়ির কাছে।

একসময় ও বিছানায় ফেরে। রইস হ্যাত পা ছড়িয়ে শয়ে আছে। ও কিছুই জানে না। রইসের পাশে গুটিগুটি শয়ে পড়ে বুড়ি। সুম আসে না। পাশের ঘরে রমিজা কাঁদছে। বিয়ের পর থেকে দু'জনে কোনদিন একলা হয়নি। সলীম ওকে সঙ্গে করে বাপের বাড়ি নিয়ে গেছে আবার নিজেই সঙ্গে করে নিয়ে এসেছে। রমিজা এখন একলা হয়ে যাচ্ছে। সলীম শুব নরম ঘরে কথা বলছে। বুড়ির ভাবতে তাল লাগে যে ছেলেটা একদম পাল্টে গেছে। ছেলে হ্বার পর থেকে আর সলীম ওর পায়ে হ্যাত তোলেনি। রমিজার জন্যে সলীমের এখন অনেক ভালবাসা। সলীম এখন রমিজাকে বুকে নিয়ে আসর করছে। তাড়াতাড়ি ফিরে আসবে বলে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে। রমিজার কান্দার রেশ কয়ে আসছে। রইস ঘূমের ঘোরে বিড়বিড় করে। বুড়ি বিছানার ওপর উঠে বসে থাকে। কিছুতেই সুম আসে না।

ভোররাতে সলীম গুঠে। এক সামকি পাঞ্চা খেয়ে দেয়। ছেলেকে আসর করে। বুড়ির পায়ে হ্যাত দিয়ে সালাম করে। চুপচুপি জলিল আসে, একটুও শব্দ না করে। বুড়ির কাছ থেকে বিদায় নেয়। ওর ভিটোর দিকে খেয়াল রাখতে বলে। সকাল সকান্ধ ঘরদোর অঙ্গিনা যেন আড় দেয়া হয় সেকথা বলে। মাচায় অনেক ঝিঙে ধরেছে। তুলে এনে রাখতে বলে। শেষে জলিল চোখের জল আর রাখতে পারে না। বুড়ির চোখও জলজলিয়ে গুঠে। সলীম ধমক দেয়।

- आय चाचा कि हजेह। चोखे पानि धाकले युन्त हय ना चाचा। ताड़ाताड़ि याइ चलेन।

जलिल आर एकटो कथाओ बले ना। सलीमेर सज्जे राष्ट्रा करें। एकबाराओ पेछन फिरे चाय ना। केशे निये रुक्क कंठ परिक्कार करें ना।

बुड़ि वाशबन पर्यन्त आसे। मने हय ए घटना ओर जीवने एकदम नहून। काउंके एहम करें कोलमिन चले येते देखेनि ओ। चुपे चुपे काँदे। जोरे काँदते पारे ना। निर्मम चोखेर पाता जलेर अपर्श बातर। से जल धरे राखते चाय बुड़ि, युचे फेलते हिजेह हय ना।

सलीम चले याबार दुनिन परे सेटेशने याबार बढ़ रास्ता दिये भिलिटारि आसे हलदी पाये। जैयेटेर प्राचो गरमे आटि पुड़े याय। बातास दम धरा। गाहेर पाता नड़े ना। बुड़िर सिदुरिया आम पेके लाल। ओरा फाँका आण्डाज करते करते चोके। नदीर धारे क्याम्प करें। बुड़ि सेटेशने याबार रास्तार दाँड़िये देखेहे। किन्तुइ प्रकाश करते पारे ना। ओर मने कूटीम पाखिर आनागोना। फिरे एसे घरेर नाओयाय धप करें बसे पड़े। रमिजा कुकनो युखेर दिके ताकिये बुड़ि बले, कूटीम एसेहे रमिजा।

रमिजा कथा बलते पारे ना। छेलेके बुकेर सज्जे चेपे धरे। माछ-कोटि बटि उठोने कात हये पड़े थाके। चुलोर आण्टन ज्ञले ना। दूइ-युखो चुलोटा शीतल छाइ बुके निये शान्त। रमिजा फ्यासफ्यासे कष्टे बले, आमादेर कि हवे आम्हा?

- या हय हवे।

बुड़ि शक्त युखे सज्जे गाहेर याथार ओपर दिये ताकिये थाके।

- आमार भय करें।

- अत भय करते नेहि रमिजा। मे छेलेटोके आमार काछे मे।

बुड़ि नाति बुके निये सुपोरि बागाने आसे। ओरान थेके क्याम्पटा परिक्कार देखा याय। ओरा कि करे देखते चाय बुड़ि। एहम अंतिथि बुड़ि आर कोलमिन देखेनि।

वाते कलीमेर युखेर दिके चेये बुड़िर बुक मुचडे ओठे।

- तुइओ पालिये या कलीम?

- केळ मा?

- सलीम गेहे तोर धाका ठिक ना।

- बढ़ भाइ ये चले गेहे एই थबर मनसुर मेघार ओदेर जानिये दियेहे।

- तोके के बलल?

- मनसुर मेघार। ओदेर सज्जे मनसुर मेघार बुब जमियोहे। गायेर थबराथबर दिजेह।

- तुइ कोथाओ चले या बाबा?

- तोमादेर कि हवे?

- আবারা ঠিকই থাকতে পারব ।
- তা হয় না মা । জ্যোদের রেখে বাড়ি খালি করে আমি যেতে পারি না ।

বুড়ি আর কথা বলে না ।

- জান মা মনসুর মেধার বললো খুব লাঙালাভি করছিলে বাবারা এবার অজা টের পাবে । ভিটের দৃশ্য ঢরিয়ে ছাঢ়বে । আমি অবশ্য একটুও তব পাইলি । মনসুর মেধারের মুখের গুপ্ত কভূত জ্বাল দিয়ে দিয়েছি । ইচ্ছে হাতিল পাছার দুটো লাখি মেরে দেই । ব্যাটি আন্ত শহীতান । উৎকেহন করে যে হাসছিল । ডাবলে এখনো গা জ্বলে উঠে ।

বুড়ি আর রহিজা কলীমের কথা কষে কাট হয়ে যায় । কলীমের খাওয়া শেষ হলে বুড়ি আবার ওকে পালানোর কথা বলে । কলীমের চোখ লাল হয়ে ওঠে । কলক্ষতাবে বলে, নিজের ভিটে ছেঁড়ে কোথাও যাব না । ওদের ভয়ে পালাবো নাকি? কি করবে দেখিই না?

কলীম উঠোনে নেমে পেলে বুড়ির গলা দিয়ে ভাত নামে না । দু'তিনবার খেয়ে দুই চোক পানি পিলে উঠে পড়ে । বুকের ভেতর ভাতের দলা আটকে যায় ।

তরাশি কুকুরের মত সারা গায়ে সলীমকে বোঝে গুরা । মনসুর মেধারের পালিয়ে যাওয়ার অভেটা বিশ্বাস হয়নি । সলীমকে না পেয়ে কলীমকে ধরেছে । তখন ভোরের আজান দিয়েছে । কলীম বিছানায় কুকড়ি মেরে ভয়ে আছে । বুড়ি কেবল দরজা খুলে বেরিয়েছে, তখনই গুরা সাতজন সজনে পাছের নিচে এসে দাঢ়ায় । বুড়ি কিছু ভেবে কুলিয়ে ওঠার আগেই ঘরে ঢোকে । রহিজা পুকুরখাটে ছিল ওখাল দেকেই সুপোরি বাগানে পালিয়ে যায় । বুড়ি বাঁশের বৃটি ধরে বারান্দার গুপ্ত দৌড়িয়ে থাকে । কলীমকে ধরে আনে গুরা । ওদের হাতে কলীমকে দেখে তৈজোর হাতে রাজপুত্রের মত মনে হয় বুড়ির । কলীমের চোখে তখনো খুব ভাস্তা আবেজ । কলীমকে নিয়ে গুরা উঠোন পেরিয়ে চলে যায় । বুড়ি কিছু বলতে পারে না । ছুটে জলপাই গাছটার নিচে এসে দাঢ়ায় । কলীম একবারও পেছন ফিরে তাকাবার সুযোগ পায় না । গুরা সাতজন সৈনিক রাস্তা কাঞ্চিয়ে হেঁটে যাচ্ছে । ওদের কলরে আঠের চতুর্থ নিশ্চূল হয়ে যায় ।

সারা বাড়িতে বুড়ি একলা । গুড়ার অন্যান্য মেয়েদের সঙ্গে ছেলে বুকে নিয়ে পালিয়োছে রহিজা । ওর বাইশ বছরের ঘোৰনে ঝড়ের আশঙ্কা । কলীমকে ধরে নিয়ে যাওয়ার রহিজা হক্কিয়ে গেছে । কোন কিছুই ভেবে উঠতে পারে না । পাট কেজ না কচুরীপানা সৰ্পি জোবায় পিয়ে চুকেছে ও তা জানে না । জানার ইচ্ছেও নেই । রহিজা আপাতত নিরাপদে থাকুক এটাই কামনা । রহিজার ছেলের কথাও আর তেহন করে ভাবতে পারছে না । ঘরের অধ্যো রইস বসে আছে । রইস ধাকা না ধাকা সয়ান । যার কোন বোধই নেই সে আর কি কাজে জাগবে । নিরাসক মুখে বারান্দায় বসে বীশবছরের যাথার গুপ্ত তাকিয়ে থাকে বুড়ি । পাতার ফাঁকে ছোট একটু আকাশ দেখা যায় । কলক্ষকে নীল আকাশ । কোথাও কোন ঘেঁষ নেই । শ্রবণ রোক্ষুর । রহিজা আজ ভাত ফোটায়নি । রহিজার চুলোয় আন্তন নেই । ওর ইচ্ছে করছে আন্তন জ্বালাতে । বীশপাতা আমপাতা বুকে নিয়ে চুলোটা যদি এখন দাটিদাটি করে জ্বলে উঠে তবে বেশ হয় । গুরা দেখুক সবাই পালায় না । কেউ কেউ আন্তন জ্বালায় । কিন্তু উঠতে পারে না । বুড়ির বুক

ତୋଳପାଡ଼ କରେ । ଗନ୍ଧରେ ମୃଦୁର ସମୟ ଅନୁଭବ ଯେମନ ସହକେ ଗିଯୋଛିଲ ଆଜ ଠିକ ତେବେନ ଲାଗଛେ । କିନ୍ତୁ ବୁଢ଼ିର ମୁଖେ ତାର କୋନ ପ୍ରକାଶ ଛିଲ ନା । ପ୍ରାଦ୍ୟମ୍ଭେ ସମସ୍ତ ଜାଗତିକ ଚିତ୍ରାଙ୍କଳେ ବାତାସେ ଓଡ଼ା ଡୁଲୋର ଘର୍ତ୍ତ ଉଡ଼ିଯେ ନିତେ ଚାଇଛେ । ପାଯେର କାହାଁ ବସେ ଥାକା ବାଧା କୁକୁରଟୀ ଲେଜ ନାଡ଼ିଯେ ଗରଗର କରାଛେ । ବୁଢ଼ି ତାଓ ଦେଖାଇଁ ନା । ସମସ୍ତ ବାଢ଼ି ଏକ ଅସୀମ ଶୂନ୍ୟତାର ବୀ ବୀ କରାଛେ । ପୁର ଦିକେର ଆମଡ଼ା ପାଛଟୀ ଭୀରୁଷ ଚାପ । ହୀସ ଦୁଟୀ ପାଲକେ ମୁଖ ଫୁଲେ ବସେ ଆଇଁ । ଅଧିଚ ସବକିଛୁ ଜାପିଯେ ବୁଢ଼ିର ଚୋଖେର ସାଥମେ ଭେସେ ଓଠେ କଲୀମେର ଚଲେ ଯାଏସାର ଦୃଶ୍ୟ ।

ରମିଜା ଅନୁବରତ କାମେ କଲୀମେର ଜମ୍ବୁ । ବୁଢ଼ି ତାଓ ପାରେ ନା । ବୁଢ଼ିର ଚୋଖେ କୋନ ଜଳ ନେଇ । ଲୋଟା ଏଥିଲ ବୀ-ବୀ ମର୍ମମ୍ରମ୍ମ । ଦୁଦିନ ପାର ହେଯେ ଗେଛେ । ରମିଜାନ ଆଲୀର କାହା ଥେକେ ବସିର ପେଣେଛେ କଲୀମକେ ଶୁର ମାରଧୋର କରାଛେ । କଲୀମେର ବସିର ଜାନତେ ଚାଇଛେ । କଲୀମ କିଛିଇ ବଲେ ନା । କେବଳ ସନ୍ତୁଷ୍ଟାୟ କୌକାଯ । ବୁଢ଼ି ନିଜେର ହାତ କାମଡ଼ାଯ । ଠିକଇ ବଲତୋ ଗୋରା, ବୁଢ଼ି ଆସିଲେ କିଛିଇ କରାତେ ପାରେ ନା । କିଛିଇ କରାର କମତା ନେଇ । ପେଣେଛେ ଖାଓରୀ-ଦୀଓସା ଛେଡେ ନିତେ । ପାରେ ବାରାଦ୍ୟ ନଈଲେ ପୁରୁଷବାଟେ ଚାପଚାପ ବସେ ଥାକିଲେ । ପାରେ ଅନେକ ଦୂରେ ଆକାଶେର ନିକେ ତାକିଯେ ଚୋଖେର ଜଳେ ବୁକ ଭାବାତେ ।

- ଆୟା କଲୀମ ଭାଇଙ୍ଗେର କି ହେବେ?

ବୁଢ଼ି ରମିଜାର ମୁଖେର ଦିକେ ତାକିଯେ ଥାକେ । ଉତ୍ତର ଜାନେ ଓ । କିନ୍ତୁ ବଲତେ ପାରେ ନା । ଜାନେ କଲୀମେର ମୃଦୁ ଘନିଯେ ଆସାଇଁ । ଯେମନ ଗୀଯେର ଆରୋ କହେକଜନ ଗେହେ ତେବେନ । ଓଦେର ଲାଶ ପୁତେ ଫେଲେଛେ, ନୟ ଖାଲେ ଭାସିଯେ ଦିଯେଛେ । କଲୀମକେଓ କି ଭାଇ କରବେ?

- ଆୟା ଆପଣି କଥା ବଲେନ ନା କେନ?

ବୁଢ଼ିର ଠୋଟ କାପେ । କଥା ବେରୋଯ ନା । ରମିଜା ଫୁଲିଯେ ଓଠେ । ଫୁଲି ଏସେ ବସିର ଦେଇ ।

ରମିଜା'ବୁ ତାଡ଼ାତାଢ଼ି ପାଲାଓ ମିଲିଟାରି ଆସାଇଁ ।

ରମିଜା ପାଲିଯେ ଯାଇ । କୋଥାଓ ଆର କେଉଁ ନେଇ । ତୁମ୍ଭ ବାଧା ଲବା ହେଯେ ଭୟେ ଆଇଁ । ତୁମ୍ଭିଲି ପୁରୋ ବାଡ଼ିଟିର ଭୌତିକ ନିଷ୍ଠକତା କାମିଯେ ବୁଟେର ଶମ୍ଭେ ପୀ ଭାସିଯେ ଗୋ ସାତଜନ ଥାକି ପୋଶାକ ପରା ଲୋକ ବୁଢ଼ିର ସାଥମେ ଏସେ ଦୀଢ଼ାଯ । କଲୀମକେ ବୈଧେ ଏନେହେ । ତର ହାତ ଦୁଟୀ ପିଛମୋଡ଼ା କରେ ବୀଧା । ତର ଲିକେ ତାକିଯେ ଚୋଥ ଫିରିଯେ ନେଯ ବୁଢ଼ି । ଓ ଏକଦମ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ହେଯେ ଗେହେ । ତର ଦିକେ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ତାକିଯେ ଥାକା ଯାଇ ନା । ଅମାନ୍ୟିକ ଅଭ୍ୟାଚାରେ ତର ଏଥିଲ ଭିନ୍ନ ଆଦଳ । ହହାମାରୀ କବଲିତ ହଲନୀ ପୀ ହେଯେ କଲୀମ ଏଥିଲ ବୁଢ଼ିର ଚେତନାର ସାରପାତେ ଦୀଢ଼ିଯେ । ତାର ଜାନ୍ଯୋ କୋନ ଶୋକ ନେଇ, ମୁଖ ନେଇ, ବେଦନା ନେଇ । ତାକେ ସାଞ୍ଚି କରେ ଜନ୍ମ ହୁଏ ଆନନ୍ଦର । ସେ ବଳେ ନିତେ ପାରେ ପ୍ରତିଶୋଧେର ଅବଦିନିତ ଶ୍ଵରା ।

କଲୀମ ତୋର ଘାଡ଼ଟୀ ଫୁଲେ ପଡ଼େହେ କେନ? ତୁଇ ଏକବାର ଆମାର ନିକେ ଚୋଥ କୂଳେ ତାକା । ସାହସୀ ବାରଦଙ୍ଗଳା ଦୃଢ଼ି ଛାଡ଼ିଯେ ଦେ ହଲନୀ ଗୀଯେର ବୁକେ । ମୁହଁ ଯାକ ହହାମାରୀ, ବନ୍ୟା, ଧରା, ଦୂର୍ଭିକ୍ଷ । ହଲନୀ ଗୀଯେର ଯାତି ନକୁଳ ପଲିଯାଟିତେ ଭରେ ଉଠୁକ?

বুঢ়ি প্রাপ্তির শক্তিতে নিজেকে শক্ত রাবে, যেমনি ছিল তেমনি বসে থাকে। ও হেন ঠিক এমনি কান্তগুলো সময়ের অপেক্ষায় ছিল। জানত বন্দী রাজপুরোর মত কলীম আসবে। এই বাড়িটা জনমানবশূন্যপূরী হয়ে থাবে। কদাকার দানবের দল ছিন্নভিন্ন করে দেবে সাজানো সংসার। গুদের হিস্ট্রি মুখের দিকে একবার তাকিয়ে দৃষ্টি অনাদিকে শুণিয়ে নেয় বুঢ়ি। একজন উঠোনে কলীমের পাশে দাঁড়িয়ে থাকে। বাকি জয়জন বুঢ়ির পাশ কাটিয়ে থেরে চুকে যায়। ঘরের জিনিসপত্র তছনছ করে। দুর্বল আক্রমণে ঝুঁক হয়েছে গুরা। রইসের পিঠে এক ঘা লাগায়। হারা-বোৰা ছেলেটার কাছে কোন উত্তর না পেয়ে এক ধাক্কায় ওকে বারান্দায় ফেলে দেয়। রইস কাঁচতেও ছালে যায়। সুব দিয়ে গোঞ্জনির মত শব্দ বের হয়। ও ভট্টিসুটি বুঢ়ির পাশে এসে বসে। পিঠে মুখ থামে। সামুন্দ্রিক চায়। পায়ে যে তোটি লেগেছে তা ইশারা করে দেখায়। রইসের হাতটা নিজের মুঠিতে শক্ত করে চেপে থেরে বুঢ়ি। এককণ ও নিজের ভেতর একটা অবলম্বন বুঝে পায়।

গুরা ঘরের ভেতর তুলকালাম কাও বাধিয়েছে। এ বাড়ির প্রতিটি জিনিসের প্রতি গুদের আক্রমণ। সব কিছু তছনছ করে যাবা পায়। কাঁধা বালিশ ছিঁড়ে টুকরো করে। কাপড় চেৱার ফলফল শব্দ কানে এসে লাগে। গুর মনে হয় এসব জিনিসের গুপ্ত এখন আর কোন মায়া নেই। গুঙ্গলো ছিঁড়ে পুড়িয়ে ফেললে একটুও খারাপ লাগবে না। বুঢ়ি একদৃষ্টি কলীমের দিকে তাকাতে পারে না। গুর সারা শরীরে কালশিটে দাগ। চোখের গুপ্তরাতা ফুলে গেছে বলে ভাল করে তাকাতে পারছে না। তবুও পাখু বিৰু দৃষ্টিতে বুঢ়িকেই দেখছে। গুর ঠোট নড়ছে। ও হয়ত কিছু বলতে চাচ্ছে। বুঢ়ি ভেবে কুলিয়ে উঠতে পারে না যে ঠিক এ মুহূর্তে কলীম কি বলতে পারে? গুর মনে এখন কিসের দাপাদাপি? বুঢ়ির মনে হয় কলীমের জন্মের হয় মাস পর গুর মা মারা গিয়েছিল। সে মায়ের কথা কলীমের মনে নেই।

বুঢ়ি কে? বুঢ়ি ক্ষু ওকে যমতা দিয়েছে। কিছু ভালবাসা। দুটো খিটি কথা শনিয়েছে। এর বেশি কিছু বুঢ়ি গুর জন্মে করেনি। ঐটুকু সম্ভল করেই এখন গুর কাছে পিয়ে দাঁড়াতে চায়। বলতে চায় কলীম কি বলবে। গুর কাছে যাবার জন্মে সিডি দিয়ে নামে। দু'পা এগোতেই রাইফেলধারী তেড়ে আসে। যেখানে বসেছিল সেখানে বসে থাকতে হ্যাত দিয়ে নির্দেশ করে। গুর সেই ঝুঁক ভয়াবহ মুখের দিকে ঢেয়ে বুঢ়ির চোখের সামনে হলদী পী দুলে ওঠে। সমস্ত কিছু অক্ষকার হয়ে যায়। ফিরে আসে। অথচ গুর এখন জীবন ইচ্ছে করছে কলীমকে একবার হৃয়ে দেখতে। গুর রক্তে কিসের যাত্তামাতি একবার কান পেতে বলতে চায়। মৃত্যুর ছায়া ভাসে সুবক কলীমের সমস্ত অবস্থাবে। বুঢ়ি আর তাকাতে পারে না। দৃষ্টি ঘুরিয়ে নেয়। সৈনিকের হেলমেটের গুপ্ত দিয়ে দিগতে সে দৃষ্টি আছড়ে পড়ে। রইস জীবন অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে। বালবন্দের মাথায় মৃদু বাতাস। বুঢ়ির অবয়বজীবন কঠিন অন শিফুল বীজের মত ফেটে যেতে চাহিছে।

যদদৃতের মত বুঢ়ির সামনে এসে দাঁড়িয়েছে গুরা জয়জন। ঘরের ভেতর কিছু না পেয়ে ক্ষিণ। এককণ অকারণ শক্তি ক্ষম করেছে। গলা ফাটিয়ে চিকোর করছে গুদের

একজন। জানতে চাইছে সলীম গোলাবারদ রেখেছে কোথায়? হলীমী গায়ের আন্দোলনের নেতৃত্ব করে অস্ত্রশস্ত্র নেই এ কি করে সম্ভব? বুড়ি ওদের কথা কিছুই বুঝতে পারছে না। ওরা যে ভাস্য কথা বলছে বুড়ির এত বছরের জীবনে তা কেন দিল শোনেনি। কেবল সলীমের মামতা ধরতে পারছে। ওরা বুড়িকে আকারে ইঙ্গিতেও বোঝাতে চেষ্টা করছে। বারবার। অনেকবার। উভয় দেয় না। ওর গলার মধ্যে বাধা কুকুরটোর ইত গবণের শব্দ ছচে। তখনি বুড়ির মনে হয় এরা কারা? এরা কি হলীমী গায়ের জলহাওয়া, পলিমাটি, নদীর কূলে বেঢ়ে ওঠা লোক? গায়ের নেটিপরা মানুষগুলো বুড়ির চোখের সাথনে ভেসে গঠে। ওদের কথা ও বোঝে। শহর থেকে দুঁচারজন এলে কষ্ট হলেও ওদের কথা বোঝে। কিন্তু এরা কেন বুড়ির শুব কাছের মানুষ নয়? তখনি ও চিন্তার করে গঠে, এই কলীম এই কয়েরগুলি কি বলে?

ওরা কলীমকে ধারা দিয়ে বুড়ির পায়ের কাছে ফেলে দেয়। উপুক হয়ে পড়ে ধারা কলীমের দেহটা ওরা একজন পা দিয়ে চেপে রাখে। কলীম বুঝি বাকালো বেত। ছেড়ে দিলে ছিটকে উঠবে। আসলে কলীম কিছুই করতে পারছে না। কলীমের হ্যাত বাধা। অত্যাচারে ক্ষতবিক্ষত। তবুও হ্যাত বাধা না থাকলে ও হ্যাত একটা কিছু করত। অস্তু করতে চেষ্টা করত। সেটাও বুড়ির জন্য সাক্ষনার কারণ হত। কলীমের অসহায়ক বুড়িকে ঘরয়ে যায়ে। ওরা কলীমের পিটে বুটের লাখি বসিয়ে বলছে, কোন ধরণ না দিলে ওরা কলীমকে ঘেরে ফেলবে। ওদের ক্রুক্র আজ্ঞাশে এখন বাকুদের স্তুপিস। যে কোন হৃদ্দৃষ্টি দপ করে জুলে উঠবে।

বুড়ি বিভুবিভু করে, তোর মা ধাক্কাল কি করত আমি জানি না কলীম। কিন্তু আমি কিছু করতে পারি না! বড় পাণ্ডার জন্য কাউকে কাউকে বুঝি এমনি করে ঘরতে হয় কলীম। তুই আর আমাকে যা জাকিস না। আমি তোর মা হওয়ার উপযুক্ত না।

বুড়ি হ্যাত দিয়ে চোখ ঘোছে। সলীমের মুখটা মনে হয়। পাশাপাশি দু'জনের। কে আগে সলীম না কলীম? বুড়ি সলীমকে কথা দিয়েছে ওর কথা কাউকে বলবে না। কিন্তু নিজেও তো জানে না সলীম কোথায়? কলীম এখন হাতে যাচ্ছে। একদম বুড়ির চোখের সাথনে। বুড়ি কি করবে? বুড়ির জীবনের বিনিয়োগে কি ওরা কলীমকে ছেড়ে দেবে? হঠাৎ বুড়ি চিন্তার করে বলতে থাকে, তোমরা আমাকে যাব। ওকে ছেড়ে দাও। ছুটি গিয়ে একজনের পা ধরে, তোমরা আমাকে যাব? আমাকে যাব ....।

ওরা ছ্যাজন পরম্পরারের শুরু চাওয়াচাওয়ি করে। বুড়ির কথা বুঝতে পারে না। ফাঁক পেয়ে কলীম ছিটকে গঠে।

- হা-

সঙ্গে সঙ্গে ওরা কলীমকে বুটের লাখি দেয়। কলীমের আত্মচিন্তারে বুড়ি চুপ করে যায়। আবার সিডির ওপর ফিরে আসে। অবৈ ওরা ছ্যাজন আজ্ঞাহাইলের ইত। বুড়ি আজ্ঞাহাইলের একটা স্পষ্ট চেহারা বছৰার মানে করার চেষ্টা করেছে। পারেনি। এখন একটা সুস্পষ্টি ধারণা হচ্ছে।

ওরা বুড়িকে ধরে কাঙুনি দিয়েছে। বুকের ওপর রাইফেলের ঠাণ্ডা নল চেপে ধরে আছে। তাঁর করবার কর দেখাচ্ছে। কলীম আগে আগে মুঠচুড়ি উঠাচ্ছে। ফাটা আঠের ইত হাতুর নদী ঘোনেত।

কলীমের মুখ। একটা কিছু চাচ্ছে। এক একবার ইচ্ছে করে ছুটে গিয়ে ওকে বুকে জড়িয়ে ধরতে। কিন্তু শরীরটা পাথরের চাইতেও ভারি। টেনে পঠানো যায় না।

ওদের গর্জনের মুখে বুড়ি কেবল বিড়বিড় করে, আবার কিছুই করার নেই। কেউ কেউ এমনি করেই মরে যায়। কাউকে কাউকে মরতে হয়।

বুড়ি আর কিছু করতে পারছে না। কাষে কোন শব্দ নেই। এমনকি কোরানের আয়াতও না? যে আয়াত স্মরণ করলে বুকে বল ফিরে আসে তা কেন একটাও স্মরণে আসছে না? গফরের মুখ স্মরণ করার চেষ্টা করে। কিন্তু তাও পারে না। সমস্ত হলদী গী একাকার হয়ে বুড়ির চোখের সামনে লুটোপুটি যায়। ওর কেবলই মনে হয় রামিজার হেলে কোথায় যেন কাঁদছে।

বুড়ির কাছে কোন উত্তর না পেয়ে ওরা ফিরে দাঢ়ায়। নিজেরা কয়েক মুহূর্ত কি যেন আলোচনা করে। সদস্ত পদক্ষেপে ভীষণ কিছু ঘোষণা করে। হেঁচকা টানে কলীমকে দাঢ় করিয়ে দেয়। উঠোনের মাঝখানে নিয়ে গুলি করে। মুখ খুবড়ে পড়ে যাওয়া কলীমের দেহটা এক লাখি দিয়ে ওপাশে গড়িয়ে দেয়। আবার এক লাখি দিয়ে এপাশে। তারপর হাসিতে শিসে গানে আনন্দ প্রকাশ করতে করতে করতে ওরা চলে যায়।

গুলির শব্দ এসে বিধে বুড়ির হস্তয়ে। গুলির শব্দটা ঠিক সেই মৃহূর্তে কলীমের মাড়কের মত। তীক্ষ্ণ। তীব্র। একেকড় ওকেকড় করে বেরিয়ে যায়। বুড়ির মুখ দিয়ে কোন আর্তনাদের খবরি বের হয় না। কেবল কুকুরটা ভীষণ শব্দে ঘেউ ঘেউ করছে। ইত্তেক ছুটোছুটি করছে। মাটি আঁচড়াচ্ছে। দাঁড়িয়ে লধা নিঃশ্বাস নিচ্ছে। বুড়ির সামনে দাঁড়িয়ে কিছু বলতে চাইছে। সারা বাড়িতে আর কোথাও কোন শব্দ নেই। রাইস মাকে ধরে ঝাঁকুনী দেয়। হাত ধরে টানাটানি করে।

বুড়ি দেখে কলীমের দেহ থেকে রক্তের দ্রোত নেমেছে। গুচ্ছ গুচ্ছ শিমুল ফুলের মত লাল। ঐ শিমুল থেকে বীজ হবে। বীজ হয়ে ফাটবে। বাতাসে উড়ে বেড়াবে সাদা ধৰ্মধরে উজ্জ্বল তুলো। বুড়ির মনে হয় সমগ্র হলদী গীটা গুচ্ছ গুচ্ছ শিমুল হয়ে গেছে। ঐ শিমুলের সাঁকে পেরিয়েই হলদী গী একমুঠো উজ্জ্বল তুলো হয়ে যাবে। আচমকা বুড়ির মনে হয় সলীমরা এ কথাই তো বলত। হলদী গায়ের লোকগুলোর চোখে মুখে এ অপুষ্টি তো ভাসতো। হ্যাঁ, স্পষ্ট মনে পড়ছে, যে শব্দটা ওরা সারাদিন বলাবলি করত, তা ছিল স্বাধীনতা। শিমুলের মত লাল রক্ত পেরিয়ে সে স্বাধীনতা তুলোর মত ধৰ্মধরে উজ্জ্বল হয়ে গঠে।

বুড়ি লক্ষ্য করে রাইস কখন যেন কলীমের পাশে গিয়ে বসেছে। খুব আস্তে আস্তে কলীমের গায়ে যাথায় মুখে হাত বুলাচ্ছে। ও কিছু বুকাতে পারছে না। নিজের হাতে রক্তের সঙ্গ নেড়েচেড়ে দেখে। গুরু শৌকে। তারপর একদৌড়ে বুড়ির কাছে ছুটে আসে। অবাক বিশ্যয়ে দুর্বোধ্য শব্দে ও চিন্তারে বুড়িকে টানাটানি করে। চোখের সামনে সব কিছু কেমন আবছ অস্পষ্ট হয়ে যায়। রাইসকে জড়িয়ে ধরে বুড়ি দুকারে কেঁদে গঠে। কলীমের তাজা রক্তের গুরু বুড়ির চেতনায়।

এক সময় কান্না খেমে যায়। রাইসকে ধরে প্রবল ঝাঁকুনী দেয়। তুই কেন চুপ করে ধাক্কিস রাইস? তুই কোন কিছু করতে পারিস না? তুই ফেটে পড় রাইস। আমিও তোর

সঙ্গে থাকব ? আমরা দু'জনে মিলে হলদী পীয়ের জন্যে একটা কিছু করব ? তোর কানটা যদি বোয়া হয়ে ফেঁটে যায় ? জিভটা যদি বুলেটের মত ছেটে ? ও রইস তুই আমার গলা ঢেলে থার ? তুই আমাকে ঘেরে ফেল ? বুড়ি গলা ফাটিয়ে কাঁদে ? চিকিৎসার বুকের ভেতরের সাত প্রত দেয়াল ভেঙে ঝুঁড়িয়ে থায় ? আশপাশের ঘরের লোকজন এসে ভিড় করে কলীমের পাশে ? রমিজা কতদুরে পালিয়েছে কে জানে ? এখনও ফিরেনি ? রমজান আলী এবং আরো কারা যেন কলীমকে বারান্দার উপর উঠিয়ে নিয়ে আসে ? কবর দেয়ার কথা বলাবলি করে ? বাকি সবাই বিদ্যুৎ ? বুড়ি কোন কিছু কলতে পায় না ? কোন কিছু দেখতে পায় না ? দেখে কলীমের রক্ত হলদী গী করে নিয়েছে ? মাটি ভেস করে সে রক্ত নিচে চলে যাচ্ছে ? উপরের অংশ জমাট বেঁধে কালো হয়ে আছে ? ও বিড়বিড় করে, হলদী গী রক্ত খাচ্ছে ? রমজান আলী জিজেস করে, কি বলেন রইসের হা ?

**বুড়ি শূন্য দৃষ্টিতে তাকায় ।**

- কলীমকে সুপোরি বাগানে কবর দিন রমজান ভাই !
- সে আমি সব ঠিক করব ? আপনি কিছু ভাববেন না ?

রমজান আলী চোখ মুছতে মুছতে নেয়ে যায় ? ছেলে-মেয়েরা ভিড় করে রক্ত দেবছে ? কেউ কেউ হাত দিয়ে নাড়ছে ? বুড়ির শূন্য দৃষ্টি আবার সে রক্তের উপর শিয়ে আছতে পড়ে ? মনে হয় কলীমের রক্ত হলদী পীয়ের মাটিতে নতুন পলিমাটি ? আপন শক্তিতে উর্বরা হ্রাস জন্যে হলদী গী সে রক্ত ধারণ করছে ? ওর মাথা পাক দিয়ে গঠে ? বাশের বুঁটিতে হেলান দেয় ? তবুনি কলতে পায় বুক ফাটা চিকিৎস করতে করতে রমিজা ঘরে ফিরছে ?

দিন গড়ায় ? বনলে যায় বুড়ির আপন কুবান ? যেন একটু কুকুড়ে বাড়ির মধ্যে ওরা কটা প্রাণী চুপচাপ বাসে থাকে ? রাত্রি হলে কারো মধ্যে কোনো প্রাণ থাকে না ? যাবে মাঝে রমিজার হেলে যখন জোরে কেঁদে গুঠে তখন ওরা বুঝি নিজেদের অস্তিত্ব টের পায় ? তাও কি কাঁদবার জো আছে ? হেলে কানলে রমিজা যেখানে থাকুক ছুটে আসবে ? সঙ্গে সঙ্গে হেলেকে খামিয়ে ফেলবে ? বুড়ির মাঝে যাকে ইচ্ছে করে যে হেলেটা চেচাক ? জোরে জোরে কেঁদে এই গী-টা মাতিয়ে তুলুক ? ঐ দৈত্যাঙ্গলো ভাবুক যে এ পীয়ের লোকগুলো সব হবে যাবানি ? বুড়ির ভাবনা রমিজা ধরতে পারে না ? ধৰার ক্ষমতাও নেই ? তাই বুড়ির সঙ্গে ও বাগ করবে ? ওর ধারণা বুড়ি হেলেটাকে ইচ্ছে করে কাঁদায় ? কানিয়ে যাবা পায় ? তাই বুড়ির কাছে দিয়ে রমিজার স্বত্ত্ব নেই ? বুড়ি আপত্তি করে কখনো কখনো !

- ওকে একটু কানতে দে না রমিজা ? ওর দম আটিকে কি তুই ওকে ঘেরে ফেলবি ?
- কি যে বলেন আস্যা ? কানলেই তো দৈত্যাঙ্গলো ছুটতে ছুটতে আসবে ? তারপর সবাইকে গুলি করবে ?
- করলেই হলো আর কি ?

কথটা বলেই থমকে যায় বুড়ি। থমকে যায় রমিজাও। পুরুরের পশ্চিম পাড়ে কলীমকে কবর দেয়া হয়েছে। সুপোরির ছায়ায় নিরিবিলি শয়ে আছে। সবুজ ঘাসে ভরে গেছে সে কবর। রমিজা পাতা বাহারের গাছ লাগিয়েছিল সেটাও বেশ বড় হয়েছে। হলদী গী কলীমের জন্যে কি সুন্দর সবুজ শাঙ্কির ঘর বানিয়ে দিয়েছে। বুড়ির বুক কেমন করে। বড় করে খাস নেয়। এই কবরের কাছে গিয়ে বসলে হলদী গী-র জন্যে মহত্ব বাঢ়ে। কলীম যুক্ত করেনি, কিন্তু হলদী গী-র জন্যে প্রাণ দিয়েছে। বুড়ি এখন রাইসকে নিয়ে বাগানে সুপোরি খুজতে যায় না। কলীমের কাছে যায়। কিন্তু দোয়াদুর্দ পড়ে। চোখের পানি আঁচলে মুছতে মুছতে ফিরে আসে। উঠোনের দিকে চোখ পড়ে। মাটি খুড়লে হয়তো উঠোনে রাঙ্গের দাগও বেরিয়ে যেতে পারে। তবুও বুড়ি আস্তে আস্তে বলে, গুলি করা কি অস্ত সহজ?

- সবই সহজ। রমিজা কথা বুঝে পায়। এখন সবই সহজ। ছেট ভাইকে মেরে ফেললো। শামুর মা'র কথা একবার চিন্তা করেন আশ্মা। কি যে দিনকাল হল।

রমিজা চাল বাছায় মনোযোগী হয়। শামুর মা'র কথা ও সহজ করতে পারে না। বুড়ির বুকটা ও মোচড় দিয়ে ওঠে। বেচারী।

কলীমকে যেদিন মারলো ঐদিনই পাটক্ষেতের একবুক পানির মধ্যে লুকিয়েছিল ওরা সবাই। একটু দূরের রাঙ্গা দিয়ে একদল সৈন্য যাচ্ছিল।

কোলের ছেলেটা কেন্দে উঠতেই শামুর মা ওকে পানির তলে চেপে ধরে। কোন কিন্তু ভাববার সময় ছিল না তখন। মিলিটারি চলে গেলে ওরা সবাই উঠে এল। শামুর মা'র বুকে তখন ছেলে মরে ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। বাড়ি ফেরার অর্ধেক পথ এলে শামুর মা টের পায়। তয়ে এত তটছ ছিল যে বুঝতেই পারেনি। কোল বদল করার সময়ই টের পায় যে ছেলেটা নড়ছে না। তয়ে শামুর মা চিন্কার করেও কাঁদতে পারেনি। অসাড় হয়ে গিয়েছিল অনুভূতি! বোবার মত ফ্যালফ্যাল করে চেয়েছিল। এখন ওর মাথার ঠিক নেই। দিনরাত বলে, ছেলেটাকে আমি নিজের হাতে মেরে ফেললাম। আঞ্চারে আমার কি হল? বুড়ি শামুর মা'র সামনে বেশিক্ষণ থাকতে পারে না। সইতে পারে না টলটলে জলভরা বোবা চাউনি। রমিজার মত বুড়িও বিড়বিড় করে, কি যে দিনকাল হল। এমনি আরো কত ঘটনা আছে। রোজই কিন্তু না কিন্তু ঘটে। কোনটা ছেড়ে কোনটা মনে রাখবে। রমিজার চাল বাছা শেষ হয়েছে। ভাত চড়াবে। ও চালের টুকরি নিয়ে পুরু ঘাটের দিকে ইটিতে থাকে। যেতে যেতে বলে, দেখবেন আশ্মা ও যেন কাঁদে না। কদ্মা দনলে আমার বুক খড়কড় করে।

ছেলেকে নিয়ে রমিজার বড় ভয়। ও সারাক্ষণ ছেলেটাকে বুকে আঁকড়ে বেড়ায়। সলীম চলে যাবার পর থেকে একদম দুর্বল হয়ে গেছে। কারো সঙ্গে জোর করে কথা ও বলতে পারে না। যেন সলীম চলে যাবার দায়-দায়িত্ব সব ওর। কলীমের মৃত্যু ওকে আরো অপরাধী করেছে।

- ও না গেলে ছেট ভাই বোধ হয় মরতো না, না আশ্মা?

- কি জানি মা সবই আঞ্চার ইচ্ছা।

বুড়ি উদাসীন হয়ে থাকে। বলতে পারে না যে সলীম না গেলে ওরা সলীমকেই মারতো। অথবা দু'জনকেই মেরে ফেলতো। তখন কি হত রমিজার? কলীম গেছে, কলীমের কোন পিছু টান নেই। কিন্তু সলীম গেলে রমিজার বৈধব্য বুড়ির বাকি জীবনটুকুতে কঁটা হয়ে থাকত। তার চেয়ে যা হয়েছে ভালোই হয়েছে। সলীম যেন ঠিকঠাক ফিরে আসে এই দোয়াই করে। এর মধ্যেই বুড়ি কলীমের মৃত্যুর সামুনা খোঁজে। কিন্তু রমিজা কোন সামুনা পায় না। ওর বিবেক ওকে কাঁদায়। রমিজা প্রায়ই কাঁদে। পুরুর ঘাটে বসে, বিছানায় শয়ে, ভাত রুখতে বসে সব সময়ই কাঁদে। বুড়ির মনে হয় শুধু কলীম নয়, সলীমের জন্মও কাঁদে ও। সেই যে গেল ছেলেটা কতদিন হয়ে গেল অথচ কোনো খবর নেই। বৈচে আছে, ভাল আছে এই একটা খবরও কি সলীম পাঠাতে পারতো না? কোন দুর্গম এলাকায় আছে যে খবর আসে না? বুড়ির রাগ হয়। সলীম নেই, কলীম নেই। রইস বৈচে থেকেও না থাকার মত। শুধু এই একবারতি ছেলেটা এখন এই বাড়ির প্রাণ। তাও জোরে কাঁদার অনুমতি নেই ওর। রমিজার কড়া শাসন ওকে দিয়ে রাখে। হাত পা ছুড়ে ও যখন হাসে আর খেলে তখন বুড়ির বুক ঝুঁড়িয়ে যায়। ভয়-কাতুলে রমিজা তকনো মুখে হাসতে চেষ্টা করে।

-বুড়ি বলে, দ্যাখ রমিজা দ্যাখ। ওর দিকে তাকিয়ে সাহসী হতে শেখ।

- ওর মত বয়স পেলে আমিও হাসতাম আম্মা।

- সাহস বুকের মধ্যে থাকে রে। ওর জন্মে বয়স লাগে না।

রমিজা কথা বলে না আর। ও জানে ওর কোন সাহস নেই। ছোটবেলা থেকেই ও একটা ভীতুর ডিম। তাই সারাদিন বাড়িতে ও চুপচাপই থাকে। প্রায় নিঃশব্দে। একদম না থাকার মত।

গ্রামের অবস্থা দিনদিনই খারাপ হতে থাকে। ওরা একটা নারকীয় উৎসবে মেলে উঠেছে। সামান্য ছুতো ধরে গুলি করে। ঘরে আগুন দেয়। লাশ টেনে আধাআধি মাটি চাপা দেয়। শকুন ভীড় জমায়। শেয়াল টেনে বের করে সে সব লাশ। গ্রামের লোক ভয়ে সেদিকে যেতে সাহস পায় না। কদিন পর মাথার খুলি গড়ায় মাটে। হাঞ্জি জেগে থাকে মাটির ফাঁকে। কখনো মেশিনগানের ত্রাশফায়ারে খুম ভেঙে যায় ওদের। বিছানায় উঠে বসে থাকে। বাকি রাতটুকু কেউ ঘূর্যতে পারে না। কখনো কখনো রাতের অক্ষকারে ওদের দু'ভিজন হয়ে ঝুঁজতে আসে। ঘর থেকে টেনে বের করে নিয়ে চলে যায়। সেসব মেয়েরা আর ফিরে আসে না। কাউকে ক্যাম্পে আটকে রেখেছে। কাউকে প্রয়োজন শেষে মেরে ফেলেছে। দিনের বেলায় গুরু-ছাগল-হাঁস-মূরগি নিয়ে যায়। জবাই দিয়ে ক্যাম্পে উৎসব করে। হৈ ছলোড় চিকার কেসে যায় অনেক দূর পর্যন্ত। বুড়ির দুটো গুরু নিয়ে গেছে। শুরুতে গিয়ে দেখেছে জবাইয়ের দৃশ্য। আর একটা গাছতলায় বীধা ছিল। ভীষণ ভাবে ভাকছিল সে গুরুটা! বুড়ি কাছে যেতে পারেনি। সে সাহস হয়নি। শুধু হাধা ভাবে ধরবার করে কাপছিল হাঁটু দুটো। ফিরে এসে হাউমাট করে কেনেছিল বুড়ি। রমিজা সামুনা দিয়েছিল, আম্মা থাক দরকার নেই আমাদের গুরুর। এর চেয়ে বড় বিপদও তো আমাদের হতে পারতো। হ্যাঁ, তা হতে পারতো।

ওরা ঘর পুড়িয়ে নিতে পারতো। বুড়িকে মেরে ফেলতে পারতো। রমিজাকে ধরে নিয়ে  
যেতে পারতো। বেয়োনেটের মাথায় গেথে নিতে পারতো বুড়ির প্রিয় নাতির শরীর।

- ভেবে দেখেন আম্যা হোটভাইকে মারার পর ওরা আর এ বাড়িতে আসেনি।

বুড়ির কান্না থেমে যায়।

মাঠ থেকে গরু নিয়ে গেছে যাক গে।

- বড় মায়ার গরু ছিল রে রমিজা!

- কি আর করবেন।

রমিজা হাত পাখা দিয়ে বুড়িকে বাতাস করে। রমিজার সাম্মানীয় কথায় বুড়ি চুপ  
করে যায় কিন্তু বুকের নিটটা ঝাঁকরা হয়ে থাকে। ভুলতে পারে না সেই হাতা ভাক।

রমিজাকে নিয়েও আত্মক দানা বাঁধতে থাকে বুড়ির মনে। তয়ে কিছু বলতে পারে  
না ওকে। রমিজাও বোঝে। কিন্তু কিছু বলে না। ওর হৌবন এখন ভয়ের কারণ। যে  
কোন মৃহূর্তে তছনছ করার জন্য দস্তুর দল আসতে পারে। রমিজার চুপসে যাওয়া  
শুকনো গাল নিচ্ছ্রদ হতে থাকে দিন দিন। কাজ কর্মে মন নেই। উৎসাহও নেই।  
উঠোনে শ্যাশ্বলা জমে। আগাছা গজায়। এখন আর লেপে-পুছে তক্তকে ঝক্কাকে  
করে রাখে না ঘর-দুয়োর। ছুলোয় তিনি বেলার আগুন এক বেলায় জ্বলে। ও এখন আর  
দাউন্ডাউ করে আগুন জ্বলে না। টগবগিয়ে ভাত ফোটে না। বুড়িও বসে বসে সে আগুন  
দেখে না। সব এলোমেলো হয়ে গেছে। বুড়ি বাকী একটা গরু নিজেই চৰাতে নিয়ে  
যায়। বাশবন পর্যন্ত কিংবা খালের ধারে, এর বেশি যায় না। শেষ সবল এই গরুটা  
কিছুতেই আর মাঠে চৰতে পাঠায় না। কখনো বুড়ি নিজেই ঘাস কেটে আনে। খড়  
যোগাড় করে। হাঁসগুলোকে সক্ষ্যার আগে খোয়াড়ে চুকিয়ে দেয়। নিজেরাও খাওয়া-  
দাওয়া সেরে ফেলে। রাত্রিবেলা আর বাতি জ্বলে না ঘরে। বুড়ি অনুভব করে অভাব  
ক্রমাগত মুখ হ্যাঁ করে এগিয়ে আসছে। তধু তয়ে নয় কেরোসিনের অভাবেও বাতি  
জ্বালানো সম্ভব হচ্ছে না। সারা বছরের চাল ঘরে আছে বলে ভাত জ্বাটছে। এর বাইরেও  
নিয়দিনের টুকিটাকি কত কি লাগে সেগুলো আর জ্বেটে না। গতকাল রমজান  
আলীকে দিয়ে একমাত্র ধান বিক্রি করিয়েছে। তার থেকে হলুদ, মরিচ, লবণ, তেল,  
সাবান কিনেছে। কোনদিন শাকভাজি, কোনদিন কাঁচা মরিচ এই তো চলছে। বুড়ি কি  
করবে কিছু ভেবে কুলিয়ে উঠতে পারে না।

এর মাঝে রমিজার বাবা রমিজাকে নিতে আসে। সলীম চলে যাবার খবরটা ওরা  
খুব দেরিতেই পেয়েছে। তাই এতদিন আসেনি। রমিজার দারিদ্র্য থেকে মুক্তি পাবে  
বলে খুশি হয় বুড়ি। ওর যদি কিছু অঘটন ঘটে যায় তাহলে তাদের কাছে খুব দেখাবে  
কেহন করে। কি জবাব দেবে ওদের প্রশ্নের। তার চাইতে রমিজার যাওয়া ভাল। কিন্তু  
পরকল্পে বুকটা আবার দমে যায়। এ শূন্য ঘরে কি করে দিন কাটিবে ওর? দরজার  
আড়ালে দাঢ়িয়ে রমিজার বাবার সঙ্গে কথা বলে।

- জামাই যখন নেই মোয়েটাকে আমি নিয়ে যাই কি বলেন আপনি?

- খুব ভাল হবে। আমিও ওকে নিয়ে খুব দুশ্চিন্তায় আছি।

- হ্যাঁ, এত বড় বাড়িতে আপনারা দুজন হয়ে মানুষ মাত্র। এতদিন যে কেমন  
করে ছিলেন ভাবতেও অবাক লাগে। আচ্ছার অশেষ দয়া বলে কোন দুর্ঘটনা ঘটেনি।  
যাক যা হবার হয়েছে। এখন ভালোয় ভালোয় হয়েটাকে নিয়ে যেতে পারলে বাঁচি।

রমিজার বাবার কথায় বুড়ির মন থারাপ হয়ে যায়। কোন উত্তর দিতে পারে না।  
সব কথাই সত্যি। ইচ্ছে করলে রমিজা নিজেও লোক জোগাড় করে চলে যেতে পারত।  
যায়নি। বুড়ির কি ক্ষমতা আছে রমিজাকে রাখা করার? তাই অভিযোগের ভূবাব নেই।  
আপনি করে রমিজা নিজে।

- আমি তলে গেলে আম্বা একলা কি করে থাকবে বাবা?

- বুড়ি তাড়াতাড়ি বলে, আমার কথা তোর ভাবতে হবে না। আমি ঠিক থাকতে  
পারব দেবিস। আমি বুড়ো মানুষ কোন মতে দিন ঠিকই তলে যাবে। তোকে নিয়ে  
আমার যত্ন কর্য।

- কিন্তু তোর এখানে থাকা ঠিক হবে না রমিজা। কলীম থাকলে তবু একটা কথা  
হিল। কেউ নেই যখন বেশি সাহস করা ভাল না।

- আশপাশের ঘরে তো লোক আছে বাবা?

- পাঢ়াগড়শি নিয়ে কি হয়? আপনজন থাকতে হয়।

- কিন্তু বাবা কপালে যা আছে তাই হবে সে যেখানেই থাকি না কেন? তুমি চেষ্টা  
করলেই কি কপালের লিখন ঠেকাতে পারবে?

- তাই বলে জেনেজনে তো তোকে আর মরতে দিতে পারি না?

রমিজার বাবার কাণ্ঠে রাগ এবং বিরক্তি ও মেয়ের বাচালতায় কষ্ট।

- সব সময় বড়দের সঙ্গে কথা বলা তোর একটা অভিযাস হয়ে গেছে রমিজা।  
আদব কায়দা শিখতে চেষ্টা কর। তোর চেয়ে আমি কম বুঝি না। আমাকে বেশি  
বোঝাতে হবে না। কি ভাল কি মন্দ সেটা আমি ভালই জানি।

রমিজার বাবা যাগে কিন্তু হয়ে গঠে। তার মেজাজটা সব সময় একটু চড়া।

- আপনি ওর কথায় কিছু মনে করবেন না বেসাই সাহেব। ও ঠিকই যাবে,  
আপনি এখন আরাম করুন। আমিও চাই না যে ও এখানে থাকুক।

বুড়ি জোরের সঙ্গে কথা বলে। রমিজার কোন ঘৃত্তি আর খাটে না। ও বাপের  
জন্যে ভাত আনতে রান্নাঘরে যায়। বুড়ি ঘূমস্তুপ নাতির পাশে পিয়ে বসে।

বাতে দুজনের কারোই ঘূম আসে না। কিছু দেখা যায় না তবু আধারেই চেয়ে  
থাকে। বুড়িকে ছেড়ে যাবে না বলে জেন করতে থাকে রমিজা। কান্নাকাটিও করে।  
বুড়ি কিছু বলতে পারে না। মন্দ এখন উদোয় মাটের মত। রমিজাকে ছাড়া এই শূন্য  
বাড়িটা ওর কাছে করবের চেয়েও বেশি। কিন্তু উপায় নেই। কলীমের ঘৃত্তার মত এ  
কটিও চেপে রাখতে হবে। ক্ষেত্র নিজের দিকটা ভাবলে তো চলবে না। বাপের মন  
মেয়ের চিন্তায় অঙ্গুর হয়ে গেছে। এ নিয়ে বাড়াবাড়ি না করাই ভাল।

- আমি গেলে আপনার বুকটা ফেটে যাবে আম্বা? তাড়াড়া এই দুর্ঘটাকে ছেড়ে  
আপনিইব্বা থাকবেন কি করে? আমার মন চায় না যেতে।

- আচ্ছা এখন ঘুমো। শকালে দেখব।

- বাবাকে আপনি জোর দিয়ে বললেই হবে। বাবা যে কি একটি ও কিছু বুঝতে চায় না। স্বার্থপরের ঘন্ট আমি তলে গেলেই হল আর কি? বাবা সব সহজেই এমন। নিজে যেটা বুঝবে সেটা করবেই করবে। আর কারণ কথা শুনতেই চায় না। জানেন আম্মা হেটিবেলায় দেখেছি এই নিয়ে বাবার সঙ্গে প্রয়োগ লোকজনের অগভ্র হত।

- আজ্ঞা এখন বুঝতো। হেলেটা আবার উঠে যাবে।

রমিজা চুপ করে যায়। বুড়ি পাশ ফিরে শোয়। ঘূর কি আর আসে? সলীম যেদিন যায় সেদিনও এমনি করে জেগেছিল রাতে। কলীম মারা যাবার পর সাত দিনতো চোখের পাতা এক হয়নি। এখন রমিজাও যাবে। ওকে ঘেতেই হবে। ও যত কথাই বলুক ওর বাবা ওকে ছাড়বে না। জোর করে হলেও নিয়ে যাবে। বুড়ির জন্য ওদের কিসের টান? বুড়ি মরলেইবা ওদের কি আসে যায়? বুড়ির চোখের কোণে জল আসে। ভয়ানক নিসেঙ্গ হনে হয় নিজেকে। হ্যাত বাড়িয়ে রইসকে কাছে টানে। ও এখনও আছে। ওর কোথাও যাবার জ্ঞানগা নেই। কোথাও যাবার ক্ষমতাও নেই। রইস বুড়ির নিঃসন্দেহ ঘোচাতে পারে না। তবুও বুড়ি রইসকে বুকে জড়িয়ে নেয়।

বাত কত হবে কে জানে। পুরুষের ঘর থেকে যেতে-কঠের চিন্তার আসে। কান-ঘাড় করে থাকে দু'জনে। শোলে দুড়লাড় শব্দ। মেয়েটির চিন্তার থেমে গেছে। কেউ যেন ওর মুখে হ্যাত চাপা দিয়েছে। ও গোভাজে। বেশিক্ষণ সে শব্দ উঠোনে থাকে না। দ্রুত যিলিয়ে যায়। গোঁফনির শব্দ এসে রমিজার বুকের কেতুর হ্যাতুড়ি পেটায়। তবে তয়ে বুড়িকে ডাকে।

- আম্মা ওনছেন?

- হ্যা।

- ফুলি না?

- সে রকমই তো মনে হয়। ফুলিই হবে।

- কি হবে আম্মা?

- কি আর হবে। চুপ করে তয়ে থাক। আল্লাকে থাক।

এক সময় শব্দ যিলিয়ে যায়। ওরা তলে যাবার অনেক পরও তবে কেউ সাড়া দেয় না। ঝিঝিটের ডাক জোরদার হয়ে ওঠে। বুড়ি বিজ্ঞানায় উঠে বসে। পাশের ঘরে রমিজার বাপ কাশে। তাও শুব আস্তে। গলা চেপে চেপে। বুড়ির ইচ্ছে করে দরজা খুলে বের হ্যাতে।

- আম্মা উঠলেন কেন?

- বাইরে যাব।

- না। রমিজা চাপা আর্তনাদ করে ওঠে। কে জানে দু'একজন আবার ঘাপটি যেরে দাঢ়িয়ে আছে কি না?

বুড়ি খিতিয়ে যায়। তাই তো? যদি এ যে আসে?

- আম্মা ঘুমান। বাবা বোধহ্য জেগে আছে।

রমিজা ফিসফিস করে বলে।

বুড়ি বসেই থাকে। অক্ষমতার যত্নগায় ফুলে ওঠে শরীর। এতবড় একটা ঘটনা ঘটল অথচ কেউ প্রতিবাস করেনি। লাঠি নিয়ে বের হয়নি। দলবক হয়ে আক্রমণও না। নির্বিবাদে কাজ সেরে চলে যায় ওরা। টেনেছিচড়ে নিয়ে যায় ফুলিকে। ও কারণ কাছে কোন সাহায্য পেল না। ওর জন্মে কেউ ছুটে এলো না। আজ্ঞা এমন কোন যুবক কি ছিল না যে ফুলিকে ভালবাসে? ফুলিকে যে ওদের হাত থেকে ছিনিয়ে আনতে পারতো? ফুলির জন্মে মরে যেতেও পিছপা হতো না? বুড়ির মাথা ভার হয়ে ওঠে। নিখর রাত নীরব, নিশ্চূপ। ওর চোখের কোথে জল চিক্কিট করে। ছেঁড়া কাঁধার মধ্যে মুখ থাঁকে। মনে মনে বলে, আজ্ঞা আমাদের জন্মে মানুষ দাও। শক্তিশালী, সাহসী মানুষ দাও। মানুষ দাও। মানুষ দাও। ড্যাহীন, যোন্তা, লাঠি হাতে ঝাপিয়ে পড়া মানুষ দাও। হলদী গায়ের মাটি ফাঁড়ে চারিক তোলপাড় করে ছুটে আসুক হাজার হাজার মানুষ। বুড়ির যে কি হয়। বুড়ি বারবার একটা কথা মনে মনে আওড়াতে থাকে। যতভাবে, যত মিনতিতে চাওয়া যায় আজ্ঞার কাছে সেইভাবে প্রার্থনা করে। এমন তন্মুখ হয়ে আকুল হৃদয়ে বুড়ি কোন দিন আর কোন প্রার্থনায় নিমগ্ন হয়নি। বাকী রাতটুকু ওর আর ঘূম আসে না। ভোর হয়ে আসছে। অনেক রাত জেগে রমিজা এখন ঘুমোচ্ছে। বুড়ি দরজা খুলে বাইরে আসে। বুক ভরে খাস নেয়। মনে হয় আজই চলে যাবে রমিজা। সক্ষ্যারাতে ওর কান্নাকাটিতে যে দুর্বলতাকু মনে জমা হয়েছিল মধ্যরাতে ফুলির চিহ্নের সে দুর্বলতার রেশটুকু কাটিয়ে দিয়ে যায়। যাটে মুখ ধূতে গিয়ে বুড়ির চোখের বিরামহীন নোনা জল পুরুরের পানির সঙ্গে মিলেছিলে এক হয়ে যায়।

রমিজার বাবা দুম থেকে উঠেই হোয়েকে তাগাদা দেয়।

তাড়াতাড়ি গোছগাছ কর। বেলা ওঠার আগেই রওনা দেব। দুপুর নাগাদ বড়বাজার পৌছতে পারলে সক্ষ্যার আগে বাড়ি পৌছে যাব। জানিস তো রাত্রিবেলা মধু মাবি নৌকা বাইতে চায় না।

- কিন্তু বাবা আমি গেলে ....

- আবার কথা। শুনলাম তো কালরাতের ঘটনা। কানে তো আর তুলা দিয়ে রাখিনি। আজ রাতে যে এ ঘরে আসবে না কে জানে। আমাদের এলাকা এখনো মুক্তিবাহিনীর দখলে। ফিলিটারি চুক্তিই পারেনি। তাছাড়া অত ভেতরে ওরা যেতেও সাহস পাচ্ছে না। যা তাড়াতাড়ি কর।

রমিজা বাবার সামনে থেকে সরে পড়ে। মনে মনে বলে বাবা চিরকাল এমনি একটু শুকনো কথা বলে। মনে মনে যত ভালইবাসুক, একটুও আদর করে কথা বলতে জানে না। বুড়ি ঘর থেকে সব কথাই শোনে। খোঁজাড়ে দুটো হাঁসের ভিম পেয়েছে। তাই ভেজে পাঞ্চা সাজিয়ে দেয় বেয়াইকে। মাটির সানকির ওপর বুড়ির হাত নিখর হয়ে যায়।

রমিজা বুড়ির সামনে এসে দাঁড়ায়, আম্মা?

- দেরি করার কাজ নেই রমিজা। তাড়াতাড়ি রওনা হওয়া ভাল। বেলা হলে ছেলেটার কষ্ট হবে।

- আম্মা?

- আর কথা বাড়াস না । তোর বাবা ঠিকই বলেছে । আজি রাতে যে এ ঘরে হামলা হবে না কে জানে ?

- আপনি একলা কি করে থাকবেন ? আপনি ও আমার সঙ্গে চলেন ?

- আমার অন্য ভাবনা নেই । আস্তা আছে । তারপর বুড়ি ফিলিপিসিয়ে বলে, বাড়ি খালি করে সবার যাওয়া ঠিক না । সঙ্গীয় যদি ফিরে আসে ?

বুড়ির কথায় রমিজার কানূ পায় । বাবার ভয়ে শব্দ করে কানতে পারে না । চোখ মুছতে মুছতে চলে যায় । ফুলিয়ে ঘটনায় ওর মনও দুর্বল হয়ে গেছে । জোরাজুরি করে থাকবার সাইস্ট্রকু নিজের মনেও শুব একটা নেই ।

বালের ধার পর্যন্ত ওদের সঙ্গে সঙ্গে আসে বুড়ি । নাতিটা বুকের মধ্যে হাত পা ছুড়ছে । ওকে নিবিড় করে চেপে ধরতেই বুক ভেঙে আসে । তবুও নিজেকে দুর্বল হতে দেয় না । রইস বুড়ির পিছু পিছু হাটাছে । তখনো সূর্য উঠেনি । নরম আলো চারদিকে । রমিজা বাববার ওচলে চোখ মোছে । ওর বুকে ঝীঘল কষ্ট । অনেকদিন সঙ্গীয়ের ঘৰে নেই । বুড়িকে একলা ফেলে নিজে স্বার্থপূরের হাত চলে যাচ্ছে বলে মনটা ঝাঁঝচ করে । তবুও রমিজাকে যেতে হচ্ছে । ও স্যাঙ্গে খুলে হাতে নিয়ে কালা পাড়িয়ে নৌকায় উঠে । ছেলেটা কোলে । ও বাববার বুড়ির দিকে হাত বাড়ায় । ওর কাছে আসতে চায় । বুড়ি পুতুলের মত দাঁড়িয়ে থাকে । নড়তেও পারে না । নৌকো ছেড়ে দেয় । স্বচ্ছ পানিতে তরতুর করে নৌকো এগোয় । রমিজার বাবা কি বলে যেন বিদায় নিয়েছে সেকথা মনে থাকে না । কেবল মাথা নাড়ে । বুড়ি মেঘে বালের বয়ে যাওয়া । জোয়ারের সহয় এখন । পানি আসছে । দেবে বিক্ষিক্ষ কচুরিপানা বেঙ্গলী ফুল বুকে নিয়ে ভাসে । বালের ওপায়ে মাঠ । কেবল মাঠ, মাঠের পর মাঠ । বালের বাকে নৌকো ঝাঁঝিয়ে যায় । আর দেখা যায় না । বুড়ির মন বী-বী করে । মনে হয় যে মনের ভেতর কেবল মাঠের পর মাঠ । জনমানব নেই । এই কচুরিপানার মত বুকের মধ্যে রইসকে নিয়ে বুড়ি ভাসছে । কোথায় যাবে জানে না । এই ভাসটাই সত্য কেবল । গায়ে গো লাগিয়ে বাতাস বায়ে যায় । কালো জোয়ারা একটা বাববার বুড়ির মুখের কাছে উড়ে আসে । রইস মা-র হাত ধরে টানাটানি করে । বাড়ির পথ দেখিয়ে দেয় । বাবাৰ জন্মে ইশাৰা করে । ও কেমন অস্তিৰ হয়ে উঠেছে । বাড়ি ছেড়ে ও কোথাও যেতে চায় না । কোথাও গেলে কেবল জন্মে ব্যাকুল হয়ে উঠে । বুড়ি ওর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে । ঝীঘল কষ্টে বুক ফেটে যেতে চায় । কত কষ্টের ধন ও । বুড়ি ভাবে, কষ্ট করে পেয়েছে বলেই বুঝি কষ্টটা বুড়ির নাড়িতে গেঁথে গেছে । ওকে নিয়ে সুখ নেই । সূর্য ফুটিয়ে উঠে । বাশ বানের মাথার ওপর দিয়ে লাল হয়েছে আকাশটা । রইসের হাত ধরে কিয়ে আসে । ফুলিদের ঘরের সামনে লোক জড়ে হয়েছে । ফুলিয়ে মা ওনগুণিয়ে কাঁদে । ফুলিয়ে বাপ মাথায় হাত দিয়ে বসে আছে । সকলের মুখ শকনো । কি করবে কেউ তা ভেবে উঠতে পারে না । বুড়ি ওলের কাছে এসে দাঁড়ায় । রমিজান আলী বলে, বউকে পাঠিয়ে দিলে বুড়ি ।

- ঈা ।

- শুব ভাল করেছ ।

- আমার কি হবে গো রইসের মা ?

ফুলির বাবা হাউমাটি করে কেনে ওঠে। সেই সঙ্গে অনেকে চোখ মোছে। বুড়ির  
রাগ হয়। কারো বুকে কোন সাহস নেই। আছে কেবল চোখের জল। কি জগন্নৎ!  
সকলে জড়ো হয়ে কাঁদতে বসেছে। ফুলির বাপের সঙ্গে কথা না বলে নিজের ঘরে  
ফিরে আসে। একবার চিন্তার করে বলতে ইচ্ছে করে যে সবাই এমন তকনো মুখ  
নিয়ে বসে থাকলে সারা গী উজ্জ্বল হয়ে যাবে। কিন্তু কাকে বলবে? কেউ কি আছে  
গোয়ে? সব মেরুদণ্ড তাঙ্গা। কুঁজো হওয়া অধর্ব বুড়ো। বুড়ি একদলা ঘৃতু ফেলে। কারো  
কাছে দু'দণ্ড বসে মন খুলে কথা বলারও উপায় নেই। তবে চিমসে ধাকে।

গত সন্ধিয়া রামিঙ্গা ঘরে ঘরে গিয়ে বিদায় নিয়েছে। সবাইকে বলেছে বুড়ির  
দেখাশোনা করতে। আগে যারা খৌজ নেবার দরকার মনে করত না এখন তারা  
একবার করে আসে। রহজান আলীর ছেলে কাদের আর হাফিজ বাইরের ঘরে ঘুমোয়।  
ছেলে দুটিকে সারাঞ্চণ আগলে রাখে রহজান আলী। পালিয়ে পালিয়ে বেড়ায় ওরা।  
কেবল কৈশোর পার হয়েছে ওদের। অনেক কিছুই বোঝে না। বুড়িকে ওরা ভীষণ  
ভালবাসে। ফুলিকে ধরে নিয়ে যাবার পর একদিন রাতের অক্ষকায়ে বুড়ির সামনে গর্জে  
উঠেছিল দু'ভাই, এভাবে পালিয়ে পালিয়ে বেড়াতে আমাদের বড় ঘেন্না হয় চাচি। ইচ্ছে  
করে একদিন পালিয়ে গিয়ে মৃত্যি বাহিনীতে ঘোগ দেই।

হাফিজ বলে, বাবা সব সময় তার পায় কবন যিলিটারি ধরে নিয়ে আমাদের মেরে  
ফেলে। আমার মনে হয় যারতেই যদি হয় তাহলে ওদের সঙ্গে পড়েই যাব। তবু তো  
বাবার মনে পর্ব থাকবে যে তার ছেলে মৃত্যু করে আরেছে। আপনি কি বলেন চাচি?

ওদের কথা তনে অভিজ্ঞ হয়ে যায় বুড়ি। আবেগে চোখ ছলছল করে।

- তোরা টিকিই বলেছিস বাবা। তোরা এতো কথা ভাবলি কখন?

কাদের আর হাফিজ হাসে।

- তোমরা সবাই তার আমরা ছেটি। কুল পেরিয়েছি কেবল।

- ওরে নারে না। তোরা আমার বুকের মানিক। তোরাই তো পারবি। বুড়ো  
হ্যাবড়াদের দিয়ে কি কিছু হবে?

সে রাতে কাদের আর হাফিজ মুয়োতে গেলে অনেকদিন পর বুড়ি বুক ভরে খাস  
নেয়। এক ঘুমে রাত পার হয়ে যায়। বাবাবার মুখ ভাঙ্গে না।

আবে যাবে বুড়ি বাঁশবনে গিয়ে দীঢ়ায়। পথের দিকে তাকিয়ে ধাকে। যদি সলীম  
ফিরে আসে ঐ পথে। দূরের বিলুটা যদি কাছে আসতে আসতে সলীম হয়ে যায়। দিন  
গড়ায়। বুড়ির আকাঙ্ক্ষা আর সত্ত্ব হয় না। পুরুব ঘাটে গিয়ে বসে। দেখে নারকেল  
গাছের ছায়া আরে আত্ম কেমন ছেটি হয়ে যায়। হাঁসের মল পা আড়া নিয়ে উঠে  
দীঢ়ায় পাঢ়ে। শাওলা সবুজ জল মীতার কথা মনে করিয়ে দেয়। মীতা আর আসেনি।  
বেঁচে আছে কি না তাও জানে না। ওকে একবার কাছে পেলে হতো। নিঃশব্দ  
মৃহূর্তগুলো আর সহ্য হয় না। মীতা এখনো হয়তো কঠে ভালোবাসার গান নিয়ে  
একবার থেকে আর একবারে ছুটে বেড়াচ্ছে। অবিল বাটিল ওকে নতুন জীবন দিয়েছে।  
বুড়ির দিনগুলো বালিহাসের পাথার মত ধূসর। রাতের ভাবা আরো নিঃশব্দ।  
বুড়ির চেতনার আকাশ জ্বালাপথ যেন।

যাসবানেক পর কাদের আর হফিজ এসে বুড়ির দরজায় ঢোকা দেয়। তখনো তোর হয়নি। আধার স্মৃত সরে যাচ্ছে। বুড়ির শুক ধড়কড়িয়ে ওঠে। কি আবার হলো? চকিতে মনে হয় গুলির শব্দ, আগুন, রক্ত, মৃত্যু ইত্যাকার বিবিধ ভাবমা। অনেকস্থল  
বুড়ি নড়তে পারে না। মনে হয় কলীমের মা তাকের তৈরি চিহ্নকার। সঙ্গে সঙ্গে একরাশ  
গুলির শব্দ। বুড়ির কান ঝাঁকিয়ে দেয়। বাইরে ওরা অস্ত্র হয়ে ওঠে। দেরি করার  
সহায় নেই। এদিক গুলিক হলে বাতাসও শক্রভা করতে পারে। কাদের আর হফিজের  
কিছু হলো না তো? বুড়ি হির হয়ে থাকে। বাইরে গুদের অস্ত্র কষ্ট উচ্চ হয়।

- চাচি, ও চাচি?

সেই ভাকে বুড়ির রক্ত নাড়া দিয়ে ওঠে।

- কিরে এতো রাতে কি?

- আমরা যাইছি।

- কোথায়?

- বৃক্ষিবাহিনীতে যোগ দিতে। আমরা যুক্ত করব। আপনাকে বলেছিলাম না?  
কাউকে কিছু বলিনি। তখু আপনাকে বলে যাইছি। আপনি বাবাকে বুকিয়ে বলবেন।

বুড়ির মনে হয় অবিকল সলীমের কষ্ট। এয়নি করে সলীম একদিন চলে গিয়েছে।  
বুড়ির ঠোট কাঁপে ধর ধর করে।

- আমাদের দোয়া করেন চাটী যেন শুলিয়ে আবার ফিরে আসতে পারি।

ওরা পায়ে হ্যাত দিয়ে সালাম করে। বুড়ি অভিভূত হয়ে যায়। ওরা যে সত্তি এতটা  
সাহসী হয়ে উঠতে পারবে কাছে বসে ভাবতেই পারেনি তা। গুদের পায়ে যাথায় হ্যাত  
শুলিয়ে দেয়। দেবসূতের আলোর মতো ওরা এখন উজ্জ্বল। জিজ্ঞাসা উকি দেয়,  
ফেরেশ্তা কি এমনি হয়? এমনি জোতিমৰু? আরো মনে হয় গুদের শরীর থেকে  
কেহন একটা গুরু আসছে। অপার্থিব গুরু। সেই যোহিনী গুরু বুড়িকে পাগল করে  
দেয়। ছেলে দুটোর হ্যাত উঠিয়ে নাকের কাছে নিয়ে উঁকে দেখে। না কোন বিশেষ  
জ্ঞানগা থেকে নয়। চারদিক থেকে একটা অস্তুত গুরু ভেসে আসছে।

- কি চাচি? কাদের আর হফিজ অবাক হয়।

- কিছু না। দোয়া করি- দোয়া করি।

বুড়ির ঠোট কাঁপে। আর কিছু বলতে পারে না।

- যাই চাচি। শুকে বল বাখবেন। আপনার কিছু ভয় নাই। সহয় সুযোগ মতো  
আমরা আসব আপনার কাছে। কোন দরকার হলে বাবাকে বলবেন।

আধারের পায়ে মিলেমিশে ছেলে দুটো চলে যায়। বুড়ির মনে হলো ওর চারপাশে  
এখন আর কোন আধার নেই। দু'হ্যাতে আলো ছড়াতে ছড়াতে ওরা ফেরেশ্তার মতো  
চলে গেলো। ওরা এখন অর্পণ সঙ্কামে বাস্ত। বুড়িকে নকুল করে বেঁচে থাকার সাহস  
দিয়ে গেলো। মনে হয় এখন আর ওর তেমন ভয় করছে না। সমস্ত ভয় ধানের ঝুঁড়োর  
মতো খেঁড়ে ফেলে দিল। ওরা তলে যাবার পর নিশ্চিন্তে ঘূম তুলে ওর। নিষ্ঠান্বয় করে  
কলেগো দূরে গুলির শব্দ। এখন নিরিষ্ট ভাবনায় হলু হয়ে বুড়ি প্রার্থনা করে, আস্তা আরো

মানুষ দাও। সাহসী বেপরোয়া মানুষ দাও। বানে-ভোবা হলদী গায়ের মতো মানুষের  
বানে ভাসিয়ে দাও আমাদের।

বুড়ি আবার নিঃসঙ্গ হয়ে পড়ে। কাদের হাফিজের সঙ্গে কথা বলে তবু কিছুটা  
সময় কাটতো। এখন কথার জন্যে ব্যাকুল হয়ে ওঠে। অসহ্য নীরবতাকে চিরে  
দুটুকরো করে ফেলতে ইচ্ছে করে। মনে পড়ে রমিজার মাছ-কাটা বিটির কথা। খুব  
ধারালো ছিল বিটিটা। পৌঁচ দিলেই কচ করে কেটে যেতো। কিন্তু নীরবতাকে কি কাটা  
যায়? নীরবতা কেনো ঘাছের মতো একটা জীবন্ত কিছু নয়? কূটুম্ব পারি আর ডাকে না।  
অথবা ডাকলেও বুড়ির মাথায় তা তেমন করে ঢোকে না। হঠাতে করে দু'একটা শালিক  
কিছিকিছি করে ওঠে রান্নাঘরের চালের ওপর। ওর মনে হয় অলৌকিক কষ্টস্বরের মতো।  
কে যেন অলিখিত ভাষায় ভীষণ কিছু পাঠ করে যাচ্ছে। বুড়ি তা বুঝতে পারছে না।  
অথচ এ শব্দটুকুর জন্যে যেন কতো কালের প্রতীক্ষা বুড়ির। দূরে ঘৰন কোথাও বোমা  
ফাটে, ঘৰন পুল ভেঙে যায় তখন বুড়ির নিষ্কাস স্মৃত হয়। এই শব্দগুলো মনে হয় নিজের  
অঙ্গিদ্বের চাইতে বেশি, খাস-প্রশাসের চেয়েও মূল্যবান।

তিন-চারদিন পর দক্ষিণ দিকের ঘরের ছেলেটি এসে বুড়ির পায়ে হাত দিয়ে  
সালাম করে।

- খালা দোয়া কর মুক্তিবাহিনীতে যাচ্ছি।

বুড়ি দোয়া করে। হাসিমুখে বিদায় দেয়। মনে মনে আশ্রম্ভ হয়। এক দুই করে  
অনেক ছেলে চলে গেছে। আঢ়া বুড়ির কথা বলছে। আঢ়া বুড়িকে মানুষ দিয়েছে।  
স্নেতের মতো শুরু আসছে। চারপাশের ছেলেগুলোর ভেতর এতো তেজ ছিল তা  
একবারও টের পেলো না কেনো? তাহলে বুড়ির উপলক্ষিতে কোথাও কি কোন ফাঁক  
ছিল? দৃশ্য ভঙ্গিতে চলে যাওয়া ছেলেটির গমন পথের দিকে তাকিয়ে থাকে। ও পিছু  
তাকায় না। কোনদিকে খেয়াল করে না। সামনে লাঙ্ঘ করে এগিয়ে যাচ্ছে। পুরো  
হলদী পী এখন এই ছেলেগুলোর শক্তির ওপর ভর করে দাঁড়িয়ে আছে। ওদের কাছে  
নিজেকে খুব তুঁজ মনে হয় বুড়ির। বুড়ি কোন কাজেই আসে না। ওদের মতো অহন  
করে ছুটি বেরিয়ে পড়তে পারে না। ওর শক্তি নেই, সে বয়সও নেই। অথচ বুড়ি কাজ  
চায়। হলদী পী-র জন্যে কিছু করতে চায়। হলদী পী-যে বুড়ির প্রাপের চাইতেও খ্রিয়।

মনে হয় নীতাও একটা কিছু করছে। অস্তুত গানে গানে মন্ত্র ছড়াচ্ছে। ওর পানের  
গলা এখন বোমা হয়ে অস্বীকৃত সোকের পুল দূম করে ফাটিয়ে দিয়েছে। নীতা  
কাজ পেয়ে ঘৃণন হয়েছে। আব বুড়ি! পরাক্ষণে চোখ পড়ে বইসের দিকে। সতেরো  
বছর বয়স ওর। দেহটা বেশ সুস্থাম। ওর বেড়ে ওঠাতে কোন ফাঁক নেই। কোন  
ঘাটতিও নেই। কিন্তু ওর মুখ দিয়ে লালা পড়ছে। ও বাম হাত দিয়ে একটা যাছি  
তাড়াবার চেষ্টা করছে। বারান্দায় পা ঝুলিয়ে বসে পা দোলাচ্ছে। চারদিকে বোকার  
মতো তাকাচ্ছে, কথামো হাতজালি দিয়ে হাসছে।

বুড়ি উঠোনে দাঁড়িয়ে ওর দিকে তাকিয়ে থাকে। কি হবে এই ছেলে দিয়ে? ও  
ভাইয়ের মৃত্যুকে উপলক্ষ করতে পারেনি। দেশ জুড়ে যে এত বড় ঘটনা ঘটে যাচ্ছে  
তার সঙ্গে ওর কোন যোগ নেই। পৃথিবীর সব ঘটনা থেকে বিজিজ্ঞ। বুড়ির ভীষণ কানু  
হাতের নদী ঝেনেত

গেলো। ও তো পারতো ভাইয়ের মৃত্যুর প্রতিশোধ নিতে। ও তো পারতো জনমুক্তের অশীলার হতে। মৃত্যুবাহিনীর একজন হয়ে বেপরোয়া যোদ্ধা মানুষ হতে। বুড়ির চকিতে মনে হলো এ ছেলের বৈচে থেকে কি লাভ? এ ছেলে না আকলেই ভাল। প্রতি মৃহৃষ্টে এভোবড় একটি ছেলের অসহায় পঙ্কজ বুড়িকে যন্ত্রণার নরকে দণ্ড করে। পর মৃহৃষ্টে ঘন ছটফটিয়ে গঠে। দৌড়ে আসে বারান্দায়। রইসের মাথা বুকে জড়িয়ে ধরে। চোরের পানিতে ভিজিয়ে দেয় মাথা, নাক, গাল। রইস বিরক্ত হয়। বুড়িকে হাত নিয়ে সরিয়ে দেয়। ঠেলে ঘেলতে চায়। বুড়ি তবুও যখন ছাড়ে না তখন ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে নিচে নেমে যায়। যেন আয়ের এ ধরনের আচরণ সহ্য করতে রাখি নয়। ও কাচারীঘরের দিকে ঝটিলে থাকে। অকারণে হাসগুলো তাঢ়ায়। বাবার পিঠো দু'বা বসিয়ে দেয়। বুড়ি ওর ওপর রাগ করতে পারে না। ওর ওপর রাগ করলে সেটা নিজের ওপর এসে পড়ে। কষ্ট হয়। কলীমের মৃত্যু কঠিন হয়ে বিধে থাকে হৃৎপিণ্ডে। কয়েকজন দানব আকারের মানুষের জ্বায় বুড়িকে গ্রাস করে। ক্ষণিকের জন্য ওর নড়ে পঠার ক্ষমতা রোধ হয়ে যায়।

কদিন পর কাদের আর হাফিজের বাবা রমজান আলীকে ধরে নিয়ে গেলো মিলিটারি। দু'তিন দিন চাপা ছিল ঘৰুটা। কিন্তু বেশিদিন বাবা গেলো না। কিন্তব্যে দেন জানতে পারে ওরা। তাই মারমুখী হয়ে ছুটে এসেছে। ওরা মারপিট করলো বাড়ির লোকলোর। বুড়ির ভাগ্য ভাল যে ওর ধরে আসেনি। কলীমকে মেরে যাবার পর ওরা আর ধরে ঢোকেনি। ও ঘরে বসে তনেছে পুরুষদের আর্টিলিয়ারি, মেয়েদের কান্না, ছেটিদের হৈটে। বুড়ি তবু বসে বসে আল্লার কাছে তার নিজস্ব প্রার্থনা করেছে। মানুষ দাও। মানুষ দাও। ওরা চলে যাবার পর সমস্ত বাড়িটা নিয়ুম হয়ে গেলো বুড়ির চকিতে হনে হয়, কে এ কাজটা করলো? ও কি একবারও বুঝতে পারেনি যে বিশ্বাসঘাতকতা ও নিজের সঙ্গেই করলো? করলো নিজের পায়ের তলার মাটির সঙ্গে। এ মাটির রক্ত যে ঢেলে না সে আটিতে পা রাখার অধিকার তার নেই। বুড়ির ইচ্ছে করে সে বিশ্বাসঘাতকের টুটি ঢেলে ধরতে। ঘনসূরের কথা মনে হচ্ছেই রক্ত ছলকে গঠে। সলীমের কথা ও-ই বলেছিল। দু'বিন আগে জলপাই গাছের নিচে দাঢ়িয়ে ঘনসূর ওকে জিজেস করেছিল, রমজান আলীর ছেলে দুটাকে আর দেখছি না যে?

- ওদের নানাবাড়ি গেছে।
- তাই সাকি?
- হ্যাঁ, ওদের নানার খুব অসুখ।
- ওদের মা গেলো না?
- ওদের মা'র তো শরীর আরাপ। তবা মাস যে।
- অ।
- ঘনসূর হেসেছিল?
- তোমার এতো খোজে দরকার কি বাপু?
- না, এমনি।

মনসুর আর দাঁড়ায়নি। হন্হন করে মেঠো পথে নেমে গিয়েছিল। ওর কালো ছাতি অনেক দূরে মিলিয়ে যাবার পরও বুড়ির মনে হয়নি যে মনসুর কথাটা আদৌ বিশ্বাস করেনি। উল্টো আরো সাতকাহন গেয়ে লাগিয়েছিল। এখন বুড়ি নিজের উত্তেজনা চেপে রাখতে পারে না। মনসুর তুই একটা বেজন্যা। তোর মা-বাপের জন্মেরও ঠিক নাই। তুই যাদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছিস ওরা তোর কে? তুই ভুলে গেলি তোর চৌদ্দ পুরুষের ভিটেমাটির কথা? তোর সঙ্গে একই জলহাওয়ায় বেড়ে ওঠা মানুষগুলোর কথা! এ মাটি এখনো তোকে ছুড়ে ফেলে দেয় না কেন মনসুর!

বুড়ি আরো শক্ত কথা বলতে চায়। কিন্তু যুৎসই কিছু মুখে আসে না। শুধু ক্রোধ বাড়ে— ঘৃণা বাড়ে। বুড়ির মুখে কথা আসে না। শুধু ক্রোধ বাড়ে আর ঘৃণা বাড়ে। শুধু ক্রোধ আর ঘৃণা। শেষে আর একবার মুখ খোলে, মনসুর তোর আর আমার ভাষা এক, মাটি এক এ লজ্জায় আমি বাঁচি না যে! ও সুপোরি বাগানের নিরিবিলি ছায়ায় আসে। কলীমের কবরের কাছে এসে দাঁড়ায়। জায়গাটা বড় শ্যামল শীতল। বুড়ির ভীষণ প্রিয়। এখানে এলে ও নিজের দৃশ্যের কথা ভুলতে পারে। তখন ওর সাহস বাড়ে। বুকের দিগন্ত প্রসারিত হয়ে যায়। মহাসমুদ্রের মত অনবরত গর্জনে উন্ম্যাতাল হয়ে ওঠে বুড়ির হৃৎপিণ্ড।

পরদিন রমজান আলী ফিরে এল। গায়ে জুর। সারা শরীরে ব্যথা। মারের চোটে কাহিল হয়ে পড়েছে বেচারা। বিছানা থেকে উঠতে পারে না। বুড়ি দেখতে গিয়েছিল। ওকে দেখে রমজান আলী কিছু বলেনি। ফুপিয়ে ফুপিয়ে কেঁদেছিল। বুড়ি অনেকক্ষণ চূপচাপ বসে থাকে। রমজান আলীর বৌ গায়ে তেল মালিশ করে দেয়। ও উঠে যেতেই বুড়ি কাছে আসে।

— রমজান ভাই কট্টা মনে না গায়ে?

— গায়ে।

রমজান আলী স্থির কষ্টে বলে।

— ওরা একটা ভাল কাজে গেছে রমজান ভাই।

— সে আমি জানি।

— ওদের তুমি দোয়া করো।

এতক্ষণে রমজান আলী সামান্য হাসে।

— রইসের মা কলীম গেছে তবু তুমি ভাঙ্গি।

বুড়ি কথা না বাড়িয়ে নিঃশব্দে সরে আসে। কাদের আর হাফিজ চলে যাওয়ার দর্দন রমজান আলী মার খেয়েছে। এজন্যে ওর মনে কোন কষ্ট নেই দেখে বুড়ি আশ্রিত হয়। এটুকুই চেয়েছিল। যত কষ্টই হোক সইতে হবে। ওদের যাওয়ার পথ খুলে রাখতে হবে। সেটা বক্ষ হতে দেয়া যাবে না।

গোয়াল থেকে গরু বের করে এনে বুড়ি বাঁশবনে এসে বসে। অনেকদিন পর আজ গরুটা ছেড়ে দেয়। একটু উচুকষ্টেই বলে, তুই আজ তোর খুশি মত চরে বেড়া। তোকে আজ বাঁধবো না। বুড়ি লটকন গাছের ঝঁঢিতে হেলান দেয়। রমজান আলীকে মনে মনে শ্রদ্ধা জানায়। মার খেয়েছে তবু বলেনি যে ওরা কোথায় গেছে। শুধু ওরা হাঙ্গর নদী ফ্রেনেড

দুইজন অঙ্গম মা ছেলে হলদী গী-র জন্যে কিছু করতে পারছে না। পোটা গী জুড়ে তোলপাড় হয়ে বয়ে যায় ঘটনা। কত নিষ্ঠানতৃন খবর আসে। খবর আসে যুক্তের। ছেলেদের কৃতিত্বের! খবর আসে দানব হত্যার। কখনো কোন প্রিয় মুক্তিযোক্তার মৃত্যুর। শব্দ আসে মেশিনগানের ত্রাসফায়ারের। প্রচণ্ড শব্দে ফেটে যাওয়া ডিনামাইটের, বোমার। মাঝে মাঝে ইচ্ছে করে ছেলেদের হাতের রাইফেল হয়ে যেতে, ডিনামাইট হয়ে যেতে, বোমা হয়ে যেতে। এই বকম প্রচণ্ড শব্দে ফেটে গিয়ে যদি একটা পুল উড়িয়ে দিতে পারতো? পারতো যদি মিলিটারি ক্যাম্প খৎস করে দিতে? অসংখ্য মৃত সৈনিকের বুকের ওপর দিয়ে কোড়ো হাওয়ার মত বয়ে যেতে? মাঝে মাঝে হয় যে একটা মেশিনগান হয়ে গেছে। ছেলেদের কাঁধে সওয়ার হয়ে কখনো ছুটে যাচ্ছে। কখনো পিঠের ওপর চড়ে বুকে-হাঁটা ছেলেদের সঙ্গী হয়ে নির্দিষ্ট লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। হাতের অঙ্গকারে পাট ক্ষেত্রে তয়ে পিচিশ বছরের দুর্বাসা ছেলেটির স্বাধীনতার স্থপু হয়ে গেছে। বুড়ির ইচ্ছে করে সেই মৌবন ফিরে পেতে। সেই আশ্চর্য যৌবন যা নিয়ে আকাঙ্ক্ষার বন্ধনে নাগালে পাওয়ার জন্যে দুর্বিনীত হওয়া যায়। মাঝে মাঝে শিরশির করে উঠে বুড়ির অনুভূতি। কে যেন ওর গা ছুঁয়ে ভয়ানক শপথ করছে। কারা যেন বুড়ির বুকের ওপর দিয়ে হেঁটে চলে যাচ্ছে। আর তখনই নাড়িতে গেঁথে থাকা কষ্ট মোচড় দিয়ে ওঠে। গুরুটা নিজের কাছে ফিরে পাবার জন্যে ব্যাকুল হয়। ও দ্রুত চলতে গিয়ে বাঁশের মুখায় হোঁচট যায়। বুড়ো আঙুলের নখ উচ্চে যায়। রাঙাক পা চেপে বুড়ি বসে পড়ে। হাতের কাছে শিয়ালমুখার পাতা ছিল। চিবিয়ে লাগিয়ে দেয়ে। ব্যাথায় টনটন করে। পা টেনে উঠে দাঢ়ায় বুড়ি। গুরুটা কাছেই ছিল, বেশিদূর যায়নি। দড়িটা হাতের মুঠোয় ধরে ঘরে ফিরে আসে। কোনরকমে ওটাকে সজনে গাছের সঙ্গে বেঁধে বারান্দায় চাটাইয়ের ওপর তয়ে পড়ে।

মাথা কেমন জানি করছে। বাথা বাড়তেই থাকে। হঠাত মনে হয় কষ্টটা ওর ভালই লাগছে। উপলক্ষ করলো কখনো নিজের শরীরের ব্যাথা যন্ত্রণার বদলে আনন্দ হয়। নইলে তরুণ টগবাগে ছেলেগুলো গুলী খেয়েও হাসিমুখে মরতে পারতো না। ওদের বুকের সুবভরা পরুদীঘি স্বাধীনতার ধৈ-ধৈ জলে উঠাল হয়। বুড়ি রইসের দিকে তাকায়। ও আপন মনে হাসছে। রইস ওদের কানো মত নয়। ওর বুকে স্বাধীনতার পদ্মদীঘি নেই। পরের গকে মাতাল হয়ে ও নির্দিষ্ট লক্ষ্যের দিকে দুর্মনীয় রোধে ছুটে যায় না। ওর মুখের দিকে চেয়ে বুড়িকে এক অপরাধবোধে পোয়ে বসে। মনে হয় হলদী গী ওদের চায় না। ওরা হলদী গী-র জন্যে কিছুই করতে পারছে না, ওরা মা ছেলে কেবল যায় আর ঘুমোয়। আর কোন কাজ নেই। হলদী গী-র জন্যে ওদের যত ভালবাসাই থাকুক না কেন সব অর্থহীন। কলীম মরে গেছে, সলীম যুক্ত করছে। বুড়ির মনে হয় এটুকুই যথেষ্ট নয়। কিছু করা দরকার। আরো বড় কিছু। অনেক বড় ত্যাগ। এই যুক্তরত ছেলেগুলোর মত প্রাণের মায়া তুচ্ছ করা ত্যাগ। নিঃস্বার্থভাবে ছুটে গিয়ে বুক পেতে দেয়া। ঘুরে ফিরে আবার ভাবনা এসে আক্রমণ করে। হলদী গী বুঝি ঘৃণা করছে। অকেজো, অকর্মণ্য বলে ঘৃণা। এই বাঁশবন, খালের ধার, শিমুলতলা, সেটশনের রাস্তা সবখান থেকে ঘৃণার ধূলো উড়ছে। সমস্ত শরীর ধূলোয় ধূসরিত। বিশ্বী নোংরা

চারদিকে। বুড়ির শরীর কেমন করে। নথের বাধা ভুলে দিয়ে উঠে বসে। রইস উঠোনে নেমে গেছে, বাধার পাশে বসে ওর লেজ নিয়ে নাড়াচাড়া করছে।

‘ব্যবর আসে অনেক। যুক্ত জোর বাড়তে থাকে।’ রমজান আলীর ঘরে বসে কখনো চুপি চুপি স্থাবীন বাংলা বেতারের অনুষ্ঠান শোনে ওরা। বুক ভরে ওঠে গর্বে, আনন্দে। রমজান আলী ‘চৱম পত্ৰ’ শোনার জন্যে উন্মুখ থাকে। বুড়ি সব কথা বুঝতে পারে না। তবু শুনতে ভাল লাগে। কি যেন যাদু আছে এসব কথায়। ইদামীং দিনের বেলাও গুলি-গোলার শব্দ ভেসে আসে। একে দুয়ো গীয়ের অনেক ছেলে চলে গেছে। মনসুরের মত শান্তি কমিটির চেয়ারম্যানের ভয়ে ওরা মুখে বুঝো আঙুল পুরে চুপ করে বসে থাকেনি। মনসুরের মত লোকদের বুকের জ্বালা বাঢ়িয়েছে। বুড়ির মনে হয় মনসুররা আর কয়জন? ওদের সংখ্যা হাতে গোনা যায়। কিন্তু সলীমরা অনেক। সলীম একটি ছেলেকে দিয়ে ব্যবর পাঠিয়েছে। ও ভাল আছে। মাকে নির্ভীবনায় ধোকাতে বলেছে। মায়ের কাছে অনেক ভালবাসা জানিয়েছে। আরো বলেছে, একদিন ও স্থাবীন দেশের ছেলে হয়ে মার সামনে এসে দাঁড়াবে। বুড়ির চোখে পানি আসে। আনন্দ হয়। সলীম যুক্ত করছে। এমন ছেলেই তো চেয়েছিল। অহংকারে মাথা উঁচু করে বিজয়ীর বেশে যে এসে দাঁড়াবে ওর সামনে। তখুন কলীমের নিরপায় মৃত্যু ভুলতে পারে না। ও কোন সুযোগ পায়নি। সুযোগ পেলে প্রতিশোধ নিয়ে মরতো। তবু নাড়িতে গেঁথে থাকা কষ্ট এখন আর তেমন কাঁদায় না। সাহস ভেঙে দেয় না। বুড়ির মনে জোর ফিরে আসে।

মাঝে মাঝে গুলির শব্দে বুড়ির অসহ্য মীরবতা চনমনে ভরপুর হয়ে ওঠে। জল ছুপছুপ নদীর মত মনে হয় নিজেকে। যে নদী কানায় কানায় ভরা। যে নদীর মাঝে কোন চর পড়েনি। বাঁশবনের মাথার উপর দিয়ে সাদা বক উড়ে যায়। শরতের আকাশ উজ্জ্বল নীল। বুড়ি খালের ধারে যায়। খালপাড়ের সাদা কাশফুল দেখে। কাশফুল ভুলোর মত ধৰধরে নয়। ওর মধ্যে অন্য রক্তের আভা আছে। মনে হয় ভুলোই ভালো। শিমুলের ভালে কিটির-মিটির করে চড়ুইয়ের ঝাঁক। কখনো খাকী পোশাক-পোক লোকগুলো রাইফেল কাঁধে ঘুরে বেড়ায়। বুড়ির আর ভয় করে না। ওরাও ওকে কিছু বলে না। বুড়ি ভাবে, ওরা ওকে আমল দেয় না। ওদের শক্তির মধ্যেই গণ্য করে না। বুড়ি ভিমার শাক খুঁটতে খুঁটতে হাসে। ওরা বুঝতে পারে না বুড়ি বুকের মধ্যে কি বিরাট এক আগনের পিণ সাজিয়ে রেখেছে। মুহূর্তে গোটা দপ্ত করে জ্বলে উঠতে পারে। ভিন্নদেশী দানবগুলো কখনো দেখেনি যে শুকনো বাঁশপাতা কেমন দাউ দাউ করে জ্বলতে পারে। নদীনালা খাল-বিল জলাভূমির দেশ হলোও এর চরিত্রে পাথুরে কাঠিন্য আছে। মানুষগুলো কেবল স্যান্ডসেই জলাশয় নয়। সেখানে আগনের সঙ্গে একটা সহজাত সম্পর্ক আছে।

আজকাল কেবলই ইচ্ছে করে রামজার মাছ-কাটা বিটিটা দিয়ে সব কচু-কাটা করে ফেলতে। তখন অনেক রক্তের কথা মনে হয়। রামজার মাছ-কাটা বিটির গা বেয়ে তাজা ফটফটে মাছের রক্তের স্বোত নামে। কলীমের রক্তের রেখা মাটির বুকে কথে যায়। মার-খাওয়া রমজান আলীর পিঠে রক্তের দাগ শুকিয়ে কালো হয়ে থাকে। জবাই করা

কবুতরটা বুড়ির উঠোনে লাফায়। ওর পায়ের আঙ্গুল উপড়ে গিয়ে রক্ত ছুটতে থাকে। বুড়ির মনে হয় কোন ঘটনাই বিচ্ছিন্ন নয়।

হলদী গাঁ-র শরৎ এবার অন্য রকম। ওর মনের রঙের মত বদলে গেছে ঝুতু। ভরদুপুর বিমোয় না। পড়স্ত বিকেল ক্রান্ত না। রাতের আঁধার বাকুদের গক্ষের মৌতাতে মাতাল। হলদী গাঁ-র নিশ্চিত রাত কবে ফুরিয়ে গেছে। যি যি ডাকা, জোনাক-জুলা রাতগুলো এখন ফুটফট ফাটে। তঙ্গ কড়াইয়ে খই ফোটার মত ফেটে ছিটকে ওঠে। রাতের হাদিস খুঁজতে খুঁজতে বুড়ির চোখ এখন উৎসবহীন জেগে থাকে না। মনে হয় রাতগুলো এখন পাখা মেলে উড়ে যায়। শুধু আঁধারে নিঃশেষ হয় না। ওর জন্যে এক টুকরো সলতের আলো জুলে রাখে। সে আলোর রেখা ধরে ও হলদী গাঁয়ের সীমানা পেরিয়ে যায়। অনেকের সঙ্গে মিলেমিশে যেতে পরে। যত্নণা পাশে রেখে বুকের পদ্মাদীঘি ভেসে ওঠে।

বুড়ির খোপের মোরগুলো যেন এখন অন্যস্বরে ভোরের কথা ঘোষণা করে। ও বিছানায় শুয়ে শোনে। রইসের গায়ে কাঁথা টেনে দেয়। ওর জন্যে বুকের ভেতর মমতা উঠলে উঠে। এখন রইস বুড়ির অনেক কাছের। রক্তের মধ্যে রইসের উত্তাপ। প্রতি রোমকৃপে রইসের নিঃশ্বাস। ওর মুখ থেকে বারে পড়া লালা বুড়ির চেতনার এছি নিবিড় করে। অনেক দূরে ফেটে-পড়া পুলের শব্দ ওর হৃদয়ে জেগে থাকে। বুড়ি বোঝে না কেন ছেলেটা এমন করে টানছে! ওকে যত্ন করতে ভাল লাগে। গোসল শেষে চুল আঁচড়ে দিতে ভাল লাগে। ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ভাত খাওয়া দেখতে ভাল লাগে। হাঁ করে ঘুমিয়ে থাকা চেহারাটা বুড়ির চোখে অপরূপ। রইস যেন নতুন করে আবার বুড়ির কোলে ফিরে এসেছে। ওর শৈশবের দিনগুলোয় বিস্ময়, আনন্দ, উচ্ছাস, নতুন মাতৃত্বের স্বাদ যেমন বুড়িকে মাতিয়ে রাখতো এখনো ঠিক তেমন লাগে। রইসও বুড়িকে তেমন করে আঁকড়ে ধরেছে। ও প্রায়ই রইসকে সঙ্গে নিয়ে বের হয়। ও সঙ্গে থাকলে বুড়ির অনুভূতি পাল্টে যায়। মনে হয় আছে, আমারও কেউ আছে। এমনি একটা বোধ ওকে ঘিরে থাকে। ও অসহায় হয় না কিংবা দারুণ এককিত্ত বিমর্শ করে রাখে না। খাকি পোশাক পরা লোকগুলোর সৈনিক চেহারা মুছে যায়। বুড়ির হলদী গাঁতার নিজস্ব চেহারায় ওর সামনে দাঁড়িয়ে থাকে। যেন এখানে কোন ভিন্নদেশীর আক্রমণ নেই, মৃত্যু নেই, রক্ত নেই, কান্না নেই। বুড়ির বুক চেপে আসে। আসলে তা নয়, শরতের হলদী গাঁ আশ্বিনের শিশির গায়ে মেখে দুপুর রাতের ছেলেগুলোর স্বপ্ন হয়ে যায়। বুড়িও সে স্বপ্নের অংশীদার।

কখনো কখনো বুড়ি রইসের সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করে।

- ও রইস, রইস তোর খুব কষ্ট না রে? তোর বুকে অনেক কথা, মুখে নেই। তুই কথা বলতে পারিস না। আমারও অনেক কষ্ট, আমি যুক্ত করতে পারি না।

বোবা রইস হাঁ করে মাঁ'র মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে।

- কি দেখছিস কি? কথা বলার জন্যে বুকটা ফেটে যাচ্ছে তো? হ্যা, আমারও এমনি হয়। কাউকে কিছু বোঝাতে পারি না। তুই যেমন আমিও তেমন। আমিও তোর মত হাবা বোবা অকেজো। হলদী গাঁর জন্যে কিছু করতে পারলাম না।

রইস গো গো শব্দ করে। মা'র হাত ধরে টানাটানি করে। পথে পথে দাঁড়াতে ওর ভাললাগে না। বাড়ি যাবার জন্যে তাগাদা দেয়। বুড়ি শিমুলতলা ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়। পথ-ঘাট তকনো খটখটে। বাতাসে হিম হিম ভাব। কার্তিকের তক হয়েছে। শিমের মাচায় বেগুনি ফুল ঝাকঝাক করে। রইস একটা কঞ্চি দিয়ে ঘাস লতাপাতা খোচাতে খোচাতে পথ চলে। হাঁচ করে বয়ে যাওয়া উত্তরে বাতাসের দিকে মুখ করে দাঁড়ায় বুড়ি। বাতাসটা গায়ে মেঝে নিয়ে বলে, শীত আসছে রে রইস। শীতের রাতে ছেলেগুলোর বড় কষ্ট হবে। কেমন করে যে কি করবে ভেবে পাই না।

রইস বুড়িকে ছেড়ে অনেকটা এগিয়ে যায়। ও বাড়ির কাছাকাছি চলে গেছে। বুড়ি দাঁড়িয়ে শিমের বেগুনি ফুল দেখে। মাচার ওপর ফিঙে ঘোলে। ক্ষেতে লাল শাকও হয়েছে পুরু। ওর মন কেমন করে। কলীম লাল শাক খুব পছন্দ করত। রইস হওয়ার আগে কলীম ওর সঙ্গী ছিল। বুড়ির হাত ধরে লাল শাক তুলতে যেত, বুড়ির সঙ্গে মারবেল খেলত। বড় হওয়ার পর বুড়ি খলুই জাল গুছিয়ে না দিলে মাছ ধরতে যেত না। বুড়ি তাড়াতাড়ি হেঁটে ঘরে চলে আসে। ভাত রাঁধতে হবে। রইসের কিধে পেয়েছে। আজ হাঁড়িতে পাস্তা ও নেই। বারান্দার ওপর খপ করে বসে পড়ে। চোখের সামনে সব কিছু আপসা হয়ে যায়। পানি চিক্কিট করে চোখের কিনারে। জল ধৈ-ধৈ নদী এখন চোখ দুটো, নদীর তীরে কাশবন। কাশবনে সাদা বক। সাদা বকের ধূধূবে পালক। বুড়ির মন এখন সাদা বকের ধূধূবে পালক।

রমিজা ঘৰৱ পাঠিয়েছে। ওরা ভাল আছে। ছেলেটা খুব হাশিখুশি হয়েছে। কান্নাকাটি নেই। সারাদিন ধূলোয় খেলে। কথা বলার চেষ্টা করে। রমিজা অনেক পিঠে দিয়েছে বুড়ির জন্যে। মাছ পাঠিয়েছে, তিম পাঠিয়েছে। কিন্তু পিঠে কে থাবে? পিঠে-পাগল সলীম তো আর নেই। প্রতিদিন এক একরকম পিঠে তৈরি হত সলীমের জন্যে। পিঠে না হলে ও রমিজাকে বকাবকি করত। বুড়িকেও ছাড়ত না। সলীম এখন যুক্ত করছে। পিঠে খাওয়ার কথা এখন আর ওর মনে নেই। বিরাট সুবের প্রত্যাশায় ওরা ছেটখাটো সব সুবের কথা ভুলে গেছে। বুড়ির মনে হল রমিজা কি সলীমকে মনে করে এত পিঠে পাঠিয়েছে? বেচারী! কোন ঘৰৱই পাচ্ছে না সলীমের। ও হয়ত ভাবছে, কোনদিন রাতের অক্ষকারে সলীম যদি চুপিচুপি ঘরে ফেরে? এখানে থাকতে রমিজা এই প্রত্যাশা করতো। এখানে থাকলে তবু ওর ভাল হতো। না হয়ত খুব ভাল হত না। কিইবা ভাল হতো। এখানে ঐ লালমুখো সৈনিকগুলো যেমন উৎপাত করে! কত লোক সরে গেল উন্নৰ থেকে দক্ষিণে। দক্ষিণের প্রত্যন্ত সীমানায়। বুড়ির বাড়ি থেকে সিকি মাইলের মধ্যে মিলিটারি ক্যাম্প। ওরা যখন যা খুশি তা করে। হটপুট করে এসে হাঁস-মুরগি-গরু-ছাগল যেমন নিয়ে যায়, তেমন ডবকা যেয়েরাও যায় রশি বেঁধে টেনে নেয়া ছাগলের মত চেঁচাতে চেঁচাতে। বুড়ি এই ভেবে নিজেকে সান্ত্বনা দেয় যে রমিজা দূরে আছে ভালই আছে। কলীমের মৃত্যু সহ্য হয়েছে। কিন্তু চোখের সামনে রমিজার কোন দুর্ঘটনা সহিবে না। ও ভাল ধাকুক। ভাল।

কার্তিকের হিম হিম ভাব আর নেই। ফিনফিনে নীল কুয়াশা গাঢ় হয়েছে। অঞ্চলের শেষ। আর দু'একদিন বাকি। জোর শীতের দাপট চারদিকে। মাচানের ওপরের

ঝাঁকঝাঁক বেগুনি ফুল সবুজ শিখ হয়ে গোছে। মাছরাঙ্গার শরীর চকচক করে। টুন্টুনি উড়ে বেড়ায়। দেখতে ভাল লাগে। দেখতে দেখতে মনে হয় সবসময় শীতকালে রইসের শরীর ভাল হয়। এবাবণও বেশ ছটপুট হয়েছে। মুখটা ভরা পুরুরের মত টলটলে। টানা বড় বড় ঢোখ জোড়া লাল শাপলার পাপড়ির মত। ও বেশ ছটফটে হয়েছে। কিম-ধরা ভাব নেই। ওকে দেখে বুড়ির দিন মুখৰ হয়ে গুঠে। বুকের দীঘি হৈ-হৈ আনন্দে বেসামাল হয়। ওর পরিবর্তন মনে করিয়ে দেয় যে ওর আধোও একটা মুখৰ প্রাণ আছে। কিন্তু আসলে ওর কোন ভাষা নেই। শীতে ও প্রাপ্তের জোয়ারে প্রাপ্তি হয়। বাহ্যিক আচরণে তা জানান দেয়। ও আরো দামাল হোক, চক্ষু হয়ে উঠুক। বুড়ি সারাঙ্গশ এই প্রার্থনা করে। রাত্রিবেলা ওর পাশে অয়ে থেকে ওর সঙ্গে অনেক কথা বলে। কখনো নিজের জীবনের গল্প করে। রইস ঘুমিয়ে গেলেও বুড়ি বলতে থাকে। বলতে একটুও ঝাঁকি নেই। সর্বত্র ছড়িয়ে থাকা অঞ্চলের কুয়াশার মত বুশির ফিলফিলে নীল পর্দা হয়ে থাকে মনটা।

সকাল থেকে তুমুল বৃষ্টি হচ্ছে। একদম আধাচে বৃষ্টির মত একটানা। ঘনকালো যেয আকাশে। চারদিক অঙ্গুকার করে নেমেছে। রইস উঠে পাঞ্চা থেয়ে আবার উয়েছে। বুড়ি ভিজে ভিজে হাস-মূরগির বৌয়াভ খুলেছে। পোয়াল পরিকার করেছে। গুরুকে খড়-ভূঁধি দিয়েছে। আর এসব করতে করতে বৃড়ির মনে অনেকদিনের পুরোনো এক গাম বায়বার গুলগুলিয়ে উঠেছে। বৃড়ির যে শ্রচণ শীত করছে একথা একবাবণও মনে হয় না। মাথার কাপড় ফেলে দিয়ে আঁচলটা নিংড়াতে নিংড়াতে বুড়ি ধখন বারান্দায় উঠে আসে তখন নীতা বৈরাগীয়ী চোকে। বুড়ি বিশয়ে আনন্দে চিৎকার করে গুঠে, সই?

নীতা কথা বলে না। ভিজে শরীর নিয়ে বারান্দার ওপর উঠে আসে।

- এহন ঝাড়-বাদল হাথায় করে কোথা থেকে এলি?

নীতা কথা বলে না। দুইহাতে মুখ ঢাকে।

- তুই কাঁদছিস সই? ঠাণ্ডা লেগে যাবে। আগে কাপড় ছেড়ে নে?

নীতার পেটিলটা আজ ওর সঙ্গে নেই। বুড়ি ঘর থেকে তুকনো কাপড় এনে দেয়।

- নে ভিজে কাপড় ছাড় আগে, তারপর তোর সব কথা শনব। আজ আমার হন শুশি শুশি, তোকে পেয়ে আরো ভাল লাগছে। বৃষ্টি ভরা এই নিনটা দুঁজনে গল্প করে কাটিয়ে দেব। কতদিন যে হন শুলে কথা বলার মানুষ পাইনি।

নীতা কাপড় ছাড়তে ছাড়তে হি হি করে কাঁপে। অনেকটা পথ ভিজতে ভিজতে এসেছে। ঠাণ্ডা ওর হাতিচর গায়ে লেগেছে। বুড়ি যালসায় করে কয়লা ধরিয়ে আনে।

- হাত-পা ওলো সেঁকে নে সই।

- আগে আমাকে ভাত দে। দু'দিন ধরে বুড়ি আর জাল ছাড়া কিছুই আইনি।

- পাঞ্চ আছে মরিচ পুড়িয়েছি। আগুন পোছাতে পোছাতে খাবি চল।

দুঁজনে ভাত-খায়। নীতার কিছু একটা হয়েছে বুড়ি তা বোবে। কিন্তু জিজেস করতে পারে না। তব হয়। এহন কিছু হয়তো তববে যে বুড়ির মন ভার হয়ে যাবে। সামাটা দিন খারাপ লাগবে।

- তোর এখানে আমি দুটো দিন থাকব সই।
- কি ভাগ্য! আগে তো ঘোটেও রাখতে পারিনি।
- নীতার চোখ দিয়ে জল গড়ায়।
- তৃতীয় থাকলে আমার ভালই লাগবে। একা একা আর দিন কাটে না।
- বুড়ি খেয়েদেয়ে চিকন সুপোরি কাটে। অনেকদিন পর ও চিকন সুপোরি কাটতে বসেছে। নীতা মালসার ওপর হাত পা গরম করে।
- বৃষ্টি তো নয় একদম হাড়-কাপানো সূচ।
- বুড়ি অন্যমনক্ষেত্র মত বলে, তোর অধিল বাউল কৈ সই?
- মরেছে।
- কি হয়েছিল?
- বুকে গুলি খেয়েছিল।
- সই!
- বুড়ি আঁশকে ওঠে।
- আমার আখড়া আর নাইরে সই, যেখানে আবি ফিরতে পারি। সব পুড়িয়ে জারখার করে দিয়েছে।
- বুড়ি তুক হয়ে থাকে। কথা বলতে পারে না। সুপোরি কাটাও হয় না। নীতা চোখে আঁচল চাপা দিয়েছে।
- কেন যে আমাদের আখড়া পুড়িয়ে দেয়া হলো, লোকগুলোকে গুলি করা হলো, বাকিদের ধরে নিয়ে গেল তার আমি কিছুই বুঝি না সই। তবু যদি ঐ ভিনদেশী কুকুরগুলা করতো তাও শ্রাগে সইতো। করেছে সব আমাদের জাত ভারেো। যাদের সঙ্গে আমাদের ওঠাবসা চলাফেৰো; এই লজ্জা আমি কোথায় রাখি সই? অধিল বাউল মরেছে সেই দুঃখের ঢাইতেও বেশি বাধে যে ওকে গুলি করেছে আলী আহমদ। কিসে যেন বুকটা কামড়ে ধরে। কারো সঙ্গে কথা কইতে পারি না। যারা এমন কাজ করলো ওদের সবাইকে আমরা ঠিনি। আমাদের মুখের ওপর ঘৃত দিয়ে বলেছিল, আমরা নাকি দেশের শক্তি। এই তনে অধিল বাউল গর্জে উঠেছিল, মিথ্যে কথা। মাটির সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করিনি। দেশের জন্যে গান লিখেছি।
- গান? হো হো করে হেসে উঠেছিল ছোড়াগুলো। বিশ্বাস কর সই ন্যাণ্টা অবস্থা থেকে ওদের আমি বড় হতে দেখেছি। যুদ্ধ লাগার আগেও ওরা আমাদের আখড়ায় আসতো গান শুনতে। দাত কিড়মিড় করে বলল, গান লিখেছো বাছাধন, ঘৃণ্ণ দেবনি, এইবার দেখ, এই নাও গান লেখার পুরস্কার।
- দুম করে যেরে দিল। জুটিয়ে পড়ল অধিল বাউল আর বাকিরা। কেউ আর কথা কইতে পারলো না। আবি হাউমাউ করে কেন্দে উঠতেই দুঘা দিয়ে ফেলে দিল। সুমমা, মালা, চম্পনা আর রাধাকে নিয়ে গেল।
- ওরা চিংকার করছিল। তনলো না। আবি চেয়ে চেয়ে দেখলাম। বুড়ো মানুষ ওদের সঙ্গে পারব কেন?

- কেবল বলতে ইচ্ছে করছিল, ওরে কতদিন রাত জেগে তোরা আমাদের গান শনেছিস। বলেছিস, তোমাদের গানের গলা বড় মিঠে গো। বলেছিস, তোমাদের এই জাহাগীটা বজ্জত শীতল। মনে হয় দিনবারাত তরে থেকে কাটিয়ে দি। ওরে তোরা এখন বলে যা আজ কি করে আমরা দেশের শঙ্খ হলাম। একথা তো তোরা আগে একদিনও বলিসনি? ওরা চলে যেতে বুকটা আমার পাথর হয়ে গেল সই। সব লাশগুলো টেনে টেনে নদীতে ভাসিয়ে দিলাম। ধরের আগুন তখনে নেজেনি। জুলছিল ধিকিধিকি। আমি গাছের নিচে দূরাত কাটিলাম। তারপর তোর কথা মনে হলো। তবু হলো বৃষ্টি। মানলাম না। বৃষ্টি মাথায় করতে চলে এলাম। বজ্জত শীত করছে মে সই।

- চল কাঁধা মুড়ি দিয়ে তরে পড়বি।

সেই শোয়াতে পনের দিন কাটিয়ে দিল নীতা। জুরে গা মেল পুড়ে যায়। বুড়ি কি করবে নিশে পায় না। পায়ের কবরেজ ভেকে শুধু দেয়। মাথায় পানি ঢালে। বেহুশ অবস্থা নীতার। যামে মানুষে টানটানির পর পনের দিনের মাথায় জুর ছাড়ে। দুর্বল শীগ কঠে বলে, সই আমার কি হয়েছিল?

- জুর।

বুড়ি হেসে ফেলে।

- হাসিস কেন? তোর এখানে ক'দিন কাটিলাম রে?

- এই তো দিন পনের।

- দিন পনেরো? নীতা অনেক কিছু স্মরণ করার চেষ্টা করে কিন্তু পারে না। মাথা আবার এলিয়ে দেয়। বুড়ি সাঙ্গ পরম করে এনে খাওয়ায় ধূরে বারান্দায় বসিয়ে দেয়। নীতা হলুদ নিষ্প্রত দৃষ্টি হেলে আকাশ দেখে। পাহুঁ-গাহুঁগিয়ির মাথার উপর সূর্যের আলো দেখে। কঠে গান ওন্দশনিয়ে উঠতে চায়। সম্যে কুলোয় না। বুড়ি এসে পাশে বসে। নীতার জন্যে ও পুরুর থেকে শিং মাছ ধরিয়েছে। থানকুনি পাতা লিয়ে তার খোল দেখেছে। আজ ওকে ভাত দেবে। বুড়ির মন বেজায় শুশি। নীতাকে ও বাঁচাতে পেরেছে।

- আজ তোকে ভাত দেব সই।

- ভাত থেকে ইচ্ছে করে না।

- ইচ্ছে না করলে কেমন হবে? গায়ে বল করতে হবে না?

- আর বল? নীতা কিকে হাসে। আমার সব বল ওরা কেড়ে নিয়েছে।

- বাজে কথা। তুই আবার বৈচে উঠেছিস সই। এ কটা দিন যে কেমন করে কেটেছে একমাত্র আঘাত জানে।

- তোর খুব কষ্ট হয়েছে না রে?

- মুক্ত কি যে বলিস?

নীতা চুপ করে থাকে।

- আমার দোতারাটা পুড়ে গেছে। অবিলেরাটা ও বুকে জড়িয়ে ধরেছিল। ছোড়াগুলো পায়ে মাঝিয়ে ভেঙে ফেলেছে।

নীতা ঘেন আপন মনেই কথা বলে ।

— যারা আমাদের পান ভালবাসতো তারা আমাদের শক্ত বলে কেন? আমরা কোন অপরাধে শক্ত হলাম? আমাদের যেমেনভলোকে নিয়ে যেতে গদের একটুও বাধলো না! এই বৃক্ষি গদের দেশশেষেয় ?

— তুই কেবল গদের কথা ভাবছিস কেন সই? গদের মত আমাদের আরো অনেক ছেলে আছে যারা যুক্ত করছে?

— যুক্ত? সই দেখিস দেশ একদিন স্বাধীন হবে ।

নীতা আবেগে উজেজনায় বৃক্ষির হাত চেপে ধরে ।

— তোর ছেলে যুক্ত শেষে স্বাধীন দেশে ফিরে আসবে । কিন্তু তখন আমি কোথায় যাব? আমার ঘর নাই, মানুষ নাই, কেউ নাই । এই হলদী পী ছেড়ে আমার কোথাও যেতে মন চায় না রে সই ।

— এখন এসব কথা থাক । তুই আপে সুন্দর হয়ে নে ।

— তোর ছেলে ফিরে এলে গুকে বলবি গায়ের মাথায় আমাকে একটা ঢালা তুলে দিতে । যে কটা দিন বাঁচি ভিজে করে দিন কাটিয়ে দেব । এই পী ছেড়ে অন্য আবক্ষায় আমি যাব না রে সই ।

নীতা হ হ করে কেন্দে ফেলে ।

— এখন তুই আমার কাছে থাকবি । আমি একলা একলা থাকি তোকে পেরে আমার কি যে ভরসা হচ্ছে । তোকে আমি ছাড়ছি না ।

— শরীরের যা অবস্থা! ইচ্ছিকেই তো পারি না । যাব আর কোন চূলোয় ।

নীতা অন্যদিকে তাকিয়ে কথা বলে ।

— যাই তোর ভাত নিয়ে আসি ।

বৃক্ষি নীতার কান্না দেখতে চায় না । ওর সামনে থেকে উঠে পড়ে । নীতা ঝরেব ঘোরে বলতো, আমরা পথঘাটের মানুষ । ঘরের যায়া নেই । তবু বুকটা এখন হ হ করে পোড়ে কেন বলতো সই? শান্তি কথিতির নামে গুরা কত ভাত্যেদের মারলো, ঘন পোড়ালো, যা বোনের সন্তুষ্ণ নিলো— গুরা এই মাটিয়ে শক্ত নয়, হপাম আয়বা!

বৃক্ষি ভাত বাঢ়তে দিয়ে দুরকে যায় । নীতার সব গেছে তাতে গুর দুর্ব নেই । গুর বুক থাক হয়ে যাচ্ছে আলী আহমদের ঐ একটা কথায় । ঐ কথায় ওর সারা জীবনের ভিত নড়ে উঠেছে । অথচ দুর্ব নেই আলী আহমদের । ওরা নির্বিবালে দেশের শরণের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে । বইস এসে রান্নাঘরে দোকে । ইশারায় কিধের কথা বলে । বৃক্ষি তাঢ়াতাঢ়ি কাটোর চামচ নিয়ে ভাত গুঠায় ।

নীতা এখন একদম ঘর থেকে বের হয় না । একদিকে তব অন্যদিকে শারীরিক দুর্বলতা । গুলি, মৃত্যু, আশুল নীতার সব সাহস ভঙিয়ে নিয়ে গেছে । ওর কঠের পান এখন বৃক্ষির ঘরের দেয়াল পেরোয় না । মুখে ছাপি নেই । নীতা স্থুরির হয়ে গেছে ।

— তুই এখন ভেঙে পড়লি কেন সই?

— এক মৃত্যু আমি কখন দেখিনি রে । নীতা আনন্দন হয়ে বলে ।

- আমিও কি দেখেছিলাম।

বুড়ির কষ্টও খানে মেমে যায়। তবু এর সঙ্গেই মুচারটে কথা বলে বুড়ির সঙ্গে ভালই কাটে। মনসুর একদিন বাশবাগানে বুড়ির পথ আগলে দাঢ়ায়, কি গো রইসের মা বৈরাপিণীটা নাকি জোমার এখানে এসে ঝুটেছে?

- ঝুটলো তৈ! একা একা খাকি তো তাই আমিই কটা দিন রেখে দিলাম। ও তো রোজই চলে যেতে চায়। বুঝো যানুষ আমারই বা ভবসা কি বল?

- না বাপু ওকে তাড়াতাড়ি বিদায় কর নইলে জোমারই আবার বিপদ হবে।

বুড়ি হি হি করে হেসে পঠে।

- বিপদের আর বাকী কি? সহসার আমার যানুষ-শূন্য হয়ে পেল। উড়ো ব্ববর পাই সলীমও নাকি ঘূঁঢে মরেছে।

- তাই নাকি?

মনসুর লাক দিয়ে বুড়ির কাছে সরে আসে।

- তা ব্ববরটা কার কাছে পেলে।

- এ ও বলে।

বুড়ি চোবে ঝাঁচল জাপা দেয়।

- আহা কেল না রইসের মা। বড় দুঃখের কপাল জোমার। মিজের ছেলেটাও হল হাবা আর বোবা। কোন কাজেই এলো না। যাক দুঃখ করো না। আমরা তো আছি। দরুকার হলে ব্ববর দিও। তবে হ্যাঁ এ বোটমীটাকে আজই বিদায় কর।

- তা আর বলতে।

- যাই মেলা কাজ। সাবধানে থেকে রইসের মা।

মনসুর ছাতা আধায় হেঠো পথে মেমে যায়। একটু পর ঘূরে আসে আবার।

- হ্যাঁ গো রইসের মা সলীমের ব্ববরটা সত্ত্ব তো?

- লোকে তো বলে। মিজের চোখে তো আর দেখিনি।

- তা তো ঠিকই। গুদের নিয়ে জোমারও আদিখোজা আছে বাপু। তা আমি বলি সত্ত্বে হেসে দুটো গেছে জোমার ভালই হয়েছে। সম্পত্তি সব এখন জোমার রইসের। কি শুশি লাগছে না?

বুড়ির দম আটিকে আসে। শক্ত হয়ে যায় শরীর।

- বুকলো বুশিটা আমারও। যাই সলীমের ব্ববরটা পৌছে দেই ক্যাম্প।

মনসুর ছন্দনিয়ে হেঠে যায়। বুড়ি ঘু করে একদলা ঘূতু ফেলে। ওর সঙ্গে কথা বলতেও শরীর কেবল বিনামিন করে। শক্ত। শক্ত। একটা বুড়ি অকারণে কাটা বোপে লাখি যাবে। সলীম কিয়ে এলো তোর হাত-মাসে ঠিখিয়ে যাবে। তোকে কুকুরের মুখে, শিয়ালের মুখে জুলে দেব আমি। উঃ সলীমের ব্ববরটায় কেমন লাখিয়ে উঠলো শুয়োরটা। মাগো আধা আমার খাবাপ হয়ে যাবে। মির্বো বনিয়ে বলে ওকে ধোকা দিয়ে এখন মিজের বুকের মধ্যে কেমন ছুটিফটি করবে। সলীম আমি তোকে শেষে ধোরিনি ঠিকই কিন্তু তবুও তোর মা হয়ে বলছি আমার মুখে বাঁচি পড়ুক। তোর শক্ত ব্ববর

পরমায় হবে রে। সলীম বিশ্বাস কর ও যাতে আমাকে আর নীতাকে না ধাটিয়া দেজনা হিয়ে বলেছি। বুড়ির অস্পতি তবু কাটে না। কেন এহন হঠাত করে সলীমের মৃত্যুর ঘবর মনে এল? সলীম তোর মৃত্যুর দোষাই, তোর মৃত্যুযোক্তাদের দোষাই আমার মনে একটুও পাপ নেই রে। আমি সম্পত্তি দিয়ে কি করবো, এসব আমার চাই না।

বুড়ি বিড়বিড় করতে করতে ঘরে ফিরে। বিড়বিড় করতে করতে ভাত চড়ায়। সারাদিন বুড়ি আজন্মের ঘোরে কাটিয়ে দেয়। নীতার সঙ্গে কথা বলতে পারে না।

- তোর কি হয়েছে সই?

- আমি রচিয়ে দিয়েছি সলীম মৃত্যু মরেছে। বুড়ি অবিচল কষ্টে বলে।

- কেন এহন করলি?

- সলীম মরে গেলে তুরা খুশি হবে। তাহলে আমাকে আর বেশি ধাটিবে না। তোর এখানে থাকা নিয়ে কথা বলবে না। জনিস নীতা এখন ঐ সৈমিকগুলোর চাইতে আমি মনসুরকে বেশি ভয় পাই রে। ও আমার ঘরের কাছের লোক। ও আমার ইঁড়ির ঘবর রাখে।

বুড়ি সারাদিনের পর একক্ষণে কেঁদে ফেলে। নীতা বুড়ির মুখের দিকে হ্যাঁ করে তাকিয়ে থাকে। বুড়িকে বুরতে পারে না। ওর মুখের বেশ পক্ষতে পারে না। বুড়ি এখন নীতার কাছে অচেনা এক হেয়েমানুষ।

বুড়ির রটনা বাতাসের বেগে সারা গায়ে ছড়িয়ে যায়। মনসুর পথে পথে যাকে পেয়েছে তাকেই সোজাসে ঘবর দিয়েছে। যারা সলীমের বিজয়ীর বেশে ফিরে আসার অপেক্ষায় আছে তারা চূপি চূপি বুড়ির কাছে আসে।

- বুবরটা কি সত্ত্ব রইসের মা?

- হ্যাঁ।

বুড়ি গলা না কাপিয়ে উত্তর দেয়।

- বুবরটা আনল কে?

- একটা হেলে। চিমি না।

রমজান আলী তনে গর্জে উঠে।

- হিথে কথা। নিশ্চয় সলীম মরেনি। এটা ঐ মনসুরটার বানানো কথা।

বুড়ি রমজান আলীর প্রশ্নের উত্তর দেয় না। ওর কষ্টের গর্জনে স্পষ্ট পায়। সে কষ্ট বুকের ভেতর ধরে রাখে। ঘরের ভেতর থেকে নীতা অনবরত তোবের জল হোছে। হনে হয় বুড়ির কাছাকাছি পৌছাব সাধ্য এখন আর তর নেই।

এইসব টানাপোত্তে দিম কেটে যায়। বুড়ির বুকের নিগম্বন্ত অনবরত প্রসারিত হয়। হলনী পায়ের সীমানা পেরিয়ে যায়। গুলির শব্দের জন্যে কান খাড়া করে রাখে। কথনো রমজান আলী ফিলফিসিয়ে জিজেস করে, তুমি কথা বললা কেন রইসের মা? সলীমের ঘবরটা কি তোমার কাছে বাতাসে ভেসে এল? তোমার কাছে কে এসে ঘবর দিয়ে গেল আর আমরা কিছুই জানলাম না এটা হয় নাকি?

বুড়ি ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে। তারপর দৃষ্টি ঘূরিয়ে নেয়। রেগে যায় রমজান আলী।

- তোমাকে যে কোন ভূতে পেয়েছে আস্থাহই জানে?

বুড়ি রমজান আলীর দুপদাপ পা ফেলে চলে যাওয়া দেখে। দেখতে ভাল লাগে। বিড়বিড়ি করে, চারদিকে এমন দুপদাপ শব্দই তো আমি চাই। বুড়ি অনুভব করে বুকের সীমানায় গলগলিয়ে জনস্ত্রোত চুকচে। ওর ভাবনার মাঠঘাট প্রান্তের শর্ষপ্রসবিনী করে তুলেছে। বুড়ির পলিমাটি চেতনায় রাখি রাখি শস্যের কণ।

শুধু বাঁশবনে বা খালের ধারে দাঁড়িয়ে মনসুর যখন বিগলিত হেসে গদগদ থরে জিজেস করে, কেমন আছ রহিসের মা? তখন বুড়ির পা থেকে মাথা পর্যন্ত ঘৃণার ঢাকুক লিকলিকিয়ে ওঠে। ও সুখ ঘূরিয়ে নেয়। একদলা ঘৃত ফেলে। মনসুর সহানুভূতি জানায়, আহা তোমার কি এখন মাথার ঠিক আছে? সতাই ছেলে হলেও তুমিই তো কোলেপিঠে করে মানুষ করেছে।

বুড়ি কথা শেষ করার আগেই হাঁটতে শুরু করে।

- ও রহিসের মা? রহিসের মা?

মনসুর জবাব না পেয়ে ফিরে যায়। বুড়ি গুরুর বুটি আলগা করে বাঁশের কঞ্চি কুড়িয়ে বুনো লতায় সপাং সপাং পিটায়। বুড়ির শরীরের র-র দপ্দপানি কমে না।

পৌছের প্রথম রাতে গোলাঙ্গলির ভীষণ শব্দে ঘূম ভেঙে যায় ওদের। বুড়ি গায়ের কাঁধা স্কুড়ে ফেলে উঠে বসে। নীতাও গুটিসুটি উঠে আসে। ওর শরীর কাঁপে।

- কি হল সই?

- ঠিক আমাদের গায়ের ক্যাম্পে আক্রমণ করেছে মুকিযোক্তা!

- মাগো এখন কি হবে?

মীতা কাঁদতে শুরু করে।

- কি আর হবে, জঙ্গি ছেলেগুলো শীতের রাত গরম করে তুলেছে।

রহিস কাঁধা মুড়ি দিয়ে ঘুমোচ্ছে। ওকে আর জাগায় না। বুড়ি বাঁশের খোপের কাছে এসে বসে। বুক দুর্দুর করে, এত কাছ থেকে এমন শব্দ কি ও আর কখনো শনেছে। শব্দ ত্রুটাগত জেরালো হয়। আশপাশের ঘরের লোকজনের ফিসফাস কথাবার্তা শোনা যায়। সব তবে আতঙ্কহ্যান। তটস্থ মেয়েরা ছেলে বুকে নিয়ে পালাচ্ছে। পুরুদিকে সরে যাচ্ছে। অক্ষকার রাতে পথ চলার একটুও অসুবিধে হয় না। বরং অক্ষকারই ভাল। চারদিকের এত আঁধারের মাঝেও বুড়ির বুকের ভেতর প্রদীপ জ্বলে। রমজান আলী এসে বুড়িকে ডাকে।

- ও রহিসের মা?

- কি!

- এখনি পালানো দরকার।

- কেন?

- যুক্ত কর হয়েছে। আমরা সবে থাই। যুক্ত পার্মলে ওরা আমাদের ঘেরে ফেলবে।
- কি যে বল বহুজান ভাই আমাদের ছেলেরা জিনতেও তো পারে।
- জিনতেও তো ভালই। না জিনতে? এখনই তল। আড়াতাড়ি যাওয়া সরকার।
- আমার আর কি হবে? আমি যাব না।
- কি যে বল?
- না বহুজান ভাই না। তৃষ্ণি যাও। ছেলেটা মুয়োচ্ছ। এই শীতের রাতে ওকে নিয়ে কোথায় যাব?
- অরণের শখ হয়েছে তোমার? তাড়াতাড়ি এস।
- না।
- যাবে না?
- না, বহুজান ভাই। আপনি যান।

বহুজান আরী রাগ করে চলে যায়। কলীয়ের মৃত্যুর কথা মনে হয় বুঢ়ি। যদি থেকে উঠেনের ঐ জায়গাটা দেখা যাবে। মৃকটা কেপে ওঠে। গলির শব্দ মানেই মৃত্যু। মীভাও তা আনে। তবুও বুঢ়ি চুপচাপ বসে থাকে।

- সহী?

মীভাও কষ্টে বুঢ়ি ওকে ওঠে। ওর হাত চেপে ধরে।

- সহী তুই ওদের সঙ্গে চলে যা। সত্ত্ব যদি কিছু হয়?
- তোকে ছেড়ে আমি যাব? তুই কি করে বললি?
- তাহলে দু'জনে বসে থাকি। দেবি শেষ কোথায়।

বুঢ়ি কান পেতে গ্রাম ভরে শব্দ শোনে। এফম শব্দময় উষ্ণ রাত বুঢ়ির জীবনে আর কোন দিন আসেনি।

কানের আর হাফিজের মেডুন্টে মিলিটারি ক্যাম্পে আক্রমণ চালিয়েছে একদল মুক্তিযোৱা। প্রথমদিকে ওরা চমৎকার পজিশনে ছিল। অতিরিক্ত আক্রমণ বলে বেশ কয়েকটা ঘেরেও ফেলে। কিন্তু সংবাদী কম ছিল বলে ওরা বেশিক্ষণ টিকতে পারে না। তার ওপর ওদের গলি মুরিয়ে যায়। অবস্থা বেগতাক দেখে ওরা পালাবার চেষ্টা করে। অন্তকারে এক একজন এক একদিকে দৌড়ায়। কানের হাফিজ পীড়ের পথ দেনে। চেনা পথে ওদের অসুবিধা হয় না। অন্ধ এলোহেলো পথ ঘাটে কবলে পা বেঁকে যায়। ওদের পেছনে ধাওয়া করে চারজন মিলিটারি। পেছন থেকে ওরা গলি হোক্তে। কানের পাশ দিয়ে আগন্তনের ফুলকি ছলকা ছড়িয়ে যায়। কানের আর হাফিজ গ্রামপথে ছুটেছে। সৈনিকদের দৃষ্টি গড়াতে ওরা সোজা হোক্তে যাটের ঘাঁথে নেমে যায়।

উঠানে দুপদাপ শব্দ। দুলে ওঠে বুঢ়ির বুক। ওরা কি তবে পালিয়ে এল? যুক্ত কি শেষ? গলির শব্দ আর তেমন জোরালো নয়। ফাঁকা আওয়াজ ভেসে যায় শুন্মো। পাল্টা জবাব আর গর্জে ওঠে না। বুঢ়ির বুক খালি হয়ে যায়। ওরা কি তবে হেরে পেল? ও নীজার হাত চেপে ধরে।

- সই ওরা কি হেবে গেলো? ওরা হারতে পারে না। আমার বিশ্বাস হয় না।

বুড়ি ফুঁপিয়ে উঠে। নীতার হাঁটু কাপে থর থর করে। বারান্দায় উঠে এল ওরা।  
বুধি বাঁপের ফাঁক দিয়ে দেখার চেষ্টা করে।

- চাচি?

বুড়ির বুক কাপে। কে ওরা? চেনা ছেলে মনে হয়?

- চাচি দরজা খোলেন।

অস্ত্রির কঠ। এক মুহূর্ত দেরি সইছে না। বুড়ি তৈরি হয়ে যায়। হ্যা, এখনই প্রকৃত সময়। ওরাই এসেছে। সেই বীর যোদ্ধা ছেলেগুলো। ওরা আশ্রয় চাইছে। ওরা প্রার্থনার ভঙ্গিতে নিরাপত্তার আশ্বাস চাইছে। ওদের আশ্রয় দেয়া দরকার। একবার পালিয়ে এসেছে তাতে কি হয়েছে? ওরা আবার নতুন করে যুক্ত নামবে। শক্তিমান ইশ্বরের মত মনে হয় নিজেকে। বুড়ি দরজা খুলে দেয়।

কাদের আর হাফিজ হত্তয়ড়িয়ে ঢোকে।

- ওরা আমাদের পিছু নিয়েছে চাচি। তাড়া করে আসছে। বাবা মা কে তো পেলাম না। আপনি আমাদের আশ্রয় দেন চাচি।

মিনতিতে ভেঙে পড়ে কঠ। বুড়ি জানে না প্রার্থনার ভঙ্গি এমনি কি না। এত কিছুর প্রয়োজন ছিল না। ওরা যদি বুক টান করে বলতো, আমাদের বাঁচাও। তাতেই বুড়ি বিগলিত হয়ে হেত। বুড়ি জানে ওদের বেঁচে থাকা প্রয়োজন। হলদী গৌয়ের গ্রাণ এখন ওদের হাতের মুঠোয়। ওদের বাঁচাটা মাটির মত প্রয়োজন। বুড়ি কর্তব্য ঠিক করে দেয়। ওদের টেনে নিয়ে যায় ঘরের কোণে। খালি হয়ে পড়ে থাকা বড় মটকার মধ্যে দুকিয়ে দেয়। মুখে ঢাকনা দেয়। ঢাকনার ওপর টুকরি। টুকরির ওপর পুরোনো কাপড়ের পুটলি।

নীতা হ্যাঁ করে দেখে কেবল। বুড়ি ফিরে এলে ডাকে, সই! বুড়ি পরিতৃপ্তির হাসি-হাসে।

- ওদের না বাঁচালে আমাদের জন্মে লড়বে কে?

বুড়ি আবার বাঁপের কাছে বসে। রমজান আলী থর ছেড়ে পালিয়োছে। তবে সবাই যায়নি। বুড়ির মত আরো কেউ কেউ রয়ে গেছে। একবার মার খেয়ে রমজান আলীর সাহস করে গেছে। ওর কথা শনে বুড়িও যদি পালাতো তবে কে ওদের আশ্রয় দিত? বুড়ি জানে এই ক'বর বাসিন্দার মধ্যে আর কারো এত সাহস হতো না। গর্বে, ভয়ে, আশংকায়, আনন্দে বুড়ির বুক ওঠানামা করে। এখন কি করবে? ওরা যদি খোঝ করতে আসে? আসে নয় আসবেই। বুড়ির মনে হয় বিশ্বাল অরাণ্য ও একা। চারদিক থেকে নেকড়ের দল বন-জঙ্গল ভেঙে ছুটে আসছে আক্রমণ করতে। শিউরে উঠে বুড়ি। কিছুই ভেবে কুলিয়ে উঠতে পারে না। কি করা উচিত? পথ আগলে দাঁড়াবে? বলবে, আগে আমাকে মার তারপর ঘরে ঢোকো? কিন্তু তাতে লাভ? ছেলে দুটো কি তাতে বাঁচবে? বুড়ির মৃত্তুর বিনিয়য়ে তো ওরা বাঁচবে না? কি করবে? কি করবে দরকার? আধাৰ চুল ছিঁড়তে ইচ্ছে করে। ওর ওপর নির্ভর করছে ওদের জীবন-মৃত্যু। ওদের বেঁচে থাকা একান্তই দরকার।

বুড়ি নীতাকে ধরে বাঁকুনি দেয়।

- কি করি সই? কেমন করে গুদের বাঁচাৰ?

নীতা কথা বলে না। আঁচলে চোখ মোছে। বুড়ি ঝেগে যায়।

- তোৱ কেবল চোখে জল। সব হায়িয়ে তুই শিখেছিস কাঁদতে? একটুও ভাল লাগে না।

বুড়ি ঘরে পায়চারি করে।

পাঁচ মিনিটের অধ্যো চারজন সৈনিক ক্ষুধার্ত নেকড়ের মত আঙ্গিনায় এসে দাঢ়ায়। সার্ট লাইটে আলেক্সিত করে ফেলে চারদিক। এত অক্ষমতে আলো হলদী পীয়ের এই ক'থৰ বাসিন্দা গুদের জীবনকালে দেখেনি। সৈনিকগুলো চিহ্নকারে বাড়ি মাথায় তোলে। তরু বুঝতে পারছে না যে ছেলেগুলো কোনদিকে গেল? ঘরে চুকলো না বাশবল, সুপোরি বাপামে গিয়ে অশ্রয় দিল? ওৱা নিজেদের মধ্যে কি যেন বলাবলি করে। তাৰপৰ দুজন ঘরে ঘৰে তলাসী কৰ কৰে। অন্যান্য ঘরের পুরুষদের উঠানে এসে দাঢ় কৰিয়েছে। বুড়ির হাত পা ধৰত্ব কৰে কাপে। বাশবলে চুপ কৰে বসে থাকা সামা বকটাৰ মত মনে হয় মৃত্যুৰ ছায়া। ঘরেৰ বাইতে বাদাম পাছে পেঁজা ভাকে থেকে থেকে।

বুড়ি সারাঘৰে পায়চারি কৰে। এক কোণে কুপি জালে। রাইসের মুখ থেকে কাঁধা সারে গেছে। এত হাঁটিগোলেও ওৱা ঘুমেৰ ব্যাধাত হয়নি। ঘুমেৰ মধ্যে গোভায়। এটা ওৱা একটা অভেস। বুড়ি ঝুকে পড়ে ওৱা মুখৰে গুপৱ। হ্যা, ঠিক সেই পক্ষ আসছে। কাদেৰ হাফিজ যেদিন মৃত্যুবাহীতে যোগ দিতে যাইল সেদিন গুদেৰ শৰীৰ থেকে যেৱকম পক্ষ এসেছিল ঠিক সে বকম পক্ষ আসছে রাইসেৰ মুখ থেকে। চারদিক আলো কৰে কাৰা যেন বুড়িৰ চারপাশে দাঁড়িয়ে আছে। বুড়ি দৈববাণী তনতে পাছে। ফিসফিস কৰে বলছে, আৱ সময় নেই। বুড়িৰ মনে হয় প্ৰতিটি মৃহূতই যেন ওৱা দিকে এগিয়ে আসছে। ঘুমেৰ ঘোৱে রাইস পাশ কিয়ে শোয়। চকিতে একটা চিঞ্চা এসে বুড়িকে আজল্ল কৰে ফেলে।

নীতা দ্রুত বলে, সই আজ আমাদেৰ সবাইকে মৰাতে হবে। বুড়ি ওৱা কথার উভৰ দেয় না। ওৱা কেবলই মনে হয় যে ছেলে জনযুক্তেৰ অংশীদাৰ হতে পাৱে না— যে ছেলে ভাইয়েৰ মৃত্যুৰ প্ৰতিশোধ নিতে পাৱে না তাৰ বৈচে থেকে লাভ কি? কত হাজাৰ হাজাৰ লোক আৱা যাচ্ছে। রাইসও যদি যায়? না, পৱনক্ষে যন্মটা মৃহূতে পড়ে। রাইস ছাড়া বুড়িৰ পুধিৰী অক্ষকাৰ। সব হাৱিয়ে কেমন কৰে বাঁচাৰে ও? পৱনক্ষে সমস্ত হলদী পী তেকেৰ সামনে নড়ে ওঠে। বিৱাটি একটা ক্যামভাসে বুড়িৰ শৈশব, কৈশোৱ, বৌবন এবং সেই সমে সেইটি পৰা আনুষঙ্গলো উঠে আসে সামনে। গুদেৰ পেটে ভাত নেই, পৱনে কাপড় নেই, আছে কেবল বুকভৱা তেজ। তাই বুড়িৰ একাৱ ব্যাৰ্থ ওখানে সামান্য। বুড়ি চিঞ্চা কোড়ে ফেলে। গুদেৰ কথাবাৰ্তা শোনা যায়। বুড়ি ওৱা ঘৰেৰ দিকেই এগিয়ে আসছে। ও আৱ দেৱী কৰে না। ঘুমত রাইসকে টেনে তুলে আনে বিছানা থেকে। চারদিকেৰ এত আলোয় ও হকচকিয়ে যায়। বুড়ি লুকিয়ে রাখা এল, এম, জি, টা পঁজে দেয় রাইসেৰ হাতে। রাইস অবাক হয়ে একটুকুণ দেখে নতুন হাতৰ নদী ঘৰেন্ডে

জিনিসটাকে। মুখ উত্তৃসিত হয়ে ওঠে। মাথা নাড়ে। এবং ভীকণ খুশিতে খেলনা ভেবে অন্তর্টা জড়িয়ে ধরে বুকের মাঝে। ওর মুখের দিকে তাকিয়ে বুড়ির সমস্ত শরীর কেঁপে যায়।

- নীতা তীব্র কষ্টে বলে, কি করছিস সই?

ও রাইসের হাত থেকে অন্তর্টা কেড়ে নিতে চায়। বুড়ি কিপ্পগতিতে সামনে এসে দাঢ়ায়, না। তুই ওটা নিতে পারবি না। ওটা রাইসের বুকেই থাকুক। আমি ওকেই দিয়েছি।

বুড়ির দৃষ্টি দপ্তরিয়ে ওঠে। চোখে জল নেই।

সৈনিক মুঞ্জন বুড়ির বারান্দায় ওঠার সময় পার না। পা সিডিতে রাখার সঙ্গে সঙ্গেই বুড়ি রাইসকে ঘর থেকে ঢেলে বের করে দেয়। সৈনিক চারজন কলরব করে ওঠে। দরজা আগলে দাঁড়িয়ে থাকে বুড়ি। ওদের কিছুতেই ঘরের মধ্যে ঢুকতে দেবে না। ঢুকতে হলে বুড়ির লাখ মাড়িয়ে ঢুকতে হবে। কিন্তু রাইসকে পেয়ে সৈনিক চারজন আর অন্য কিছু ভাবে না। অত ভাবার দৈর্ঘ্য ওদের নেই। ওদের সোজাস মুখের দিকে তাকিয়ে ওর দম আটকে আসতে চায়। নিঃসীম বুকের প্রান্তরে হহ হ বাতাস বয়ে যায়। বুড়ি হাজার চেষ্টা করেও কাঁদতে পারে না। ছুটে বেঙ্গলতে গিয়েও দাঁড়িয়ে পড়ে। আরো দুটো প্রাণ ওর হাতের মুঠোয়। ও ইচ্ছে করলেই এখন সে প্রাণ দুটো উপেক্ষা করতে পারে না। বুড়ির সে অধিকার নেই। ওরা এখন হাজার হাজার কলীমের মৃত্যুর প্রতিশোধ নিচ্ছে। ওরা হলদী গাঁর স্বাধীনতার জন্যে নিজের জীবনকে উপেক্ষা করে লড়ছে। ওরা আচমকা ফেটে যাওয়া শিমুলের উজ্জ্বল ধৰ্মবে তুলে। বুড়ি এখন ইচ্ছে করলেই শুধু রাইসের মা হতে পারে না। বুড়ি এখন শুধুমাত্র রাইসের এককলার মা নয়।

সৈনিক ক'জান তাদের নিজস্ব ভাষায় বুড়িকে ধন্যবাদ জানায়। উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে। দেশের জন্যে সভ্যত্বকার কাজ করেছে বলে পুরস্কার দেবার কথাও বলে। বুড়ি এক অক্ষরও বুঝতে পারে না। নির্বাক পুতুলের মত দরজা ঝাঁকড়ে দাঁড়িয়ে থাকে। ওদের হাতে বন্দী রাইস কেবল নেড়েচেড়ে অন্তর্টাই দেখে। কারো দিকে তাকাবার সময় ওর নেই। উঠানে দাঢ় করানো লোকগুলো সব থ। কারো মুখে কথা নেই। ওরা বুঝতে পারছে না যে কোথা দিয়ে কি হচ্ছে। হাবা-বোবা রাইসের হাতে অন্ত দেখে কেউ প্রতিবাদও করে না। সব চূপ। ওরা কেবল অনুভব করে বুড়ির চোখ দুটো জুলছে। চোখের অহন আলো ওরা আর কোথাও দেখেনি। কোন সন্দেহের অবকাশ না রেখে রাইসকে লুফে নিয়ে ওরা চলে যায়। আকাশিক্ষণ্য শিকার এখন ওদের হাতের মুঠোয়। শিকার ঝলসানোর জন্যে ওরা এবার আগুন জ্বালাবে। ওরা চলে যাচ্ছে। বুড়ি অনুভব করে ওর কলজেটা থাকলে নিয়ে ওরা চলে যাচ্ছে।

বুড়ি দরজা ছেড়ে বারান্দায় নামে। সিডি বেয়ে উঠানে। রাতি প্রায় শেষ। আবছা আলো চারদিকে। প্যাচার ডাক থেমে গেছে অনেকক্ষণ। উঠানে দাঁড়িয়ে থাকা লোকগুলো বুড়িকে ঘিরে থারেছে। কত কি যেন বলছে। বুড়ি কিছুই শুনতে পায় না। ওদের ভিড় সরিয়ে উঠানের শেষ মাথায় আসে। এবং পরকগেই শুনতে পায় গুলির শব্দ। বুড়ি সৌড়ে বের হয়। কলীমের লাগানো জামরুল গাছের নিচে রাইস রাতের

ত্রোতে আসছে। ও বেঢ়া আঁকড়ে দাঁড়িয়ে পড়ে। মনে হয় বুকের ভেতরের পুলটি দুঃখ করে ভেঙে পড়লো। রইস একটা টিকটকে লাল তাজা বোমা। চারজন সৈনিক সদস্যে মাটি কাঁপিয়ে ক্যাম্পের দিকে চলে যাচ্ছে।

যখন বুড়ির সবাই রইসের দিকে ঝুটে গেল তখন বুড়ি আবার দৌড়ে ঘরে এলো। ধানের মটকার মুখ খুলে ওদের তাকল। ওরা বেরিয়ে এলো। মনে আশংকা। শহীদত দৃষ্টিতে চারদিকে তাকায়। বুকতে পারে না কিছুই।

- ওরে তোরা পালা। ওরা চলে গেছে।

- চলে গেছে?

ওদের বিশ্বাস হয় না। মীতা বৈয়াগিণীর উচুকটির কান্না ভেসে আসছে।

- কান্দে কে চাচি?

- তোদের এত কথার সময় নেই। তোরা এখন পালা। তোদের তো আবার লড়তে হবে।

বুড়ির কষ্ট রুক্ষ হয়ে গঠে।

- আপনার জন্যে বেঁচে গেলাম চাচি।

- খালি কথা। যা এখন।

বুড়ি ওদের পিঠে হাত দিয়ে ঠেলে দেয়। বুকের ভেতর থেকে কান্নার ছেঁট পাহাড় সমান উচু হয়ে ঝুটে আসছে। কিন্তু ওদের সামনে কিছুতেই তা প্রকাশ করবে না বুড়ি।

ওরা বুড়ির পায়ে হাত দিয়ে সালাম করে। দ্রুত বাইরে আসে। মৃত রইসকে দেখে ধমকে দাঢ়ায়। ওদের কোরবান চাচার কাছে সব কনে বধির হয়ে যায় ওদের অনুভূতি। পায়ে পায়ে ফিরে আসে বুড়ির সামনে। বুড়িকে জাঁপিয়ে ধরে কান্নায় ভেঙে পড়ে।

- আপনার একটি ঘাত হলে। আমাদের জন্যে এ আপনি কি করবেন?

- তুরু ওদের কান্না থামে না। বুড়ি ওদের হাত দিয়ে ঠেলে সরিয়ে দেয়।

মুক্তিযোদ্ধার চোখে পানি বেঝানাম।

- এখনও না পালালে তোরা ওরা পড়বি। আর সময় নেই বে। তোরা যদি ধরা পড়িস বৃথাই রইস ঘরল। এক্ষুণি বেরিয়ে পড়।

বুড়ির কঠিন শাসনে ওরা আর ধিধা করে না। মনে হয় বুড়ির সামনে দাঁড়িয়ে থাকার সাহস ওদের নেই।

- মাগো যাই।

ওরা দুজন দৌড়ে বেরিয়ে যায়। বুড়ি বেঢ়ার গায়ে হেলান দিয়ে নিজেকে সামলে নেয়। প্রবল কান্নার ধরনি আসছে জামরল গাছের নিচ থেকে। সবাই কানছে। বুড়ির বুক তোলপাঢ় করে গঠে।

- তুই আমাকে একদিনও না বলে ভাকিসনি রইস। আমি জানি একটু পরে হলদী পীয়ের মাটি তোকে বুকে টেলে নেবে। তুই আর কোনদিন না বলে ভাকবি না। আমিও আর অপেক্ষায় থাকব না। কৈশোরে, যৌবনে যে ব্যগ্র আমাকে ভাঙ্গিত করতো- হাঙ্গর নদী প্রেনেত

বার্ধক্যে যে শপ্ত আমি মুছে ফেলেছিলাম এখানেই তার শেষ। রইস তৃতীয় আমার কন্ত আদরের কন্ত ভালবাসার কন্ত সাধনার ধন রে! তবু তোকে নিয়ে আমার বুকে কঁটা ছিল। আজ আমি তোর রক্তে সে কঁটা উপত্তি ফেললাম। তোর অপূর্বতা— তোর অস্তুর আমি আমার জীবন নিয়ে শোধ করলাম। তৃতীয় মরে বেঁচে গেলি। আমি রইলাম তোর শোক বহন করার জন্যে। রইস আমি তোর যা ভাক না শোনা যা। আমি কন্ত নির্মম, নিষ্ঠুর হয়েছিলাম তা তৃতীয় বুবতে পারিসনি। আমি তো জানি যে কটা দিন বাঁচবো তোর কন্ত বুক পুড়িয়ে বাঁচবো। তবু এই কষ্ট থেকে আমি পার পেয়ে যাইরে যখন দেবি হলদী গাঁতো আমারই নিষ্পাসের। আমারই প্রতি রোমকৃপের। আমি তখন আর সব কিছু ভুলে যাই। রইস তোর মাতৃত্বে আমার যে অহংকার— হলদী গীও আমার কেমন অহংকার। রইস তৃতীয় আমাকে মাঝ করে দে। মাঝ করে দে।

বুড়ি বেঢ়ার গায়ে মাথা টুকে ডাক ছেড়ে কেঁদে গঠে। নীতা এসে দাঢ়ায়।

— সই?

বুড়ির কানু ধামে না।

— সই চল, দেখবি না বুক পিঠ কেমন ঝীঝোরা হয়েছে? রক্ত মাখামাখি হয়ে কেমন পথের মত ফুটে আছে তোর রইস?

নীতার কথায় বুড়ি শক্ত হয়ে যায়। ওর দিকে একদৃষ্টি তাকিয়ে থাকে।

— হ্য করে দেখছিস কি? চল। নাড়ি হেঁড়া ধন চাই বলে পাগল হয়ে উঠেছিলি। তাকে আজ নিজ হাতে বলি দিয়ে কাকে তুঁট করলি সই?

বুড়ি কোন কথা বলে না।

নীতার প্রশ্নের উত্তর হয় না। বুড়ির ভেঙে গুড়িয়ে যাওয়া বুক এখন সম্মতল পলিমাটি। অনবরত বন্যায় ক্রমাগত উর্বরা হয়। ঘৰায় নিরেট। তবুও শ্যামল থাল বিল নলী নালাময় বুড়ির বুকে আশ্র্য পথের সৌরভ।

— চল সই?

নীতা বুড়ির হাত ধরে নিয়ে আসে।

বুড়ি রইসের পাশে হাঁটি গেড়ে বসে। জনস্বক্ষে উপেক্ষিত ছেলেটার উষ্ণ তাজা রক্ত হাত দিয়ে নেড়ে দেখে। রইসের ঠোটের কোণে লালা নেই। লালচে ঝীগ রেখা গড়াচ্ছে। রক্তের থোকায় কাত হয়ে পড়ে থাকা রইসের মাথাটা সোজা করে খুব আজ্ঞে ঘোলা জোখের পাতা বুজিয়ে দেয় বুড়ি।

কারা যেন চারপাশে কথা বলছে। কেউ বুড়িকে পালাগালি করছে। ওর মনে হয় সলীম বুড়ি ফিরে এসেছে। মাথা চুক্তির দিয়ে গঠে। সব কিছু অক্ষকার হয়ে যাবার আগ পর্যন্ত বুড়ির আর কোন কিছুই মনে থাকে না।